প্রথম খণ্ড।

"জীবন-সংগ্রাম," "মানব-চিত্র," "সংসার-চিত্র"

প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীরামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

এচ, পি, ব্যানার্জ্জি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রাবণ, ১৩২০ সাল।

মূল্য ১।০ টাকা।

ভূমিকা।

মৎপ্রণীত "জীবন-সংগ্রাম," "মানব-চিত্র" ও "সংসার-চিত্র" পুস্তক তিনখানিকে বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাগণ স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছেন। ছয় মাসের মধ্যেই "জীবন-সংগ্রামের" ১ম সংস্করণ এক সহস্র পুস্তক নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায়, দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপাইতে হয়, এক্ষণে তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। "মানব-চিত্র" ও "সংসার-চিত্রের" ও দ্বিতীয় সংস্করণ চলিতেছে। এজন্য আমি আমার পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট কৃতজ্ঞ। এক্ষণে আমার "ভবরামের উইল" প্রকাশিত হইল, জানি না ভবরামের উইলকে তাঁহারা কি চক্ষে দেখিবেন।

"জীবন-সংগ্রাম", "মানব-চিত্র" ও "সংসার-চিত্র" প্রকাশিত হইবার পর নানারূপ ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া জননী বীণাপাণির সেবা হইতে একবারে বঞ্চিত ছিলাম—ইহা আমার দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় গত পৌষ মাসে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যখন পশ্চিমে যাই, তখন আমার অভিন্নহৃদয় অকৃত্রিম ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধু, লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক "সুধা," "পথের কথা", "ঘরের কথা," "নবান্ন" প্রভৃতি গ্রন্থ-রচয়িতা শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভায়া আমাকে আর একখানি পুস্তক

লিখিবার জন্য উৎসাহপূর্ণ ভাষায় পত্র লেখেন। সে পত্রখানির ভাষা কি উৎসাহপূর্ণ,—কি আবেগময়ী! সে পত্রখানিতে একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল;—"ভাই! তুমি আর একখানি পুস্তক লেখ, হু হু করিয়া বিক্রয় হইবে।"

বন্ধুর উৎসাহ ও অনুরোধপূর্ণ পত্র না পাইলে, ভগ্নস্বাস্থ্যে "ভবরামের উইল" হয় ত লিখিতে পারিতাম না। তাই পুস্তকখানি সমাপ্ত করিয়া স্নেহসিক্ত হৃদয়ে সুহৃদ্বরকে বার বার স্মরণ করিতেছি। এক্ষণে বন্ধুবরের ভবিষ্যৎবাণী সফল হইবে কি না পাঠক-পাঠিকাগণ বলিতে পারেন।

২রা শ্রাবণ
১৩২০ সাল।

গ্রন্থকার।

"জীবন-সংগ্রাম," "মানব চিত্র," "সংসার চিত্র," "ভবরামের উইল"

প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা—

শ্রীরামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎসর্গ-পত্র।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, সুলেখক, ধর্ম্মপ্রাণ বন্ধু

শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি ঘোষ মহাশয়ের নামে

আমার অতি আদরের

"ভবরামের উইল"

উৎসর্গীকৃত হইল।

[illegible] পীযূষ,

আজ চারি বৎসরের মধ্যে এমন একটি দিনও যায় না, যে
[illegible] আমি তোমার কথা ভাবি না! যখনই তোমাকে মনে পড়ে,
[illegible]নই তোমার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পাই! তোমার
[illegible] মনে হইলেই,—তোমার সেই সরল, অকপট, পবিত্র, মহান্
[illegible]য়ের কাছে সত্য সত্যই মস্তক অবনত করিতে ইচ্ছা করে।
[illegible]মার হৃদয়খানিতে অদম্য উৎসাহ ও তেজ, পবিত্রতা ও সরলতা

সর্ব্বোপরি পরোপকার-স্পৃহা যেন মাথান রহিয়াছে। ভাই! তোমার গর্ব্ব করিবার অনেক জিনিস আছে; কিন্তু অহঙ্কারের ছায়া কোনদিন ত তোমার হৃদয়ে দেখিতে পাইলাম না! স্বনামধন্য ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীর, বৈষ্ণব ধর্ম্মের মেরুধর্ম্ম স্বরূপ, একনিষ্ঠ দেশ-সেবক, সমাজ-সংস্কারক, ধর্ম্ম-সংস্কারক, অদ্বিতীয় লেখক ও বক্তা, "অমৃতবাজার" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও দেশ-বিখ্যাত সম্পাদক স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের আত্মজ তুমি, তাই বুঝি অহঙ্কারের কালিমা কোনদিন তোমার হৃদয়খানি স্পর্শ করিতে পারে নাই! ভাই! তোমাকে যে চিনিয়াছে, সেই জানে তুমি কি ও কেমন, আর তোমার এই ক্ষুদ্র বন্ধু বুঝিয়াছে, তোমার হৃদয়খানি সংসারের ময়লা মাটি হইতে কত উচ্চস্তরে অবস্থিত।

ভাই! তোমার সুমিষ্ট ইংরাজী লেখার মাধুরীতে মুগ্ধ নয় কে? তোমার সম্পাদিত "স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনে" অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ে যে গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছ, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এরূপ সুললিত প্রবন্ধ আর কেহ লিখিয়াছেন কি না জানি না!

ভাই পীযূষ! পরোপকার-স্পৃহা, নেশার মত যেন তোমার হৃদয়খানিকে সর্ব্বক্ষণ বিভোর করিয়া রাখিয়াছে। কর্ম্মস্তূপের মধ্যে অহোরাত্র ডুবিয়া আছ, তত্রাচ পরোপকারের জন্য কেহ দণ্ডায়মান হইলে তাহাকে বিফল মনোরথ হইয়া কোনদিন ফিরিতে হয় নাই। ভাই! সে সময় তোমার মানাপমান জ্ঞান

থাকে না, যেন কি এক স্বর্গীয় দীপ্তিতে তোমার মুখখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে! তখন পরোপকারের জন্য তোমার উচ্চ মহৎ-হৃদয় ক্ষুদ্রের দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইতেও সঙ্কুচিত হয় না! পরোপকারের নামে যেন কোন অজ্ঞানিত স্থান হইতে অদম্য বল ও উৎসাহ আসিয়া তোমার হৃদয়কে স্ফীত করিয়া তুলে! তখন তোমার হৃদয়ের ভিতর যেন সপ্তসিংহ গর্জ্জিয়া উঠে। এমনটি ত আর কোনখানে খুঁজিয়া পাইলাম না ভাই!

ভাই পীযূষ! "ভবরামের উইল" আমার বহু পরিশ্রমের ফল! সুতরাং ইহা আমার অতি আদরের সামগ্রী! দুর্ব্বল দেহে; ভগ্ন-স্বাস্থ্যে "ভবরামের উইলকে" সম্পূর্ণ করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছি।

ভাই! আমি যে কেবল তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি, তাহা নহে, তোমার হৃদয়ের উচ্চ গুণগুলি সর্ব্বদা আমি হৃদয়ে রাখিয়া [illegible]জা করি; তাই আমার এই অতি যত্নের ধন, ধর্ম্মপ্রাণ সাধক "[illegible]বরামের উইল"খানি তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম। তোমার [illegible]দ্র বন্ধুর ইহা হৃদয়ের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ উপহার! স্নেহভরে গ্রহণ ক[illegible]লে ধন্য হইব।

সন [illegible]২০ সাল
তারি[illegible]রা শ্রাবণ
ই[illegible]১৩।

গ্রন্থকার।

ভবনাথের উইল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"তুমি কি ভাব যে পুরুষ বলিয়া একেবারেই স্বাধীন। যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে?"

"তোমার কাছে বরাবরই অধীন হইয়া আছি। স্বাধীন আর কবে হইলাম? বিবাহিত পুরুষ যদি স্বাধীন হইত, তাহা হইলে কি তোমরা আমাদিগকে এমন করিয়া দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতে?"

"ঠাট্টা করিয়া কথাগুলাকে লঘু করিলে চলিবে কেন? হিন্দুর মেয়ে ত আর কলেজে পাশ করিয়া স্বামীর ঘর করিতে আসে না! তাই তাচ্ছিল্য করিয়া সকল কথা আমাকে বলিতে চাও না এবং আমাদের সকল কথা বুঝিবার শক্তি নাই সত্য—কিন্তু সে সম্বন্ধে কি পুরুষের কোনও দায়িত্ব নাই?"

ভবরামের উইল।

"আজ তোমাকে যে ভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখিতেছি? কৈ এমন করিয়া ত একদিনও আমার সঙ্গে কথা কও না।"

"সেই পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আসা অবধি আমিও তোমাকে ভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখিতেছি! কিছুতেই তোমার মতির স্থিরতা নাই। কতদিন তোমাকে মিনতি করিয়া ভাবান্তরের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছি,—কিন্তু কোন সদুত্তর পাই নাই! আজ আবার শুনিতেছি কিছুদিনের জন্য পশ্চিমে যাইবে। আমি কি তোমার মনের একটা কথাও জানিবার অধিকারিণী নই?"

"সুখী হইলাম। তুমি যে এমন করিয়া আজ আমার সঙ্গে কথা কহিতেছ, ইহাতে প্রকৃতই আনন্দ হইতেছে। আজ পর্য্যন্ত তোমাকে যে আমি চিনিতে পারিলাম না, ইহাই আমার দুঃখ।"

"তোমার হৃদয়ের ভিতরটা এতদিনের মধ্যেও আমি একবার দেখিতে পাইলাম না—দুঃখে ক্ষোভে এই জন্যই সর্ব্বক্ষণ আমারও নয়নপ্রান্ত দিয়া অশ্রু ঝরিতে থাকে।"

"তবে বলিতেছি শুন। সংসারে আমরা কতদিনের জন্য আসিয়াছি বল দেখি?"

"তা' কি ঠিক করিয়া বলা যায়?"

"একটা আন্দাজ করিয়াও ত বলা যায়?"

"বড় জোর পঞ্চাশ ষাট বৎসরের জন্য।"

"তারপর আমরা কোথায় যাইব বলিতে পার?"

"যে প্রশ্নের মীমাংসা আজও পর্য্যন্ত কেহ করিতে পারিল না, সে প্রশ্ন আমাকে করিতেছ কেন?"

"বেশ কথা! এমন স্থানে মানুষকে যাইতে হয়, যে স্থানের সংবাদ আজও পর্য্যন্ত কেহ পায় নাই। এখন বল দেখি এমন অজানিত স্থানে যাইবার জন্য কি একটুও প্রস্তুত থাকা উচিত নয়?"

"নিশ্চয়ই।"

"দেখ! ভাবিয়া দেখিলেই আমাদের দিন কাটিয়া যাইতেছে। উদরের চিন্তা,—অর্থের ভাবনাতেই—জীবনের সমুদায় সময়টাই অতিবাহিত হইয়া যায়। স্বার্থ—স্বার্থ করিয়াই আমরা পাগল! পার্থিব সুখ, পার্থিব স্বার্থ, পার্থিব ঐশ্বর্য্য হইলেই আমরা ধন্য জ্ঞান করি! ইহাই কি জীবনের লক্ষ্য?"

"তা' কি হইতে পারে?"

"কেন পারে না?"

"তাহা হইলে আমরা ইহাতেই সুখী হইতে পারিতাম। আবার সুখের অন্বেষণে আমাদিগকে ছুটিতে হইত না! অর্দ্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর যিনি—তিনিও যখন সুখী নন, তখন সুখ যে পার্থিব বস্তুতে নাই, একথা বেশ বুঝিতে পারা যায়।"

"বেশ কথা বলিয়াছ! তাহা হইলে প্রকৃত সুখের অন্বেষণ সকলেরই করা কর্ত্তব্য! পার্থিব ক্ষণিক সুখে মগ্ন থাকা বোধ হয় কাহারও উচিত নয়?"

"কখনই না ?"

"কেন তবে আমরা থাকি ?"

"কি করিয়া জানিব ? বোধ হয় আমাদের কর্ম্মফল ! নচেৎ সংসারের মধ্যে কত অমূল্য নিধি ছড়ান আছে, সেদিকে না চাহিয়া মোহান্ধ নয়নে দুদিনের সুখ যাহা তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিতে ছুটিব কেন ?"

"সাগর ! তোমার কথা শুনিয়া আজ আমার যে আনন্দ হইতেছে, অনেকদিন এরূপ আনন্দ আমি জীবনে উপভোগ করি নাই, সত্য সত্যই আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই ! লজ্জারূপ লৌহ প্রাচীর এতদিন তোমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলটি আমাকে দেখিতে দেয় নাই ! আজ আমি অকপট হৃদয়ে আমার জীবনের অতীত কথা তোমাকে শুনাইব। বাল্যকাল হইতেই আমি ভাবি—জীবনটা কয়দিনের জন্য ? কেন আসিয়াছি ? জীবনের অবসানে কোথায় আবার আমাদিগকে যাইতে হইবে ? কিন্তু মীমাংসা ত হইল না ! সংসারের কোলাহলে,—স্বার্থের চিন্তায় জীবনের এক তৃতীয়াংশ চলিয়া গেল ! পরপারে যাইবার জন্য জীবনটা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে ! অনাচার, অত্যাচার, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি প্রবল শত্রুগণ সজোরে মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে !"

"সংসারের কোলাহল হইতে স্বার্থের পাশবিক গর্জ্জন হইতে যখন একটু দূরে থাকি, তখনই ভাবিবার একটু অবসর পাই

ভাবিতে ভাবিতে পরাণ শিহরিয়া উঠে! ভাবি,—মোহের ঘূর্ণি পাকে পড়িয়া কি নিষ্ঠুরভাবেই জীবনটা বিনষ্ট হইতেছে! এমন করিয়াও কি ইহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিব?"

"বাল্যকাল হইতে পথপ্রদর্শক খুঁজিতেছি—এমনই হতভাগ্য কোনও পথপ্রদর্শক পাইলাম না!"

"সংসার! সত্য সত্যই হৃদয় অস্থির হইয়া উঠে! ক'টা বৎসরের জন্য সংসারে আসিয়াছি—কোথায় অমৃতের সন্ধানে ঘুরিব—তা না করিয়া ধূলা কাদা মাখিয়া জীবনটাকে জর্জ্জরিত,—পঙ্কপূর্ণ করিয়া ফেলিতেছি! কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া আমরা আসিতেছি—যাইতেছি,—আমাদিগকে সত্যের পথ দেখাইবার জন্য,—অমৃতের সন্ধান দিবার জন্য চারিদিকে মুহুর্মুহু ভেরী নিনাদ হইতেছে, তবু ত আমরা ধূলা খেলা ছাড়িতে পারিতেছি না—আমাদের ত মোহনিদ্রা ভাঙ্গিতেছে না! সবাই বলে জীবনটা দু'দিনের,—সবাই জানে এখানে আমরা নির্দ্দিষ্ট ক'টা বৎসর ব্যতীত আর অধিক দিন থাকিতে আসি নাই; কিন্তু কেহত একথা প্রাণের ভিতর অনুভব করে না! আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব, খেলার সাথীদিগকে শ্মশানে দগ্ধ করিয়া "হরিবোল" ধ্বনি করিয়া আসিয়াই,—সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি বায়ুর সঙ্গে মিশিতে না মিশিতে,—নয়নের অশ্রু শুষ্ক হইতে না হইতেই—ধূলা কাদা লইয়া খেলা করিতে বসি! কি মজার সংসার!"

"এতদিন আমার হৃদয় মরুভূমির মত শুষ্ক হইয়াছিল—সেই শুষ্ক মরুভূমির উপর দাবানল জ্বলিতেছিল,—প্রাণ জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইবার উপক্রম হইয়াছিল! আজ সেই দগ্ধ হৃদয়ে যেন একটু শান্তির বারি ধারা পড়িয়াছে। তাই নিরাশা হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইয়াছে!"

"আমি অমৃতের সন্ধানে যাইব জানি না আমার অদৃষ্টে ঘটিবে কি না! কে জানে আশা নদী শুষ্ক হইয়া যাইবে কি না! যদি সেই সাধু মহাত্মা দর্শন দেন, তবে সাগরবালা! আমাদের জীবন সার্থক হইবে,—আমরা ধন্য হইব!"

"গুরু কৃপা ব্যতীত ভবনদী পার করিবার সাধ্য আর কাহারও নাই। কত সাধু সন্ন্যাসী দেখিয়াছি, ভক্তি অশ্রুতে কাহারও চরণ ধৌত করিতে পারি নাই! সে সময় বুঝি এতদিন আসে নাই!"

"একজন সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন—'বিশ্বাস কর! যাহাকে বিশ্বাস করিবে সেই তোমাকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিবে।' বিশ্বাস ভক্তি বুঝি তখন হৃদয়ে ছিল না!"

"সেই সন্ন্যাসী সুন্দর একটি ভক্তি বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত বলিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে এক রাজা পুত্রকলত্র পরিবেষ্টিত হইয়া বহুদিন রাজ্য-সুখ ভোগ করিতেছিলেন। সুখের স্পৃহা তাঁহার আর মিটে নাই। রাজ্যের পর রাজ্য—কত রাজ্য জয় করিলেন, সুখের বাসনা ঐশ্বর্য্যের কামনা তবুও মিটিল না! বার্দ্ধক্য আসিল। ভিন্ন

রাজ্যলাভের স্পৃহা আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রাজার এক দিন সত্যজ্ঞানের উদয় হইল! ভাবিলেন অসংখ্য রাজ্যের রাজা আমি... তবু সুখ শান্তি ত পাইলাম না। সুখ শান্তি লাভের জন্য সদাই ত আমায় অশান্তিতে কালযাপন করিতে হইতেছে! তবে কি আরও কতকগুলি রাজ্য লাভ করিতে পারিলে আমি সুখী হইব? না!... তাহাও ত সম্ভব নহে! তবে প্রকৃত সুখ কোথায়? যেখানে গমন করিলে প্রকৃত সুখ পাইব, তাহার অন্বেষণেই যাইব। সেই সুখের পথ কে দেখাইয়া দিবে? গুরু ত চাই। প্রতিজ্ঞা করিলেন অরণ্যে গিয়া যাহাকে প্রথমে দেখিতে পাইবেন, তাঁহাকেই গুরুপদে বরণ করিবেন। এক দস্যু পথিকের লুণ্ঠনের জন্য অরণ্যে লুকাইত ছিল। রাজা দস্যুর পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিলেন, "আপনি আমার গুরু"। দস্যু ভাবিল আজ আমার শুভযাত্রা! বিনা রক্তপাতে আশাতীত লাভ হইবে। প্রকাশ্যে বলিল "আচ্ছা আমি তোমার গুরু। তোমার অঙ্গুলীতে যে হীরক অঙ্গুরীয়কগুলি আছে অগ্রে আমাকে দান কর।" রাজা অঙ্গুলীর দিকে এ পর্যন্ত লক্ষ্য করেন নাই। দেখিলেন তাঁহার নিত্য ব্যবহৃত হীরক ও মণিমাণিক্য খচিত অঙ্গুরীগুলি অসাবধানবশতঃ অঙ্গুলীতেই রহিয়া গিয়াছে। রাজা অঙ্গুলি হইতে মণিমাণিক্য খচিত অঙ্গুরীগুলি উন্মোচন করিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে,—কৃতাঞ্জলিপুটে দস্যুকে প্রদান করতঃ প্রণাম করিলেন। দস্যু আনন্দিত চিত্তে রাজাকে বলিল,

"যতক্ষণ না আমি ফিরিয়া আসি, তুমি ভগবানের নাম জপ কর।"

আনন্দিত চিত্তে দস্যু প্রস্থান করিল। বহুকাল সে অরণ্যে আর প্রবেশ করিল না। রাজা সেই গুরুমূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া ভগবানের নাম জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। কি কঠোর ভক্তি বিশ্বাস!

"স্বয়ং ভগবান রাজার তপঃ প্রভাবে বিচলিত হইয়া মহাতেজা যোগি মূর্ত্তিতে আসিয়া দেখা দিলেন। রাজা বিশ্বাস করিলেন না, বলিলেন তুমি ত আমার গুরু নও। আমার গুরুদেব এখনও প্রত্যাগমন করেন নাই। তিনি আমাকে নাম জপ করিতে বলিয়া গিয়াছেন, ফিরিয়া আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন। রাজাকে আর গুরুর অপেক্ষায় থাকিতে হইল না। ভগবানের বিভূতি দর্শনে—প্রকৃত সুখ শান্তির আস্বাদ পাইলেন।"

এরূপ বিশ্বাস, ভক্তি কি কখন আমাদের আসিবে সাগরবালা? হৃদয়ের অস্থি-মজ্জা দিয়া যে এরূপ বিশ্বাস ও ভক্তি আনিতে পারে, সেই প্রকৃত সুখের মুখ দেখিতে পায়।"

"সংসারে থাকিয়াই ত সব পাওয়া যায়!"

"তোমার প্রাণে ভয় হইল বুঝি? বেশ জানিও আজই আমি সন্ন্যাসী সাজিয়া বনে যাইতেছি না। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও।"

"ঠাট্টা কর কেন? বলি সংসারে থাকিয়াই ত সব হইতে পারে?"

"কেন হইবে না? সংসারই ত প্রকৃত সাধনার স্থান। বরঞ্চ অরণ্য অপেক্ষা সংসারকে উৎকৃষ্ট স্থান বলা যাইতে পারে!"

"নিশ্চিন্ত হইলাম।"

"আমিও তাহা বুঝিয়াছি! এতক্ষণ ভয়ে তোমার হৃদয়টা দুর্ দুর্ করিতেছিল—কেমন নয়?"

"যাউক সে কথা কবে তুমি যাইবে?"

"প্রত্যুষে।"

"তোমার জীবনের অতীত কথাগুলি আমি আজ শুনিব।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পৌষ মাস। কন্‌কনে শীত। শীতের সন্ধ্যায় মধুপুরের বাঙ্গালায় বসিয়া স্বামী স্ত্রীতে উপরোক্ত কথোপকথন হইতেছিল। পার্শ্বে আট মাসের ছোট খোকা বদা নিদ্রা যাইতে যাইতে দিয়ালা করিতেছে। অদূরে মেজ খোকা মকু—গোলাপফুলের বাগানে ছুটাছুটি করিতেছে। নারায়ণ দারবান সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ক্রোড়ে উঠাইতে পারিতেছে না। স্বামী ভবরাম বন্দোপাধ্যায় ও তাঁহার স্ত্রী সাগরবালার পরিচয় এক্ষেত্রে আবশ্যক।

ভবরামের বয়স চল্লিশে পদার্পণ করিতে এখনও পূর্ণ এক বৎসর অবশিষ্ট থাকিলেও বার্দ্ধক্যের চিহ্ন পূর্ণ ভাবেই দেহে প্রকটিত। সম্মুখের একটি দন্ত স্খলিত, অপর কয়েকটি পতনোন্মুখ হইয়া নড়াচড়া করিতেছে। মস্তকের কেশগুলি প্রায় সমস্তই শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে, কেবল দুই আনা আন্দাজ এখনও কৃষ্ণাকারে বর্ত্তমান। স্বাস্থ্য ভগ্ন, নিজের ও ছেলে দুটীর স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য মধুপুরে হাওয়া বদলাইতে আসিয়াছেন। ধর্ম্মভাব ও সাধুতার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে থাকিলেও সংসারের কোলাহলে স্বার্থান্ধকারে পড়িয়া সর্ব্বক্ষণ হাবুডুবু খাইতেছেন।

স্ত্রী সাগরবালা একবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। দেখিতে গৌরাঙ্গী নহেন শ্যামবর্ণা! সাগরবালা যদিও তিনটি সন্তানের জননী—কিন্তু স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকায় তিনটি সন্তানের জননী বলিয়া পাড়ার মেয়েরাও ধারণা করিতে পারেন না। গোলগাল গড়ন। যৌবনের ঢল ঢল লাবণ্য এই সন্তানের জননীকে এখনও ত্যাগ করিতে না পারিয়া সর্ব্বাঙ্গে আপনার পূর্ণ অধিকার বজায় রাখিয়াছে। সাগরবালার দশম বর্ষে বিবাহ হইয়াছে,—আজ একাদশ বর্ষ ভবরাম তাঁহাকে লইয়া ঘরকন্না করিতেছেন, কিন্তু এখনও বুঝিতে পারেন না সাগরবালাকে ভগবান কি ধাতুতে গঠিত করিয়াছেন। সাগরবালার ব্যবহারে ভবরাম বাবু কখন আনন্দে আত্মহারা হন,—ভাবেন এই সংসারেই স্বর্গ আছে,—যাহারা স্বর্গের পৃথক স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাঁহারা ভ্রান্ত। অথবা লোক ভুলাইবার জন্য একটা কাল্পনিক স্বর্গের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। আবার এক একবার সাগরবালার প্রকৃতি দেখিয়া ভবরাম দুঃখে মিয়মান হইয়া পড়েন; ভাবেন—লোক সংসারে থাকে কেন? যাহার সহধর্ম্মিণীর সহিত মতের মিল—মনের বনিবনা হয় না, তাহার সন্ন্যাসী হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করাই শ্রেয়ঃ! লোক সংসারকে কেন সুখের স্থান বলে? সংসার স্বর্গ নহে নরক!

সত্য সত্যই সাগরবালার সহিত যখন ভবরামবাবুর মতের মনান্তর হয়, তখন ক্রোধে, ঘৃণায় তাঁহার চক্ষু লাল হইয়া উঠে,—

তখন সারা পৃথিবীটা যেন অন্ধকার বলিয়া বোধ হয়! কাজ কর্ম্মে মনোযোগ নাই, লাভ ক্ষতির দিকে দৃক্‌পাত নাই,—ছেলে দুটীও যেন তাহার নিজের ছেলে নহে এমন ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাদের গর্ভধারিণীর সঙ্গে মতান্তর তাদের সঙ্গে আবার সম্পর্ক কি? কাজেই তখন ভবরামবাবুর চক্ষে এই পৃথিবীখানা যেন একটা কঠিন পাথরের মত হইয়া যায়। যেন সব নিস্তব্ধ,—নিস্পন্দ, অন্ধকার! যেন এখানে পশু পক্ষী নাই,—লোকজন নাই,—গাছপালা নাই! আছে কেবল ভবরামের উত্তপ্ত, মর্ম্মাহত, অন্তর্দগ্ধ হৃদয়! সেই হৃদয়খানা তখন পৃথিবীর গভীর অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া থাকে, তাহার কোন সাড়া শব্দও থাকে না!

পাঠক! পাঠিকা! তোমরা হাসিতেছ? যুবতী পাঠিকারা হাসিতে পার। কিন্তু পাঠক! তোমার যদি সহধর্ম্মিণী লইয়া ঘর করা অভ্যাস থাকে তবে তুমি হাসিও না! বুকে হাত দিয়া বল দেখি তোমরাও এরূপ দিন হয় কি না? একা ভবরামের কথায় হাসিলে চলিবে কেন? আর ভবরামের এ অবস্থা তোমরা কি অস্বাভাবিক বলিয়া মনে কর?

মাঝে মাঝে সাগরবালার সঙ্গে ভবরামবাবুর মতের মিল হয় না। ইহার জন্য দম্পতী যুগলের মধ্যে কে দায়ী তাহা পাঠক পাঠিকা বিচার করুন। আমরা যাহা জানি তাহাই কেবল বলিয়া যাইব।

ভবরামবাবু বলিলেন—"সাগরবালা! সন্ধ্যা হইতে জানালা দরজা বন্ধ করিয়া ঘরে আলো জ্বালিয়া শুইয়া আছ। তোমাকে শত বার বলি, তবু তুমি শুনিবে না। নির্ম্মল বায়ু গৃহে প্রবেশ করিতে না পারায় কেবল তোমার নয়, ছেলে দুটীরও স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে যে! স্বামীর কথা না শুনিয়া তাহার যে অপমান করিতেছ এই অপমানের তুলনায় তোমার পাপের মাত্রা অধিক হইতেছে। সে দিন তোমাকে এত করিয়া বুঝাইয়াছিলাম যে ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় অক্সিজেন পুড়িয়া যাবার ভয়ে রাত্রে ঘরে আলো জ্বালিয়া রাখেন না।"

সাগরবালা বলিল "তোমার সবই অনাসৃষ্টি কথা! হিম লাগিয়া ছেলেদের অসুখ করিবে যে!"

এই সামান্য কথায় তখনই ভবরামবাবুকে চণ্ডাল স্পর্শ করিল! তিনি যদি তখন মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা করিয়া দুই কথা বুঝাইয়া বলেন, তাহা হইলে সকল গোল মিটিয়া যায়! তাহা না করিয়া বিষম উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "যদি হইলে—অসুখ করিলে তোমাকে ত আর ডাক্তার আনিতে ছুটিতে হইবে না, সে কাজটা ত করুণাময়কেই করিতে হয়।"

করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায় ভবরামের অনুজ। করুণাময় ভবরামের কর্ম্মের সঙ্গী, এমন কি দক্ষিণ হস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহারা দুই ভ্রাতাই ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ই ইহাদের উপজীবিকা। নৌকা যেরূপ দাঁড়ি মাঝি উভয়েরই সাহায্য না পাইলে গভীর জলে একটানা স্রোতের মধ্যে বানচাল হইয়া যায়, ইহাদের

ব্যবসা তরণীগুলিও তদ্রূপ উভয় ভ্রাতার চেষ্টায় এখন স্রোতের মুখে উজান বহিয়া চলিতেছে! একের অভাব হইলেই বাণিজ্য তরণীগুলির বুঝি অস্তিত্বও থাকিবে না! হয় ত হাঁটুজলেই তরণী মগ্ন হইয়া যাইবে। ভবরামের মস্তিষ্কপ্রসূত বুদ্ধিরূপ রজ্জু ধরিয়া কনিষ্ঠ গুণ টানিয়া চলিয়াছে! প্রবল উজান টানও কনিষ্ঠের শক্তিকে খর্ব্ব করিতে পারে নাই! একতার বল,—বিশেষতঃ ভ্রাতার সহিত ভ্রাতৃশক্তি মিলিত হইলে সত্য সত্যই অসম্ভব সাধিত হইতে পারে! আবার ইহার সহিত যদি উপযুক্ত সুহৃদ বা মিত্রের শক্তি একত্র হয়, তবে শত বাধা, বিঘ্ন বিপত্তিতে সে শক্তি কখনও পরাভব স্বীকার করে না! আবার ইহার সহিত যদি উপযুক্ত ধার্ম্মিক কর্ম্মচারীর কর্ম্মশক্তির সমাবেশ ঘটে, তবে সে বাণিজ্যতরণী পৃথিবীর সর্ব্বশক্তির কাছে অজেয় হইয়া উঠে! যাউক সে সব কথা। বলিতে বসিয়াছি সাগরবালার কথা, তাহার উপর ভাসাইলাম বাণিজ্যতরণী! লোকে হাসিবে যে!

রাত্রি ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। ভবরামবাবু ব্যবসাস্থল হইতে আসিয়া দেখিলেন জানালা দরজা চারিদিক বন্ধ! পবনদেবের প্রপিতামহ সহস্র চেষ্টা করিয়াও সে শয়ন ঘরখানিতে যে প্রবেশ করিবেন, সাগরবালা এরূপ একটু ছিদ্রও খোলা রাখেন নাই! দেখিয়াই ভবরামের সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি

বলিয়াছি! এরূপ অবস্থায় আগে কথাকহা কি তোমার স্ত্রৈণের লক্ষণ বলিবে? দাম্পত্য প্রেমের মধুরত্ব যাহাদের হৃদয় অনুভব করিবার শক্তি নাই, তাহারাই হিংসা করিয়া অপরকে স্ত্রৈণ বলে! আজকালকার লোকের যাহা নিজের নাই, তাহা অপরের দেখিলেই হিংসা হয়। যাউক সে কথা।

ভবরামবাবুর সহিত সাগরবালার বিবাদের সূত্রপাতই হইত না—যদি তিনি মস্তিষ্ককে শীতল রাখিয়া ধীর স্থির ভাবে যেখানটা মতের অনৈক্য হইতেছে, সেইখানটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। ভবরাম বাবু একবার বলিলেন "এটা কর'না সাগরবালা।" সাগরবালা অভ্যাসবশতঃ অথবা অজ্ঞতাপ্রযুক্ত সে কাজটা বিশৃঙ্খলতার সহিত করিয়া ফেলিল। ক্রোধ বা বিরক্তি—প্রকাশ করা অপেক্ষা এ ক্ষেত্রে অর্দ্ধাঙ্গিণীর ভুল বা অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কেবল ভবরাম কেন—সংসারের অনেক ভবরামই তাহা করেন না। সুতরাং ভবরামের ন্যায় অশান্তিও মাঝে মাঝে তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হয়।

আর একটি বিষয়ের জন্য ভবরামের সঙ্গে সাগরবালার মতভেদ ঘটে। ভবরাম ইচ্ছা করেন সাগরবালাকে নিজেদের বংশের রক্তমজ্জার সহিত মিশাইয়া লইতে। ভবরামের ইচ্ছা, সাগরবালার পিত্রালয়ের আচার-ব্যবহার, কিছুই সাগরবালাতে থাকিবে না; কিন্তু সাগরবালা একবারে তাহা ত্যাগ করিতে পারে না—

অথবা তাহা ইচ্ছা করে না! ভবরাম ভাবে, সাগরবালার মা, ভগ্নী, সহোদর কি সাগরবালার মত আমাকে বা আমার ভাইকে ভালবাসিতে বা স্নেহ করিতে পারে? আমাকে একটু পারিলেও তাহারা ত আমার ভাইকে বা ভ্রাতৃবধূকে ততটুকুও পারিবে না। তবে সাগরবালা তাহাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া চলিবে কেন? এই সব মানুষগুলার সঙ্গে সাগরবালার মত না মিশিলেও স্বামীকে প্রকাশ্যে কোন কথা বলিতে পারিত না। "দাম্পত্য কলহে চৈব" ভয়ে ভবরামও তাহার পিত্রালয়ের বিপক্ষে জোর করিয়া কিছু বলিতে পারিত না। দুজনের মধ্যে এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণে মাঝে মাঝে দম্পতী যুগলের মধ্যে একটু একটু ক্ষুদ্র ব্যবধানের মত ক্ষণেকের জন্য কলহের সৃষ্টি হইত। ইহা কিন্তু আবার ভবরাম বাবুর আগ্রহেই দিন কতক পরে গাঢ় মিলনে পরিণত হইত। কিছুদিন আর কোনরূপ তর্ক বা মতভেদ দম্পতিযুগলের মধ্যে তিষ্ঠিতে পারিত না।

সাগরবালার আর একটি দোষ বা গুণ তোমরা যা' বলিতে হয় বল,—সাগরবালা প্রত্যেক বিষয়টি স্বামীর নিকট জানিতে চায়। সে হয়ত ভাবে, আমি অর্দ্ধাঙ্গিনী—আমার অজানিত স্বামীর কি কার্য্য থাকিতে পারে। থাকিলেও তাহা অন্যায়। সাগর-বালা প্রত্যেক বিষয়েই স্বামীকে প্রশ্ন করে। "কোথায় গিয়াছিলে?" "কেন গিয়াছিলে?" "এত দেরী কেন?" পশ্চিম হইতে বেড়াইয়া

আসিয়া অবধি তোমার এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য ও ভিন্ন ভাব দেখিতেছি কেন? ইত্যাদিরূপ প্রশ্ন সাগরবালার প্রায়ই আছে। ভবরাম ভাবে সাগরবালা সব কথা বুঝিতে পারে না, বা পারিবে না—মিছামিছি বলিয়া লাভ কি! স্বামী যে অগ্রাহ্য বা অবিশ্বাস করিয়া সব কথা সাগরবালাকে বলে না, ইহা মনে না করিলেও ভবরাম সকল কথা সকল সময় না বলার জন্য সাগরবালা মনে মনে দুঃখিত হয়।

সাগরবালা মধুপুরে আসিয়া অবধি ভবরামের এই ভাবান্তরের কারণ সম্বন্ধে কতবার প্রশ্ন করিয়াছে—জানিবার জন্য কতবার কাকুতি মিনতি করিয়াছে—এ পর্য্যন্ত সাগরবালা স্বামীর নিকট তাহার সদুত্তর পায় নাই। তাহার যে জানিবার কোন অধিকার নাই, ইহাও স্থির করিয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিতে পারিতো না। জিজ্ঞাসা করিলে ভবরাম বাজে কথায় বা হাঁ—হুঁ করিয়া সারিয়া দেন। ভবরামের বিশ্বাস—বলিলে সাগরবালা সব কথা ধারণা করিতে পারিবে না, কিংবা কর্ত্তব্য পথে বাধা পাইবে; অতএব বৃথা বলিয়া ফল কি?

অনেক দিন হইতে স্বামীর ব্যবহারে ক্ষুন্ন হইয়া সাগরবালা আজ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে, যে সব কথা এতদিন স্বামী আমাকে প্রাণ খুলিয়া বলেন না,—এতদিন চেষ্টা করিয়াও যাহা শুনিতে পাই নাই, আজ সেই সব কথা শুনিবার জন্য লজ্জা স[illegible]

...া করিয়া স্বামীর সঙ্গে তর্ক করিবেন। কেন আমি কি অর্দ্ধা-
...নী নহি? আমি কি স্বামীর সকল কথা জানিবার, শুনিবার,
...বার অধিকারিণী নহি? আমি যদি বুঝিতে না পারি, যাহাতে
...তে পারি, সেরূপ ভাবে তিনি আমাকে উপদেশ প্রদান করেন না
...ন? সে জন্য কি আমি দায়ী! আমি ত তাঁহার আশ্রিতা,
...কনিষ্ঠা, শিষ্যা! তবে কেন তিনি আমাকে সব কথা প্রকাশ
...রিয়া বলিবেন না। সাগরবালার অনেকদিনের সঞ্চিত অভিমান,
... আজ হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়াছে।

সাগরবালার প্রকৃতিটা একটু বিভিন্ন রকমের। এইজন্যই
...জ পর্য্যন্ত ভবরাম বাবু সাগরবালাকে ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে
...রেন নাই। সাগরবালা অপর কোন স্ত্রীলোকের সহিত মেলা-
...শা করিতে ভালবাসে না। স্বামী এজন্য বিরক্তি প্রকাশ
...রিলে সাগরবালার প্রশান্ত চক্ষু দুটী জলভারাক্রান্ত হয়। বলে
...মার আলাপ করিতে ভাল না লাগিলে আমি কি করিব;
...া ভাল না লাগে, তাহা কি জোর করিয়াও আমাকে করিতে
...বে?"

ভবরাম বাবু বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলেন—"লোকে ইহাতে তোমাকে
... অহঙ্কারী বলিবে, না হয় সভ্যতা বা সামাজিকতা দুইটার একটাও
...ান না, এই প্রকার অনুমান করিবে।" সাগরবালা মাটীর দিকে
...লছল নেত্রদুটি স্থাপিত করিয়া বলে—"বিনা দোষে নিন্দা

করিলে আর আমি ক্ষয় হইয়া যাইব না।" আমরা কিন্তু জা
সাগরবালার সঙ্গে সকলের প্রকৃতি মিলে না বলিয়াই কাহার
সহিত সে মিশিতে পারে না। "মুখে এক পেটে আর" ই
সাগরবালা আদৌ পছন্দ করে না।

আজকালকার মেয়েদের মত সাগরবালা নবেলি ঢং জা
না। স্বামীর অনন্ত প্রেম, অফুরন্ত ভালবাসা কেবল যে তাহ
হৃদয়খানিতে ভরিয়া আছে, তাহা নহে সাগরবালার হৃদয়খা
ধর্মভাবে পূর্ণ! তাঁহার কথাবার্ত্তা হইতে পাঠক হয় ত কতকটা উ
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন; কিন্তু কথায়, ইঙ্গিতে বা কা
ভবরামকে ইহা জানিতে দিতে সে লজ্জাবোধ করিত। স্বা
কার্য্যে ব্যস্ত, ২টা বাজিয়া গিয়াছে, তবু তিনি আহার করিব
সময় পান নাই। সাগরবালাও শুষ্ক মুখে বসিয়া আছে, একটু জ
পর্য্যন্ত উদরস্থ হয় নাই। স্বামী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তো
মুখ শুখাইয়া গিয়াছে, তুমি কি এখনও জল পর্য্যন্ত খাও না
সাগরবালা?"

সাগরবালা লজ্জায় আমতা-আমতা করিয়া বলিল,—"অ
আমার শরীরটা ভাল নাই।" ভবরাম বাবু কখন সাগরবাল
মনের ভাবটা বুঝিয়া লইতেন, কখন বুঝিয়া উঠা তাঁহার পক্ষে কঠি
হইত! সাগরবালার প্রকৃতিটা ভবরামের নিকট প্রকৃতই জটি
এবং দুর্ব্বোধ্য ছিল।

বেশী টাকা লাভ পাওয়া যাইবে। আপনাকে উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মূল্যবান হার পরে গড়াইয়া দিব” ইত্যাদি।

সাগরবালা চিঠি পড়িয়া সেইদিনের ডাকেই লোহার সিন্দুকের চাবিটি পার্শেল করিয়া পাঠাইয়া দিল। ভবরাম বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“এইবার জানা যাইবে তুমি কত হাজার জমাইয়াছ?”

সাগরবালা সহজভাবে উত্তর করিল—“দরকার হয়, যাহা আছে ঠাকুরপো লইয়া খরচ করিবে। উহা তোমাদের কারবারের টাকা আমি আর লইয়া কি করিব?”

হরি! হরি! ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় হইতেছে বলিয়া ভবরাম বাবু যে আশা এতদিন হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন, তাহা সাগরবালা এক ফুৎকারেই উড়াইয়া দিল। ইহাতে ভবরাম বাবু কি করিয়া সাগরবালার প্রকৃতিটা বুঝিয়া উঠিবেন, তোমরা বল দেখি?

এদিকে কিন্তু সাগরবালা স্বামীর যথার্থই সহধর্ম্মিণী। বন্ধু বাৎসল্যতায়, অতিথি অভ্যাগতের সেবায়, আশ্রিত ও দাস দাসীর প্রতি যত্ন প্রকাশে, তাহাদের সুখ দুঃখ নিজের সুখ দুঃখের মত দেখিতে আতুর দীন দরিদ্রের সেবায় স্বামী অপেক্ষাও সাগরবালা অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। এসব বিষয়ে সাগরবালা সত্য সত্যই মুক্তহস্ত। দেবর করুণাময়কে সাগরবালা পুত্রাপেক্ষাও অধিক স্নেহ করেন।

যাউক সে কথা—ভবরাম বাবু মধুপুরে আসিয়া অবধি কেমন কেমন উন্মনা হইয়া গিয়াছেন। আজ কিন্তু সাগরবালা স্বামীর নিকট সকল কথা শুনিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে।

সাগরবালা লজ্জা, সরম, সংকোচ ত্যাগ করিয়া, ভবরাম বাবুকে আবার তাহার লুকান কাহিনী বলিল। ভবরাম বাবু প্রত্যুষেই সাগরবালাকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন; সুতরাং দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিলেন, "কোথা থেকে বলিব বল?"

স্বামীর সম্মতিতে সাগরবালা পুলকিত হৃদয়ে বলিল—"সেই যেদিন পশ্চিমে যাও, সেইদিন হইতে আরম্ভ কর।"

ভবরামবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন এবং সাগরবালা খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া বসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমি সেই—সালের ২৬শে অক্টোবর রাত্রে তোমার নিকট হইতে বিদায় হইয়া বোম্বে মেলে আরোহণ করিলাম। সমস্ত রাত্রিই নিদ্রায় অতিবাহিত হইয়া গেল। যখন আমার নিদ্রা ভাঙ্গিল তখন ভোর ৫টা। জানালা হইতে দেখিলাম—দুই পাশে শিশির-সিক্ত ধান্যক্ষেত্রগুলিতে কে যেন হীরকের মালা পরাইয়া দিয়াছে। মাঝে মাঝে অপরিচিত পক্ষীগুলি এক একবার ডাক দিয়া এদিক ওদিকে উড়িয়া যাইতেছে—তখনও সকল পক্ষী কুলায় পরিত্যাগ করে নাই। হেমন্তের আবির্ভাবে প্রকৃতি যেন জড়তার আবরণে অঙ্গ ঢাকিয়াছেন। কি সুন্দর প্রভাত! নিদ্রাভঙ্গেই আমি যেন নূতন দেশে—নূতন মানুষ হইয়া পড়িলাম। প্রকৃতির নানাবিধ শোভা অতিক্রম করিয়া, বাষ্পীয় শকট মৃজাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিন্ধ্যাচলের বিন্দুবাসিনী দেবীকে দর্শন করিবার অনেক দিন হইতে ইচ্ছা ছিল, আমরা মেল হইতে অবতরণ করিলাম। দেবী দর্শনে যাইব কি! এই প্রকার চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে শত শত দীর্ঘাকার বিশালবপু মৃজাপুরি পাণ্ডাদের বড় বড় বংশদণ্ড

ভবরাম সাগরবালাকে ভ্রমণ কাহিনী শুনাইতেছেন। সাগরবালা
সানন্দচিত্তে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। সাগর-

দেখিয়াই আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। ভারতভূমির প্রত্যেক পবিত্র তীর্থগুলি এই প্রকার দুরাচার অত্যাচারী পাণ্ডাদের জন্য ভয়াবহ স্থান হইয়া উঠিয়াছে। তীর্থক্ষেত্রের পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্য সত্য সত্যই নষ্ট হইতে বসিয়াছে। যখন সেই দশ পাণ্ডার দল বিপক্ষীয় শত্রুকে আক্রমণের ন্যায় আমাদিগকে ব্যূহের মত করিয়া বেষ্টন করিল, তখন ভাবিলাম এ ব্যূহ ভেদ করা ত সহজ নহে। যাহা কিছু সঙ্গে আছে, ইহারা কাড়িয়া লইবে। এখন কাড়িয়া লইয়াও ছাড়িয়া দিলে বাঁচি। সেই ব্যূহ হইতে গোলাগুলি ছোঁড়ার মত আমাদের উপর প্রশ্নের উপর প্রশ্ন বর্ষিত হইতে লাগিল। কোথায় আমরা থাকি ;—কোথা হইতে আসিতেছি, আমাদের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহের নাম কি, কতদিন থাকিব ইত্যাদি প্রশ্নবাণে আমরা জর্জ্জরিত হইয়া পড়িলাম। বন্ধুকে চুপি চুপি বলিলাম—আর কাজ নাই ভাই বিন্দুবাসিনী দর্শনে—এক্ষণে "যঃ পলায়তি স জীবতি।" বন্ধু বলিলেন—"ভয় কি, আমরা ত স্ত্রীলোক নই।" বন্ধুর কথায় আমার একটু ভরসা হইল। তাইত আমরা পুরুষ! আমাদের মত কাপুরুষের জন্যই বাঙ্গালীর বদনাম হয়। বাঙ্গালীর ইতিহাস হইতে "ভীরু" অপবাদটা ঘুচাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম।

বন্ধুর [illegible] বড় [illegible] করিয়া বিপুলাকার পাণ্ডা তাঁর [illegible]। সেই লোহা-বাধান যষ্টিখানি

এক হাতে উঠাইতে পারে, এরূপ বাঙ্গালী বুঝি অল্পই আছে। যাহা হউক বাঙ্গালীর ইতিহাস হইতে "ভীরু" অপবাদ ঘুচাইবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছি ; সুতরাং সেই হট্টগোলের মাঝে দেহের সমস্ত শক্তি ও সাহস একত্র করিয়া আমি নিভাঁজ হিন্দিভাষায় বলিলাম—"তোম্‌রা ডেরামেই হাম্‌ উঠেগা।"

পাণ্ডা অতিকষ্টে আমার মুখের ভাবগতিক দেখিয়া হিন্দিভাষাটা বুঝিয়া লইল। সেই ব্যূহ ভঙ্গ করিয়া দিয়া আমাদিগকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল। এই সাহস প্রকাশের জন্য আমি নিজে নিজেই আনন্দে ফুলিয়া উঠিলাম। ভাবিলাম—আমাদের জাতিটা কি ভীরু! আমাদিগকে শীকার পাইয়া পাণ্ডা মহারাজ বুক ফুলাইয়া, আনন্দে এক একবার আমাদের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। তীর্থক্ষেত্রের পাণ্ডাদের অত্যাচারকাহিনী বলিতে গেলে, একখানি বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে। তীর্থক্ষেত্রের কলঙ্ক মোচন ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য পাণ্ডাদের অত্যাচার দমন একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। পাণ্ডার নাম হীরালাল ঠাকুর। দীর্ঘাকার মূর্ত্তি বাহু আজানুলম্বিত, গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা। বক্ষে কপোলে স্রকচন্দন লেপিত। দেখিলে প্রাণে ভয়ের উদ্রেক হয়। বাঙ্গালী বুঝি তাহার একটি চপটাঘাতের ভারও সহ্য করিতে পারে না। মৃজাপুরের গুণ্ডার অনেক গল্প শুনিয়াছি,—পুস্তকে ও সংবাদ পত্রে মৃজাপুরের গুণ্ডাদের অত্যাচারের কথা অনেকবার পড়িয়াছি,

সেইগুলি বার বার মনে উদয় হইতে লাগিল। যাহা হউক হিরালাল পাণ্ডা আমাদের উপর কোন অত্যাচার করিল না—অধিকন্তু যাহা কিছু দক্ষিণা দিলাম, তাহাতেই সে সন্তুষ্ট হইল।

পর্ব্বতের নিম্নে পুণ্যতোয়া জাহ্নবী কলকলশব্দে বহিয়া যাইতেছে। উপরে বিন্দুবাসিনীর মন্দির। আমরা মাকে দর্শন করিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিলাম। বহুদিনের সাধ, বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতে বিন্দুবাসিনী দর্শন করিব। আজ সে সাধ পূর্ণ হইল। মনে বড়ই আনন্দ হইল। আমি ভাবিতে লাগিলাম হায়! হিন্দুর তীর্থভূমি! কত যুগযুগান্তরের স্মৃতি তোমরা বুকে করিয়া রহিয়াছ। হিন্দু! যদি প্রাণকে পবিত্র ও মহান্ করিতে যাও—তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া আইস! কত সাধু কত মহাত্মাদের পদরেণু স্পর্শ করিতে পাইবে। শরীর পবিত্র ও জীবন ধন্য হইবে।

বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতে বিন্দুবাসিনীকে দর্শন করিয়া, অপরাহ্নে আমরা "বিরোহীতে" আসিলাম। এই বিরোহীর "ঝামেরিয়ার" কথাই সে দিন তোমাকে বলিতেছিলাম।"

সাগরবালা একাগ্রচিত্তে স্বামীর "ভ্রমণ-কাহিনী" শুনিতেছিল। সাগরবালা প্রকৃতই আত্মহারা। এমন করিয়া ত ভবরাম কোন দিন সব কথা বলেন নাই!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"রাত্রে আমরা বিরোহীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমরা প্রয়াগে গঙ্গা যমুনা সঙ্গম দেখিয়াছি, মথুরা বৃন্দাবন ঘুরিয়াছি, আগ্রা গিয়াছি। আগ্রায় তাজমহল ইত্যাদি কত কি দেখিয়াছি; কিন্তু "বিরোহী" আমাদের এতই ভাল লাগিয়াছিল যে, "বিরোহীর" বিরহ এখন হৃদয়ে আঘাত করিতেছে।"

ভবরাম একটু থামিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"রাত্রে আমরা বিরোহীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এরূপ গম্ভীর নির্জ্জন স্থান জীবনে আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। রজনীর কেবল একটা সাঁ সাঁ শব্দ ব্যতীত আর কোন শব্দই শ্রুত হইল না। রজনীতে অজানিত পথে অজানিত দেশে গিয়া, প্রথমেই রজনী দেবীর এই একটা বিশেষত্ব দেখিলাম। বিরোহী একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশন। এখানে মেল কিংবা সকল গাড়ি ধরে না। সেই নিস্তব্ধ দেশের রজনীর আনন্দপূর্ণ সাঁ সাঁ শব্দ রেল গাড়ীর বিকট ভোঁষ-ভোঁষ পোঁ-পোঁ শব্দের মধ্যে এক এক বার যেন ডুবিয়া যাইতে লাগিল। ভাবিলাম প্রকৃতির এই বিরাট্

নিস্তব্ধভাব এত দূর দেশে—নিভৃতপল্লীর মাঝেও রেল কোম্পানি বাধা দিতেছে। ধন্য ইহাদের পুরুষকার।

বিরোহীতে বন্ধুবরের ভ্রাতা দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া আহারাদির পর শয্যাগ্রহণ করিলাম। বিরোহীর স্নিগ্ধ রজনীর সোঁ-সোঁ শব্দ শুনিতে শুনিতে ক্রমশঃ আমরা নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম।

প্রভাতে উঠিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। কি মনোরম স্থান! বাঙ্গালী বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পশ্চিমের দিকে ছুটিতেছে, ভ্রমণের জন্য নানা স্থানে যাইতেছে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, তাহারা সুন্দর "বিরোহী"কে দেখিয়া দেখে না। বাঙ্গালীর কি অকৃতজ্ঞতা! তাহারা বিরোহীর বুকের উপর দিয়া যায়, তত্রাচ ট্রেন হইতে অবতরণ করিয়া, তাহারা একবার "বিরোহী" দেখে না। এরূপ স্বাস্থ্যকর—এরূপ প্রকৃতির লীলাভূমি, এরূপ শান্ত মনোমুগ্ধকর পার্ব্বত্য পল্লী পশ্চিমের আর কোথাও আছে কি? বিরোহীতে কত দেবদেবী মূর্ত্তি, কত পূর্ব্বস্মৃতি, কত সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রম! দেখিলে প্রাণ মুগ্ধ হয়—হৃদয় বিমোহিত হয়। বিরোহী দেখিবার স্থান! সাধু সন্ন্যাসী, যোগী তোমরা যাইয়া দেখ, এমন পবিত্র, নির্জ্জন তপস্যার স্থান আর বুঝি কোথাও নাই! ভ্রমণকারী বাঙ্গালী! তুমি একবার যাইয়া দেখ, কত নূতন জিনিষ তুমি দেখিতে পাইবে। কত সন্ন্যাসীর আশ্রম, কত দেব দেবী, কত

পূর্ব্বের স্মৃতি, কত পৌরাণিক ব্যাপার, কত মহীরুহ, বৃক্ষ, লতা যাহা কখন চক্ষেও দেখনা, এই প্রকার কত নূতন জিনিষ তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। রোগ জীর্ণবাঙ্গালী তুমিও একবার যাইয়া দেখ,—দিন কয়েক "ভৈরব কুণ্ডের" স্বচ্ছ, পবিত্র, স্বাস্থ্যকর জল অঞ্জলি ভরিয়া পান কর, রোগাতুর দেহ সবল হইয়া উঠিবে। দম্ভ করিয়া বলিতে পারি—পশ্চিমে "বিরোহীর" মত স্বাস্থ্যকর মনোরম স্থান অতি অল্পই আছে! যাহারা সুখী ও বিলাসী বাবু, তাঁহাদের এস্থান অবশ্য ভাল লাগিবে না। কারণ এখানে দোকান পশার বাজার নাই, মধুপুর প্রভৃতি স্থানের ন্যায় খাদ্যদ্রব্য সহজে মিলে না এবং বিন্ধ্যাচল ও মৃজাপুর হইতে জিনিষপত্র লইয়া যাইতে হয় এখানে আছে উপাদেয় স্বাস্থ্যকর অগণ্য কূপ ও "ভৈরব কুণ্ডের" জল—যে জল সহজে কোথাও মিলে না। আছে স্বাস্থ্যকর পবিত্র বায়ুর স্বন স্বন শব্দ। আছে দেবদেবীর আশ্রম—পর্ব্বতোপরি প্রাণারাম পবিত্র স্থান। আর মিলাইবার মত যদি শক্তি থাকে- তবে মিলিবে মহাপুরুষ সাধু সন্ন্যাসীর দর্শন! তাই বলিতে কষ্ট হয়, যাহারা পশ্চিমে যায়,—যাহারা নানা স্থানে ঘুরিয়া অজস্র অর্থ ব্যয় করে—তাহারা এমন "বিরোহীকে" ত্যাগ করিয়া যায় কেন? এমন পুণ্য পবিত্র স্থান তাহারা একবার চক্ষেও দেখে না! বাঙ্গালীর সত্য সত্যই দুর্ভাগ্য। "বিরোহীতে" আমাদের দুই রজনী ও একটি দিন থাকিবার সুবিধা ঘটিয়াছিল; কিন্তু এই অল্প সময়ের

যে স্মৃতি আমরা বুকে ধারণ করিয়া আছি, তাহা বুঝি জীবনে বিস্মৃত হইতে পারিব না।

"বিরোহীর" সুন্দর প্রশস্ত পথে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কোথায় যাইব স্থির নাই, বন্ধুকেও কোন কথা বলি নাই। কেবল প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতেছি হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছে! মনে হইতেছে, যদি আমাদের উড়িবার শক্তি থাকিত, তবে ঐ পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে ছুটিয়া যাইতাম। মুখে কথা নাই। আমাদের মনোভাব তখন বাক্যের অতীত!

কিয়দ্দূরে গিয়া দেখিলাম কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ঘরের স্ত্রীলোক তাঁহাদের অভিভাবকদের সহিত পর্ব্বতে উঠিতেছেন। বন্ধু বলিলেন—"চল ঐ পথে যাই।" আমরা তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলাম। আমাদের পথ, ঘাট, দেশ, পাহাড়, জঙ্গল সমস্তই অজানা! কোথায় কি আছে, তাহা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি নাই; সুতরাং বন্ধুর কথাতেই অগ্রসর হইলাম। ভদ্রলোকগুলিও স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া বিন্ধ্যাচল হইতে বিরোহী বেড়াইতে আসিয়াছিলেন।

পর্ব্বতে উঠিয়া কিয়দ্দূর গমন করিবার পরেই আমরা অষ্টভুজা যোগমায়া দেবীর দর্শন পাইলাম। পুরাণে লিখিত আছে যে, এই পর্ব্বতে শুম্ভ ও নিশুম্ভের সহিত ভগবতী যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

পাহাড়ের উপর প্রায় দুই ক্রোশ বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র পর্ব্বতবাসী একটি সাধুর নিকট শুনিলাম, ইহাই যুদ্ধস্থল পাহাড়ের উপর এতটা সমতল ভূমি কিরূপে হইল, চিন্তা করিলে কত কথাই মনে হয়! কত যুগ-যুগান্তরের স্মৃতি মনোমধ্যে উদিত হইয়া যেন একটা তুফান বহিয়া চলিয়া যায়!

আমরা পাহাড়ের উপর দিয়া অতি সঙ্কীর্ণ পথে আবার বহুদূর অগ্রসর হইয়া আসিলাম। প্রকৃতই তখন আনন্দে জ্ঞানহারা; আবার—আবার হাঁটিয়া চলিলাম। কতদূর আসিলাম মনে নাই; আবার বহুদূর হাঁটিয়া চলিলাম। পাহাড়ের উপর অদূরে এবার একটি মন্দির দেখিতে পাইলাম। মন্দির লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে চলিতে লাগিলাম। আরও কিয়দ্দূর হাঁটিয়া আসিবার পর মহাকালীর মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পর্ব্বতোপরি কি মহান্ পবিত্র এই স্থান! প্রকৃতই ইহা দেবতার আশ্রয়। এরূপ নির্জ্জন, পবিত্র স্থান জীবনে আর কখনও দেখি নাই। পাষাণের হৃদয়ও এখানে আসিলে ভক্তিরসে বিগলিত হইয়া যায়। ভাষায় সে আনন্দ ব্যক্ত করিবার নয়। প্রাণ এক মহান্ ভাবে অধীর হইয়া বিশ্বপতির চরণে এই পাপতাপ পূর্ণ হৃদয় লুটাইয়া পড়িল। শুনিয়াছিলাম স্থান মাহাত্ম্যের একটা বিশেষত্ব আছে; আজ সত্য সত্যই তাহার প্রমাণ পাইলাম। আমার ইচ্ছা ছিল না যে, সে স্থান হইতে আবার এই পাপতাপপূর্ণ সংসারে ফিরিয়া

পাই ; কিন্তু কর্ম্মের বন্ধন ঘুচাইতে পারে, এমন সাধ্য কাহার ? হায় ! বিরোহীতে যে এত আনন্দ আছে, তাহা কে জানিত ? এই বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতে দেবীর পদরেণু পড়িয়া আছে—কত মহাতপা যোগী সন্ন্যাসীর পদরেণু এই ধূলার সহিত মিশিয়া আছে, এখনও মিশিতেছে ;—যে সমস্ত মহাপুরুষকে শত জন্ম তপস্যা করিলেও আমরা সংসারতপ্ত জীব দেখিতে পাই না—আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে এই পর্ব্বতোপরি তাঁহারা নিত্য বিরাজ করিতেছেন। এরূপ পবিত্র মহান্ স্থানে এস সংসারতাপদগ্ধ জীব—একবার আসিয়া প্রাণ জুড়াইয়া যাও। এমন নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, পবিত্র, স্থান,—যে স্থানে কত যুগান্তরের কীর্ত্তি—কত মহাপুরুষের স্মৃতি বিজড়িত,—মা জগৎ জননীর লীলানিকেতন, এমন স্থান আর কোথাও আছে কি ?

দেখিলাম পর্ব্বতোপরি মহাকালী মন্দিরের শতাধিক হস্ত দূরে একটি বিল্ববৃক্ষ। কত শত বর্ষা, শীত, গ্রীষ্ম এই বৃক্ষ যে মাথায় করিয়া ধরিয়াছে, তাহা কে বলিবে ? শত শত বর্ষের স্মৃতি যেন এই মহাবৃক্ষের অস্থিপঞ্জরে জড়িত রহিয়াছে। কত যোগী,—কত মহাপুরুষ যে এই পবিত্র বৃক্ষমূলে বসিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন তাহা কে বলিবে ? এই বিল্ববৃক্ষতলে যে কত সিদ্ধ মহাপুরুষের পদরেণু পড়িয়া আছে, তাহা কে বুঝিবে ? সেই বিল্ববৃক্ষের পত্ররাজী যেন স্বন স্বন শব্দে বলিতেছে—আইস সংসার তাপদগ্ধ

জীব, আমার মূলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ কর। আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে; যে ক্ষুধায় তোমরা জর্জ্জরিত,—যে ক্ষুধায় তোমাদের দুঃখের বিরাম নাই, সে ক্ষুধা আর থাকিবে না। সংসার কীট আমরা—সেই বিল্ববৃক্ষের ছায়ায় যাইয়া হৃদয় যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। আমরা কোন্ অজানা রাজ্যে কাহার প্রেরণায় যে আসিয়া পড়িলাম, ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহার কি মীমাংসা করিব?

সেই বিল্ববৃক্ষতলে দেখিলাম ধ্যানমগ্ন জটাজুটধারী, সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম-বিলেপিত, এক সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন; তাঁহার বাহু আজানু-লম্বিত—দেহ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়,—প্রশস্ত ললাট, প্রশান্ত মুখ মণ্ডল; —অঙ্গের পবিত্র জ্যোতি যেন সেই পর্ব্বতোপরি বিকীর্ণ হইতেছে! সন্ন্যাসী মৃত না জীবিত? হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন জীবনের চিহ্নমাত্র সে দেহে নাই! নিশ্চল স্থাণুবৎ মহাপুরুষ ধ্যাননিমগ্ন রহিয়াছেন। চক্ষের পলক নাই, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের চিহ্নমাত্র নাই—পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় যোগাসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ভাবিলাম আজ আমাদের সুপ্রভাত! এরূপ মহাপুরুষ দর্শন জীবনের আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু! ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে মহাপুরুষকে প্রণাম করিলাম।

বহুক্ষণ মনে মনে মহাত্মাকে আরাধনা করিলাম। একটিবার যদি চক্ষুরুন্মীলন করেন, তবে তাঁহার কথা শুনিয়া প্রাণের ব্যথা

জুড়াইব। বহুক্ষণ অতীত হইয়া গেল—প্রাণের সাধ পূর্ণ হইল না। ভাবিলাম হয় ত এ অদৃষ্টে সে আশা পূর্ণ হইবে না।

হৃদয়কে দৃঢ় করিলাম। ভাবিলাম এমন পবিত্র স্থানে এই মহাপুরুষের নিকটে যতক্ষণ আছি, দেহে পাপবিন্দু স্পর্শ করিতে পারে না। আমার প্রাণের বেদনা—অন্তর্যামী মহাপুরুষ ইনি কি বুঝিবেন না? আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যোগীবরকে আবার একমনে ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলাম। বিমল আনন্দে হৃদয় ভরিয়া গেল! অন্য কোন চিন্তাই আমার হৃদয়ে স্থান পাইল না।

দয়ার আধার, অন্তর্যামী, বাহ্যজ্ঞানহীন, যোগরত মহাপুরুষ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না! চক্ষুরুন্মীলন করিয়া আমার দিকে চাহিলেন। সে সম্মোহন-দৃষ্টিতে যেন অরণ্যের হিংস্র জন্তুও পদানত হইয়া পড়ে। তাঁহার চরণ-সমীপে মস্তক অবনত করিলাম। তিনি মৃদু হাসিয়া আমাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তখনকার আনন্দ আমি তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব সাগরবালা?

সাগরবালার তখন নয়নাশ্রুতে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতেছে। স্বামীর বচন-সুধা পান করিতে করিতে সাগরবালা তখন বাহ্য জ্ঞান হারাইয়াছে। জীবনের মধ্যে এমন একদিনও ত সাগরবালার অদৃষ্টে আসে নাই।

ভবরাম বলিতে লাগিলেন,—মহাপুরুষ আবার ধ্যানে মগ্ন হইলেন। আমি চক্ষু মুদিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিতে করিতে বলিলাম

"আমার জীবনে শুভমুহূর্ত্তই যদি আসিল দেব, তবে কি পাপে তাহা নিষ্ফল হইয়া গেল!" বালকের ন্যায় মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া আমি রোদন করিতে লাগিলাম। এইভাবে কতকক্ষণ অতীত হইয়া গেল মনে নাই!

আবার সেই শুভমুহূর্ত্তের উদয় হইল। মহাপুরুষ চক্ষু চাহিলেন। প্রশান্ত, তেজঃব্যঞ্জক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সে দৃষ্টির দিকে আমি চাহিতে পারিলাম না। সভয়ে আমি মস্তক অবনত করিলাম।

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে বলিলেন—"তোমার প্রশ্নের মীমাংসা এখন হইবার নয়। বাবা! কর্ম্ম হইতেই কর্ম্মের উৎপত্তি,—আবার কর্ম্মেই কর্ম্মের বিনাশ হয়! কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করিয়া যাও; কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা করিও না। কর্ম্মের কর্ত্তা যে তুমি,—ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কর্ম্মে এ অহঙ্কার কখনও হৃদয়ে স্থান দিও না। সংসারে ধূলা কাদা অনেক মাখিতেছ—সময় হইলেই সমস্ত ক্লেদ শরীর হইতে দূর হইবে।"

সন্ন্যাসী কি সত্যসত্যই অন্তর্যামী? আমি ত প্রাণের কথা তাঁহাকে মুখ ফুটিয়া বলি নাই। তবে কি করিয়া আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল-নিহিত প্রশ্ন তিনি বুঝিতে পারিলেন। বুঝিলাম, হিন্দুর যোগবল জগতে অদ্বিতীয়। এরূপ শক্তি, এরূপ তেজ জগতে আর কিছুরই নাই। বুঝিলাম, কেন আমাদের দেশ সমস্ত ত্যাগ করিয়াও

এত বড় হইয়াছিল। জানিলাম, রাজমুকুট কেন তাঁহারা অকিঞ্চিৎকর ধূলিমুষ্টির ন্যায় দেখিতেন। হায়! হিন্দুর এরূপ কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া আমরা কাচের জন্য ছুটাছুটি করিতেছি। যে জিনিষ উপলব্ধি করিতে পারিলে অগণিত রাজৈশ্বর্য্য তুচ্ছ বোধ হয়, সে জিনিষকে ভস্মস্তূপে প্রোথিত করিয়া, অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ, পার্থিব সামগ্রীর জন্য লালায়িত হইতেছি। আমরা 'সুখ সুখ' করিয়া সুখের পশ্চাতে ছুটিয়া চলিয়াছি—বিমল-সুখ কি এখানে মিলে? আমরা অশান্তি, দুঃখ বলিয়া চীৎকার করিতেছি—অশান্তি, দুঃখ কি পার্থিব বস্তুলাভে দূর হইবে! তাহা যে হইবার নয়। প্রাণের সহিত প্রাণের যোগ না হইলে যেমন প্রেম হয় না—প্রাণের সহিত অনাদি বস্তুর যোগ না ঘটিলে সেইরূপ অশান্তি ও দুঃখের নাশ হয় না। বৃথা চীৎকারে, বৃথা চেষ্টায়, আমাদের দুঃখ, দৈন্য, অভাব, অশান্তি ঘুচিবে না। ভারত যদি আবার সেই অতীতের ভারত হয়, আমাদের পদতলে অগণিত রাজৈশ্বর্য্য লুণ্ঠিত হইবে—ভারতে আবার সুখ-শান্তির উৎস ছুটিবে। নচেৎ সহস্র চেষ্টাতেও ভারতবাসী প্রকৃত সুখৈশ্বর্য্য অর্জ্জন করিতে পারিবে না। কত দেশ সুখসমৃদ্ধির জন্য যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত রহিয়াছে—তাহাতে কি তাহারা কখন প্রকৃত সুখ-শান্তির মুখ দেখিতে পাইতেছে? রাজ মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া, কেহ কি কখন দুঃখ, অশান্তি দূর করিতে পারিয়াছে? কিন্তু ভারত এক

দিন সত্য সত্যই সুখ-শান্তির মুখ দর্শন করিয়াছিল—যাহা এখনও জগতের আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু হইয়া রহিয়াছে।

মহাপুরুষ আর চক্ষুরুন্মীলন করিলেন না। সেই বিল্ববৃক্ষতল ছাড়িয়া, তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আমার আর বিন্ধ্যাচল পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু কর্ম্মের বন্ধন,—মায়াশৃঙ্খল ছিন্ন করিতে পারি, আমার সে পুণ্যশক্তি কোথায়?

মনের আবেগে, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আমরা পর্ব্বতোপরি সেই মনোরম স্থানে গিয়াছিলাম। আসিবার সময় কত কি হারাইয়া আবার কত অমূল্য নিধি লাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলাম। অবসাদে হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পর্ব্বতে পর্ব্বতে আসিবার পর আমাদের জ্ঞান হইল যে বিরোহীর বাসা হইতে আমরা বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। কেহ বলিল--দশ ক্রোশ। কেহ বলিল আরও অনেক বেশী। আমার সঙ্গী হীরালাল বলিল—"পর্ব্বতের উপরেই আমরা দশ ক্রোশ আসিয়াছি। পর্ব্বতের নিম্নদেশ হইতে বিরোহীর বাসা কত ক্রোশ কে জানে?"

ভবরামবাবু আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—আমরা অবসন্ন হৃদয়ে কত ক্রোশ হাঁটিয়া আসিয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলাম বলিতে পারি না। যখন বিরোহীর বাসায় আসিলাম, তখন সন্ধ্যার অধিক বিলম্ব নাই। পরিশ্রান্ত-হৃদয়ে আমরা বন্ধু সমীপে উপস্থিত হইলাম।

সমস্ত দিন পর্ব্বত-ভ্রমণে আমাদিগকে চিনিবার উপায় ছিল না। আনন্দে আমরা ক্ষুৎপিপাসাও বিস্মৃত হইয়াছিলাম।

বিরোহীর বাসার সকলে আমাদের জীবনের আশা একরূপ ত্যাগ করিয়াছিলেন। সমস্ত দিন অনুসন্ধান করিয়া যখন আমাদের সংবাদ কেহ পাইলেন না, তখন ভাবিলেন পর্ব্বতে ব্যাঘ্র ভল্লুকের উদরগহ্বরে আমাদের জীবনলীলা সমাপ্ত হইয়াছে। এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যের জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট যথেষ্ট তিরস্কৃত হইলাম।

বিরোহীর বাসায় একটি পরিচারিকা—পঞ্চদশ বর্ষীয়া "কামেরিয়া" ছল ছল নেত্রে হর্ষ-বিষাদে পাহাড়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—"সেদিন বাবু! ঐ পাহাড়ে তিনটা মানুষকে বাঘে ধরিয়াছে। কেন তোমরা এমন কাজ করলে।" আহা সে স্বরে কি ব্যাকুলতা! যেন সে আমাদের কত আপনার! মুখখানি দুর্ভাবনায় পূর্ণ। যদিও আমাদিগকে দেখিয়া তাহার হর্ষ হইয়াছে, তবু এখনও সে মুখমণ্ডল হইতে আশঙ্কা, ব্যাকুলতা অন্তর্হিত হয় নাই। শুনিলাম সে আমাদের জন্য সমস্ত দিন চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়াছে,—এখন পর্য্যন্ত কিছু খায় নাই! ভাবিলাম এই বিরোহীর জঙ্গলে,—ক্ষুদ্র বন্য পল্লীর মধ্যে,—অসভ্য জাতির গৃহে লালিত পালিত কে এই মমতাময়ী কারুণ্যরূপিণী বালিকা! স্নানাহার করিয়া বিশ্রাম করিতে গেলাম—অন্য চিন্তা আর হৃদয়ে

স্থান পাইল না। কেবল আপনা আপনি প্রশ্ন করিতে লাগিলাম-কে এই বালিকা? এরূপ স্নেহ, দয়া, সহানুভূতি, সরলতা কি বন্য জাতিতে আছে? রাত্রে বন্ধুকে একবার জিজ্ঞাসা করিলাম ঝামেরিয়া খাইয়াছে কি না? বন্ধু বলিলেন "হাঁ।" আমি বন্ধুকে ঝামেরিয়ার সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলাম। বন্ধু শেষে আমার প্রশ্নবাণে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিল—"তোমার কি অন্য কথা নাই, ঝামেরিয়ার এত খোঁজ কেন?" আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলাম না।

দেখিলাম ঝামেরিয়া সেই সন্ধ্যা হইতে রজনী দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বাসার কাজ কর্ম্ম করিতে লাগিল। যাহারা পশ্চিমে গিয়াছে, তাহাদের পশ্চিমের জলকষ্টের কথা অবিদিত নাই। ৭০।৮০ হাত নিম্নস্থ কূপ হইতে জল তুলিতে হয়। একটি কলস কূপ হইতে জল পূর্ণ করিয়া উত্তোলন করিতে কতটুকু সময় ও কতটুকু পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা বোধ হয় বাঙ্গালা দেশের লোক কল্পনাতেও আনিতে পারিবে না। ঝামেরিয়া সন্ধ্যায় দীপ জ্বালিয়া কূপ হইতে পঞ্চাশ কলসী জল উঠাইল। আমরা সে দিন অতিথি হওয়ায়, তাহার পরিশ্রমটা খুবই বাড়িয়াছিল। উচ্ছিষ্ট তৈজসপত্রাদি সেই কূপের জলে মার্জ্জনা করিল। পাকশালা পরিষ্কার হইলে পর দিনের রন্ধন, মুখ-প্রক্ষালন ও শৌচাদির জল পৃথক পৃথক পাত্রে রাখিয়া দিল। ইহা ব্যতীত সাংসারিক সমস্ত কার্য্যই সে

বিরোহীর কূপের দৃশ্য।

একটি স্ত্রীলোক কূপ হইতে জল উত্তোলন করিতেছে।

সম্পন্ন করিল। বাসায় স্ত্রীলোক নাই। পাচকঠাকুর সকলকে আহারাদি করাইয়া এরূপ নাসিকাধ্বনি করিতে লাগিল যে, নিস্তব্ধ প্রকৃতিদেবীও শঙ্কিত হইতে লাগিলেন। ঝামেরিয়া যেন দশভুজা—যখন যেটি যাহার আবশ্যক, তখনই সেইটি গুছাইয়া রাখিতেছে। তাহার শয্যা বিস্তারে পারিপাট্য, সাংসারিক কার্য্যে পরিচ্ছন্নতা, রন্ধন কার্য্যে উদ্যোগ, অতিথিকে যত্ন ও শুশ্রূষা, সকলের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ, সর্ব্বোপরি তাহার পরিশ্রম শক্তি দেখিয়া, গৃহস্থের পাকা গৃহিণীকেও মস্তক অবনত করিতে হয়। বাস্তবিকই ঝামেরিয়া যেন সে গৃহের লক্ষ্মীরূপিণী। ঝামেরিয়া জাতীতে পাহাড়িয়া। তাহার এক বৃদ্ধা জননী ব্যতীত আর কেহ নাই। ঝামেরিয়ার উপার্জ্জনের উপর তাহার মাতার জীবন নির্ভর করিতেছে। বুড়ী কাজ কর্ম্ম কিছুই করিতে পারে না। বাসা হইতে তাহার মাতার কুটীর প্রায় এক মাইল দূরে এক পাহাড়ের ধারে অবস্থিত। ঝামেরিয়ার পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলেও তাহার আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা সকলই সরলা বালিকার ন্যায়। বালিকার ন্যায় তাহার মুখখানিতে হাসি ও সরলতা ভরিয়া আছে। পাহাড়িয়ারা পরিশ্রমী হইলেও এই বালিকার ন্যায় পরিশ্রমশীলা বালিকা আর কোথাও দেখি নাই।

পূর্ব্বরাত্রে ঝামেরিয়াকে রজনী দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত গৃহকার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়াছি। প্রত্যূষে উঠিয়া দেখি—ঝামেরিয়া কূপ হইতে জল

উত্তোলন করিয়া ফুলগাছগুলিতে ঢালিতেছে। ফুলগাছগুলি ঝামেরিয়ার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। ঝামেরিয়া কি রজনীতে নিদ্রা যায় নাই?

সেই কন্‌কনে শীতের প্রত্যুষে ফুলগাছগুলিতে ঝামেরিয়া এক-মনে জল সেচন করিতেছে। আমি যাইয়া ডাকিলাম "ঝামেরিয়া।"

ঝামেরিয়া চমকিত হইয়া আমার দিকে চাহিল। পরে বলিল—"কেন বাবু পানি চাই?"

বিরোহীর অরণ্যে, পর্ব্বতে, ক্ষুদ্রপল্লী মধ্যস্থ বৃক্ষ-শিরে, সেই পর্ব্বতোপরি বিল্ববৃক্ষে তখনও রজনীর একটু একটু অন্ধকার, জমিয়া ছিল। বিরোহীর বিহঙ্গকুল তখনও কুলায় নিদ্রা যাইতেছিল। পূর্ব্বগগন তখনও রজনীর ক্ষীণ অন্ধকারে আবৃত। কেবল অদূরে বিরোহীর জঙ্গলে কি একটা বন্য পক্ষী কুলায় হইতে এক একবার সাড়া দিতেছিল। রজনীর শেষে উষার পূর্ব্বাগমনে, শিশির-সিক্ত শীতল বায়ু, পর্ব্বত, অরণ্য ভেদ করিয়া স্বন স্বন শব্দে দেশ-দেশান্তর বহিয়া চলিয়াছে। সে বায়ু মোটা গরম কাপড় ভেদ করিয়া আমাকে কাঁপাইয়া তুলিল। ঝামেরিয়ার কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। বালিকা কি নিদ্রা, শীত সমস্তই জয় করিয়াছে?

তখনও সমস্ত বিরোহী নিস্তব্ধ—নিদ্রাভিভূত। আমার ডাকে ঝামেরিয়া চমকিত স্বরে বলিল "কেন বাবু?"

"তুমি কখন ঘুমাইতে গেলে?"

"সেই তখনই বাবু—কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া।"

"কখন আবার উঠিলে?"

"এই একটু আগে।"

"তুমি কি প্রত্যহ এইটুকু নিদ্রা যাও?"

"হাঁ বাবু! আমি বেশীক্ষণ শুইয়া থাকিতে ভালবাসি না।"

"তুমি এখানে কত বেতন পাও?"

"দুই টাকা বাবু। আর মাকে, বৎসরে বাবু দুইখানি করিয়া কাপড় দেন।"

"তাতেই তোমাদের বেশ চলে?"

"হাঁ বাবু—মায়ের বেশ চলে।"

"তোমাদের বাড়ী কত দূর?"

ঝামেরিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদের বাটী দেখাইল।

আমি বলিলাম—"চল না ঝামেরিয়া তোমাদের বাড়ী দেখিয়া আসি।"

ঝামেরিয়া প্রথমতঃ একটু ইতস্ততঃ করিল। তাহার পর বলিল "একটি ক্ষুদ্র ভাঙ্গা পর্ণকুটীর দেখিয়া আপনার কি লাভ হবে—আর সে অনেকটা দূর বাবু।"

"তা হ'লেই বা ঝামেরিয়া—এখনও ত প্রভাতের বিলম্ব আছে, এখনই ফিরিয়া আসিয়া আবার কাজ করিবে।"

ঝামেরিয়া মস্তক নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। তারপর সে আগে

অগ্রে চলিতে লাগিল। কত কথা ঝামেরিয়াকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। সরলা বালিকা এক এক করিয়া তাহার উত্তর দিতে লাগিল। তিলমাত্র কপটতা সেই ক্ষুদ্র স্বচ্ছ হৃদয়খানিতে নাই। তবে কি ঝামেরিয়া দেববালিকা? অনেক কথার পর ঝামেরিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার বাপ কত দিন মরে গেছে ঝামেরিয়া?"

ঝামেরিয়া স্নিগ্ধ সরল চক্ষু দুটিতে এক দৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল। সে ইহার কোন উত্তর দিতে পারিল না। ভাবিলাম অতি শিশুকালেই হয় ত ঝামেরিয়ার পিতৃবিয়োগ হইয়াছে।

ঝামেরিয়ার করুণ কাহিনী শুনিতে শুনিতে কত দূরে আসিলাম, সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। হঠাৎ সে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—"বাবু ঐ আমাদের কুটীর।" কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া আমরা কুটীরের সম্মুখে আসিলাম।

পর্ব্বতের সন্নিকটে নিবিড় জঙ্গলের ধারে ঝামেরিয়ার বৃদ্ধা জননীর কুটীর। তাহার পার্শ্ব দিয়া ঝরণার স্বচ্ছ জল ঝির ঝির করিয়া প্রবাহিত হইতেছে! সেই শুভ্র জলরাশি দেখিলে মনে হয়, কে যেন বৃদ্ধার কুটীর-পার্শ্বে একখানি চাঁদি রূপার পাত বিছাইয়া রাখিয়াছে। অদূরে জঙ্গলের ধারে কয়েক বিঘা ভুট্টা খেত। মাঝে মাঝে দুই একখানি কুটীর। তখন আর দুর্বাদি পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। একটি বৃদ্ধ দুইটি মহিষ লইয়া জঙ্গলে

জীবনের একমাত্র অবলম্বন। এই অশীতিপর বৃদ্ধার এইরূপ শক্তিসামর্থ্যের পরিচয় শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। সহরে বিদ্যুতালোক-উদ্ভাসিত সুরম্য কক্ষে আরামে বাস করিয়াও বঙ্গ-ললনা ত্রিংশ বৎসর বয়সেই জরাগ্রস্থ হয়। হায়! কত পার্থক্য।

বৃদ্ধা অশ্রুসিক্ত মুখে বার বার ঝামেরিয়ার মস্তক চুম্বন করিয়া বলিল,—

"ঝামেরি! ঝামেরি! তুই ভাল আছিস ত মা?"

ঝামেরিয়া প্রফুল্লমুখে বলিল,—"হাঁ মা! ভাল আছি। এই বাবু কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। ইনি আমাদের কুটীর দেখিতে চাহিলেন, তাই সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি।"

বৃদ্ধা এতক্ষণ আমাকে লক্ষ্য করে নাই। অসময়ে ঝামেরিয়ার আগমনে সে আতঙ্কে জ্ঞানশূন্যা হইয়াছিল। ঝামেরিয়ার এই কথায় তাহার দৃষ্টি আমার উপর পড়িল।

আমাকে দেখিয়া যেন সে একটু জড়সড় হইয়া পড়িল। ঝামেরিয়ার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া তাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিল। ঝামেরিয়া কি বলিল জানি না; কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া যেন একটু আশ্বস্ত হইল। সে তাড়াতাড়ি একখানি মৃগচর্ম্ম কুটীরাভ্যন্তর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া আমাকে বসিবার নিমিত্ত তৃণাচ্ছাদিত এক সমতল ক্ষেত্রের উপর বিছাইয়া দিল।

বৃদ্ধা শঙ্কিতা ও সঙ্কুচিতা হইয়া আমাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিল। মাঝে মাঝে তাহার শুষ্ক মুখখানি আরও শুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিল। বোধ হয় ভাবিতেছিল, সে কি অন্যায় কথা আমাকে বলিয়া ফেলিয়াছে। বৃদ্ধার সহিত কথা কহিতে কহিতে বড়ই আনন্দ পাইতেছিলাম। আমার আরও কিয়ৎক্ষণ বৃদ্ধার সহিত তাহার শান্তি-কুটীরে বাস করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ঝামেরিয়ার অনেক কাজ আছে, সে ব্যস্ত হইতে লাগিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি ঝামেরিয়ার সঙ্গে বিরোহীর বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

ঝামেরিয়া বাসায় আসিয়াই আমাদের আহারাদির উদ্যোগ করিতে লাগিল। সেইদিনই আমাদিগকে এলাহাবাদ যাত্রা করিতে হইবে। আহারাদির পর এই কথা প্রকাশ করাতে ঝামেরিয়া আমাদের যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিল। সে যেন হিন্দু-গৃহের পাকা গৃহিণী! অসভ্য পাহাড়িয়া মেয়ে এমন গৃহিণীপণা কোথা হইতে শিক্ষা করিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। সে প্রত্যেক বিষয়টী ভগিনীর মত—জননীর মত যত্ন করিয়া আয়োজন করিতে লাগিল। আমাদের আবশ্যক দ্রব্যাদি সে সযত্নে গুছাইয়া দিল।

সেই দিন দ্বিপ্রহরে এলাহাবাদ আসিবার জন্য আমরা বিরোহীর নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিলাম; কিন্তু সেই সরলা বালিকা

ঝামেরিয়ার মধুর স্মৃতিটুকু আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া আসিতে চইল। ঝামেরিয়া ছল ছল নেত্রে সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া আমাদিগকে গাড়িতে উঠাইয়া দিয়া গেল। বিদায়কালে সেই সরল বালিকার অশ্রুসিক্ত নয়ন দুইটী দেখিয়া আমিও অশ্রুসম্বরণ করিতে পারি নাই। বিরোহী ত্যাগ করিলাম, কিন্তু সমস্ত পথ সরল বালিকার মুখখানি মনোমধ্যে উদিত হইয়া আমার হৃদয়কে আকুল করিতে লাগিল। মনে ভাবিলাম, এই অসভ্য, নগণ্য, ঝামেরিয়া পরিচারিকা—না কুহকিনী?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

একটু থামিয়াই ভবরামবাবু আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সেই দিন এলাহাবাদ পৌঁছিয়াই আমরা গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম দেখিতে গেলাম।

গঙ্গা-যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলকে প্রয়াগ বা ত্রিবেণী বলে। এই সঙ্গমস্থলে হিন্দু দান-ধ্যান করে এবং এই দৃশ্য অতি মনোহর। শত শত হিন্দু সরল বিশ্বাসের সহিত অক্ষয় ফল লাভ করিবার জন্য অকাতরে যথাসর্ব্বস্ব দান করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এই দানশীলতা ও ধর্ম্মপ্রাণতা এখনও হিন্দুকে জীবিত রাখিয়াছে। রেলগাড়ী হইতে যমুনার পরপারে এলাহাবাদের দৃশ্য অতি মনোহর। সে প্রাণারাম নয়নাভিরাম দৃশ্য অঙ্কিত করিবার ক্ষমতা আমার নাই। অন্ধ যেমন অন্ধকে পথ দেখাইতে অসমর্থ, আমিও সেই প্রকার ইহা বর্ণনা করিতে অপারক। ভাষায় এমন শব্দ নাই, যাহা দ্বারা এই প্রাকৃতিক বিরাট দৃশ্য অঙ্কিত করিতে পারা যায়।

এলাহাবাদের দক্ষিণ অংশে সহরের প্রধান বাজার "রাজার চক"।

এই স্থানের বসতি খুব ঘন—দেখিলেই বোধ হয় যেন ইহাই এলাহাবাদের পূর্ণ-ছবি। যতগুলি পল্লী আছে, তন্মধ্যে শাহাগঞ্জ, বাদসাহী-মণ্ডাই ও আতর স্থইয়াতে বহু বঙ্গদেশবাসী দেখিতে পাওয়া যায়! এলাহাবাদে বাঙ্গালীর সংখ্যা খুব বেশী। যুক্তপ্রদেশের রাজধানী বলিয়া এইস্থানে অফিস, আদালত, প্রভৃতি সমস্তই অধিষ্ঠিত। হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষা প্রাধান্য লাভ করিলেও, বাঙ্গালা ভাষার প্রচলনই খুব বেশী বলিয়া বোধ হয়।

সম্রাট আকবরের সময় এই সহরের নাম ছিল ইলাহিবাস অর্থাৎ বেহেস্ত। এক্ষণে ঐ নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া এলাহাবাদ হইয়াছে। প্রয়াগে প্রাতঃস্মরণীয় বুদ্ধদেব তাঁহার "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" প্রচার করিতে পশ্চাৎপদ হ'ন নাই। সেই সময়ে বৌদ্ধগণ হিন্দুর বেদবিধিমত যাগ-যজ্ঞাদি ও বর্ণাশ্রম বিলুপ্ত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু এলাহাবাদের ব্রাহ্মণগণ দৃঢ়রূপে স্থিরপ্রতিজ্ঞার সহিত তাহাতে বাধা দিয়াছিলেন ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিতে আদৌ বিরত হ'ন নাই। ইতিহাস এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে—পুণ্যভূমি এলাহাবাদ এখনও দণ্ডায়মান থাকিয়া এই কথা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

রাজা অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের জয়-পতাকা আসমুদ্র ভারতে প্রোথিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার জন্য

তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয়ও করিয়াছিলেন। ভারতের নানা স্থানে নানাপ্রকার অশোক স্তম্ভ সমূহ দণ্ডায়মান থাকিয়া এখনও তাঁহার কীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। এলাহাবাদের চম্পককুঞ্জে একটী স্তূপ তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানে উহা এলাহাবাদ ফোর্টের ভিতর অবস্থিতি করিতেছে। এই স্তম্ভের সৌন্দর্য্য দেখিবার সামগ্রী। এলাহাবাদে আসিয়া ইহা না দেখিলে পর্য্যটকের সৌন্দর্য্য-দর্শন শেষ হইতে পারে না। বৌদ্ধযুগের কীর্ত্তি সমূহের মধ্যে এই "অশোক-স্তম্ভ" একটী প্রধান ঐতিহাসিক স্মরণ-চিহ্ন।

তারপর আমরা নৌকারোহণে যমুনার অফুরন্ত সৌন্দর্য্য দেখিতে চলিলাম।

যখন আমাদের নৌকা গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইল—দেখিলাম শত শত ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী প্রয়াগে মস্তক মুণ্ডন করিতেছেন। ইঁহাদের ধর্ম্মপ্রাণতা দেখিয়া হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিল। যমুনার নীল জল গঙ্গার সহিত কিছুতেই মিশিতেছে না। কি সুন্দর দৃশ্য! গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থলে যেন একটি হিন্দুধর্ম্মের অজর, অমর, পবিত্র রেখা কে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। এই পবিত্র রেখা ও হিন্দু নরনারীর ধর্ম্মপ্রাণতা দেখিয়া আমার মনে হইল, পবিত্র হিন্দুধর্ম্ম চিরদিন এইরূপ মস্তক উন্নত করিয়া অবনীমণ্ডলের উপর দণ্ডায়মান থাকিবে। শত

সভ্যতা, শত বক্তৃতা, শত স্বধর্ম্মত্যাগীর প্রাণপণ চেষ্টা কোন কালে কোন যুগে ইহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবে না। যত দিন হিন্দুর তীর্থক্ষেত্র সমূহ বিরাজ করিবে, ততদিন হিন্দুনাম কেহ লোপ করিতে পারিবে না—হিন্দুধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

ইহার পর আমরা এলাহাবাদ ফোর্ট দেখিতে গেলাম, এই দুর্গ বহুশতাব্দী পূর্ব্বে হিন্দুরাজগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। হর্ষবর্দ্ধনের সময়েও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তারপর প্রাতঃস্মরণীয় মোগল বাদসাহ সম্রাট্ আকবর শাহ্ ইহার পূর্ণ সংস্কার করেন। যিনি হিন্দুদিগকে সমান চক্ষে দেখিয়া ন্যায় শাসন করিয়া গিয়াছেন, যাহার জন্য বহুসংখ্যক হিন্দু তাঁহার সময়ে উচ্চ রাজকার্য্যে নিয়োজিত থাকিয়া হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন, সেই "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" সম্রাটের মহিমা, এলাহাবাদ দুর্গ এখনও সগৌরবে মস্তকে বহন করিতেছে।

যিনি প্রতাপকে জয় করিয়াছিলেন, দুর্দ্ধর্ষ পাঠানদিগকে শাসন করিয়াছিলেন, সেই অসীম শক্তিসম্পন্ন বাদসাহ আজ কোথায়? তাঁহার সেই দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ মহারাজ মানসিংহ, টোডরমল্ল, ভগবান্ দাস, বীরবল, প্রভৃতি হিন্দু-কুলতিলক মহাত্মগণ আজ কোথায়? কেল্লা পরিভ্রমণ করিতে করিতে আমি আত্মহারা হইয়া পড়িলাম। কত পূর্ব্বস্মৃতি প্রাণে জাগিয়া উঠিল। ভাবিলাম,

যিনি এই দুর্গের নির্ম্মাণ কর্ত্তা তিনি বা তাঁহার বংশধরগণ আজ কোথায়? একদিন যাঁহারা এই অভেদ্য দুর্গে আরাম শয়নে নিদ্রা যাইতেন, যাঁহাদের অসীম শক্তি সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাঁহারা আজ কোথায়? নয়নপল্লব দুঃখ-নীরে আর্দ্র করিয়া আমরা এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, কলেজ, স্কুল, পার্ক, খসরুবাগ ইত্যাদি দেখিয়া বাসায় ফিরিলাম। খসরুবাগে হতভাগ্য সাহজাদা খসরুর সমাধিমন্দির দেখিয়া আমাদের মনে কত কথা উদিত হইতে লাগিল। আর্দ্র আঁখিযুগল হইতে আপনা আপনি অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। ভাবিলাম, কালের কি ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন! ইহার নিকট মানবের শক্তি স্থান পায় কি?

এলাহাবাদ হইতে আমরা টুণ্ডুলায় আসিলাম। টুণ্ডুলার পানীয় জল অতি সুপেয়! এখানকার প্রত্যেক কূপের গভীরতা আশি হাত। আমাদের বাঙ্গালা দেশের গৃহলক্ষ্মীগণকে যদি এইরূপ আশি হাত নিম্ন হইতে কূপের জল উত্তোলন করিয়া গৃহকার্য্য সমাধা করিতে হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের কি দশা ঘটিত কে জানে?

টুণ্ডুলা হইতে আমরা মথুরা যাত্রা করিলাম। [illegible] উপস্থিত হইয়াই পাণ্ডাদিগের অপূর্ব্ব আহ্বানে আমরা [illegible] হইয়াছিলাম। তাহাদের সেই "হরগোবিন্দ চৌবে [illegible] ভাই, "নারায়ণপ্রসাদ চোবে" ইত্যাদি চীৎকারধ্বনি [illegible] প্রথমে

কিছুই বুঝিতে পারিলাম না যে, কেন ইহারা চীৎকার করিতেছে। অবশেষে বন্ধুবর যখন বলিলেন যে, ইহারা এই প্রকারে যাত্রী সংগ্রহ করিয়া থাকে, তখন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলাম। "সাড়ে আট ভাই" মানে বুঝিলাম যে, যাহাদের বিবাহ হয় নাই, তাহাদিগকে ইহারা অর্দ্ধ বিবেচনা করিয়া থাকে। উহাদের ধারণা, হিন্দুগণ সমস্ত তীর্থদর্শন করিয়া পরিশেষে মথুরায় আগমন করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত উহারা প্রত্যেক ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া যাত্রীদিগকে তাহাদের নাম বার বার শুনাইয়া থাকে, যাত্রীরা সেই নাম শ্রবণে মথুরায় আসিয়া তাঁহাদিগকে পাণ্ডা নিযুক্ত করে।

মথুরা কালিন্দীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত। এই কালিন্দীর কূলে পূর্ণব্রহ্ম বাসুদেব কত লীলাই করিয়াছেন। কালিন্দীর কাল জল আজও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

মথুরা একটি বিখ্যাত নগরী। এখানকার সহর ও রাজবর্ত্ম গুলি দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। তারপর নানাপ্রকার যান বাহনাদি থাকায় পর্য্যটককে আর কোনও প্রকার ক্লেশভোগ করিতে হয় না।

এখানকার পাণ্ডারা সকলেই চতুর্ব্বেদ পাঠ করিয়া থাকে—এই নিমিত্ত তাহাদিগকে "চোবে" বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই পাণ্ডাগণের বিবরণ পর্য্যটকের জানিবার বিষয়।

মথুরা, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহাপরাক্রমশালী কংসাসুরের রাজধানী ছিল। এখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা সকল দেখিলে হিন্দুর প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠে। সন্ধ্যার আলোকে যখন কালিন্দীর কাল জল হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র নগরী তিমিরাচ্ছাদিত হয়, তখনকার সে দৃশ্য অতি মনোরম। যমুনাতীর হইতে সুনীল মুক্ত অম্বর-তলে শত সহস্র সুগন্ধি দীপালোকে শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্য মুখরিত মন্দিরগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর হয়।

কাশীতে যেমন বরুণা ও অসি অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে সমগ্র নগরী বেষ্টন করিয়া আছে, মথুরাতে সেই প্রকার একটী অর্দ্ধচন্দ্রাকার স্থান আছে। পাণ্ডারা বলিয়া থাকেন, যাহারা এই স্থানে বাস করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হয়, তাহারা গোলকে গমন করে। গোলক কেহ কখনও দেখে নাই বা দেখিয়া আসিয়া তাহার অনন্ত সৌন্দর্য্যের পরিচয় প্রদান করে নাই; কিন্তু এই স্থানে বাস করিলে যে মন ও প্রাণ পবিত্র হয়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অন্ধ-বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াও মোক্ষ কামনায় এই স্থানে বাস করিলে নিরানন্দ শোকগ্রস্ত হিন্দুর প্রাণেও শান্তি-মন্দাকিনীর পূতধারা প্রবাহিত হইবেই হইবে।

মথুরা-মণ্ডলের দ্বাদশ-বনের মধ্যে প্রথমেই মধুবন বিখ্যাত। শ্রীহরি এইস্থানে মধুনামক দৈত্যকে সংহার করিয়াছিলেন—পাণ্ডারা এইরূপ বলিয়া থাকে। মধুবন বড়ই সুন্দর—বড়ই নয়নাভিরাম।

যমুনার পূর্ব্ব-তীরে মথুরা সহরে বিশ্রাম-ঘাট বলিয়া একটী ঘাট আছে। এই স্থানে যাত্রীগণ স্নানান্তে পিতৃ-পুরুষের গোলক কামনায় তিল-তর্পণ করিয়া থাকেন। পিতৃ-পুরুষের গোলক-প্রাপ্তি হয় কি না বলিতে পারি না, কিন্তু সংসার-ক্লিষ্ট মানবগণ যে এই ঘাটে বিশ্রাম করিলে প্রাণে বিমল শান্তি প্রাপ্ত হয়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বিশ্রাম-ঘাটের শোভা অতি মনো-মুগ্ধকর। মথুরায় যে বারটী ঘাট আছে, তন্মধ্যে এইটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিলে মনে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। সন্ধ্যার সময় যখন অসংখ্য দীপাবলী প্রজ্জ্বলিত করিয়া ব্রাহ্মণগণ মঙ্গল-আরতি করিয়া থাকেন, তখন কাহার প্রাণে না সাময়িক ভীতির উদ্রেক হয়? তখন মানবপ্রাণে এক অপূর্ব্ব ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। "হিপনটিক" শাস্ত্র পাণ্ডারা অধ্যয়ন করে নাই বটে; কিন্তু সন্ধ্যাকালে এই মঙ্গলময়ের বিরাট্ আবাহন আরতি প্রাণের ত্রিবিধ তাপ নিবারণ করিয়া যে মানবগণকে সম্মোহিত করে সে বিষয়ে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

মথুরা-তীর্থ হইয়া আমরা বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া, ষ্টেশন হইতে যে বাঁধান প্রশস্ত রাস্তা আছে আমরা তাহার মধ্য দিয়া, নানা দেবালয় দর্শন করিতে করিতে বৃন্দাবনের বড়বাজার চকে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে শেঠজীর বিখ্যাত

দেবালয় আছে। এই দেবালয় দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইলাম—ভাবিলাম ইহারাই যথার্থ হিন্দু! যাহারা হিন্দু-ধর্ম্মের রক্ষাকল্পে সর্ব্বস্ব দান করিতে পারে, তাহারা যথার্থই আদর্শ-পুরুষ। শেঠজীর মন্দিরাভ্যন্তরে সুবর্ণনির্ম্মিত বৃহৎ তালগাছ দেখিয়া ভাবিলাম, এই প্রকার শোভনীয় বস্তু পৃথিবীতে আর কিছু আছে কি?

আমরা সন্ধ্যাকালে পুনরায় এই সকল দেবালয় ও রাস্তাঘাট দেখিতে বহির্গত হইয়াছিলাম। সেই সময়ে যে কমনীয় শোভা সন্দর্শন করিয়াছিলাম, তাহাতে এই মর্ত্ত্যই আমাদের নিকট স্বর্গ বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। যদি কেহ বলে স্বর্গ মানবচক্ষুর অন্তরালে আছে তাহা হইলে তাহাকে বলিতে ইচ্ছা হয়, তোমার শাস্ত্র রাখিয়া দাও—তর্ক জলে নিক্ষেপ কর। যদি স্বর্গ বলিয়া কিছু থাকে, তবে সে এই লীলাময়ের লীলাধাম বৃন্দাবন।

তারপর বৃন্দাবনের কুণ্ডগুলি বাস্তবিকই অমৃতধারা পূর্ণ নির্ম্মল ও পরিষ্কার। শ্যাম-কুণ্ড রাধা-কুণ্ড প্রভৃতি দেখিলে প্রাণে বিমল শান্তি আসে। মনে হয় একবার এই কুণ্ড-সলিলে স্নান করিলে বুঝি শরীরের সর্ব্ববিধ ব্যাধি ও জ্বালা দূর হইয়া যাইবে। ভোগবতীর সুস্বাদু নীর—মন্দাকিনীর পূতধারা—জাহ্নবীর নির্ম্মল সলিল—সব এই কুণ্ডে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। যদি হিন্দু হও—যদি সর্ব্ববিধ পাপ দূর করিতে চাও, তবে একবার এই কুণ্ডে

অবগাহন কর—দেহ ও মন পবিত্র হইবে—প্রাণে বিমল শান্তি লাভ করিবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মথুরা পরিভ্রমণ শেষ হইলে আমরা অশ্বযানে বৃন্দাবনে আসি। বৃন্দাবনে আসিয়া আমরা পাণ্ডার হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলি হই। আমাদের আর স্বাধীন ইচ্ছা রহিল না—তাঁহারা দয়া করিয়া যাহা দেখাইতে লাগিলেন—তাহাই দেখিলাম। রাস্তায় বাহির হইলেই হরিনামের অবিরাম ধ্বনিতে কর্ণ বধির হইয়া যায়। কেহ গায়িতেছে :—

"শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরি গোবর্দ্ধন।
মৃদু মৃদু বংশী বাজে এই সেই বৃন্দাবন॥"

আবার কেহ বা গায়িতেছে :—

"ধূলা নয়, ধূলি নয়,—গোপীপদ রেণু।
এই ধূলা মেখেছিল নন্দের বেটা কানু॥"

কেহ বা 'জয় রাধে শ্রীরাধে' বলিয়া চীৎকার করিতেছে। কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে "জয় রাধা শ্যাম" বলিয়া ভিক্ষা করিতেছে। কেহ বা খোল করতাল লইয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে। আবার কেহ বা ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া "হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু! আমায় কি দয়া করিবে না" বলিয়া অশ্রু-নীরে বক্ষ ভাসাইতেছে। বৃন্দাবনের ধূলি পর্য্যন্ত হিন্দুর নিকট পবিত্র—তাই যোগী, ভোগী সকলেই ইহা সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া থাকে। এই প্রেমময় চিত্র—এই ভক্তি-

উৎসের পবিত্র ধারা আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। যখনই শুনিলাম, ভক্তিরস পূর্ণ নানাবিধ মধুর সঙ্গীত চতুর্দ্দিকে হইতেছে, অমনই আমাদের প্রাণমন স্বর্গীয় ভাবে বিভোর হইয়া উঠিল।

হিন্দুর শ্রেষ্ঠ তীর্থ শ্রীবৃন্দাবন। চৈতন্যদেবের প্রভাবে বৃন্দাবন বাঙ্গালী তীর্থ স্থানে পরিণত হইয়াছে। যে ভক্তিরসে কৃষ্ণ চৈতন্য সমগ্র বাঙ্গালা মাতাইয়াছিলেন, যে অনন্ত প্রেমের পুণ্য-প্রবাহে বাঙ্গালী, উৎকলবাসী ভাসিয়া গিয়াছিল—তাহার পূর্ণবিকাশ যদি দেখিতে ইচ্ছা হয়; তবে বৃন্দাবন গমন কর। এমন তীর্থ আর নাই। তোমার নয়ন পরিতৃপ্ত হইবে—জীবনসার্থক হইবে। শ্রীবৃন্দাবন ও নীল-যমুনা শ্রীরাধামাধবের প্রিয় লীলাস্থল ছিল। এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আর কোথায় দেখিতে পাওয়া যায় না। যে দিকে চাহিবে সেই দিকেই দেখিতে পাইবে যে, ভগবানের লীলা প্রকাশিত হইতেছে। কদম্ববৃক্ষে ময়ূর ও ময়ূরীগণ অপূর্ব্ব চিত্রিত পাখা বিস্তার করিয়া সুমধুর কে-কা রবে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতেছে। কোথাও বা ভ্রমর-ভ্রমরী মধুর গুঞ্জনে ভগবানের পবিত্র গুণগান করিতেছে।

যমুনা উজান বহিয়া চলিয়াছে। তাহার সেই নীল জলে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠিয়া প্রেমময়ের প্রেম-কাহিনী ব্যক্ত করিতেছে। এই নীল-যমুনার তীরে লীলাময় বংশীবাদন করিতেন। সেই বংশীরবে আকুল হইয়া ব্রজের বৃদ্ধ শ্রেণী

দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া—প্রেমে গদগদ হইয়া, স্বীয় কর্ত্তব্য ভুলিয়া—সংসার ত্যাগ করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ধাবিত হইত। যাদুকরের মোহিনী বংশী-রবে ব্রজাঙ্গনাগণ বাস্তবিকই উন্মাদিনী হইয়াছিল। তাই বিদ্যুল্লতারূপিনী বৃক-ভানুনন্দিনী শ্রীমতী অচৈতন্য অবস্থায় ইহার তীরে ছুটিয়া আসিতেন। গাভিগণ কৃষ্ণের বংশীরব শুনিয়া হাম্বা রবে উর্দ্ধে পুচ্ছ তুলিয়া এই যমুনা-পুলিনে আসিয়া উপস্থিত হইত।

আমি যেন স্বপ্নাবিষ্ট হইলাম। আমার নয়ন সমক্ষে যেন এই সকল চিত্র ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইল, "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি" তাই কি বৃন্দাবনের এই নয়নানন্দকর শোভা চিরনবীন রহিয়াছে!

ভাবিতে ভাবিতে আত্মহারা হইয়া উঠিলাম। সহসা শুনিলাম, কে যেন মধুরকণ্ঠে গায়িতেছে ঃ—

"আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব।"

আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম। এই চির-পরিচিত বাঙ্গালা সঙ্গীত কে গায়িতেছে। দেখিলাম, অদূরে কয়েকটী বালক কল-কণ্ঠে এই মধুর সঙ্গীত করিতে করিতে আসিতেছে। আমি তাহাদিগকে দেখিয়া সেইদিকে দৌড়াইয়া গেলাম। তথায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। বালকগণ মধুরস্বরে গায়িতেছে—নাচিতেছে এবং চতুর্দ্দিক হইতে নিক্ষিপ্ত পয়সা কুড়াইতেছে।

বৃন্দাবনে অনেক "তুলসী বেদী" দেখিতে পাইলাম। কারণ

কি জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম যে, কথিত আছে, যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে এই বেদী প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি নিঃসন্দেহে বৈকুণ্ঠ লাভ করেন। দানবীরের অভাব নাই—ধার্ম্মিকের অভাব নাই—অসংখ্য "তুলসী বেদী" এই প্রকারে স্থাপিত হইয়াছে।

তারপর শাওজির মন্দির, লালাবাবুর মন্দির, শেঠের মন্দির, গোয়ালিয়রের মন্দির ইত্যাদি দেখিয়া প্রাণে বড়ই আনন্দ পাইলাম। ভাবিলাম, সার্থক ইহাদের জন্ম! ইহারাই অর্থের যথার্থ সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। আর সার্থক লালাবাবু ও শেঠজি! তোমাদের নাম,—তোমাদের অক্ষয়-কীর্ত্তি ধরণীর পৃষ্ঠ হইতে কোন দিন বিলুপ্ত হইবে না।

বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর পুরাতন মন্দির দেখিয়া, আমরা স্তম্ভিত হইলাম। মনে মনে ভাবিলাম, হায়! হিন্দু-কুলতিলক মানসিংহ! আজ তুমি কোথায়? বিধর্ম্মীর হস্তে তোমার কীর্ত্তি-স্তম্ভের কি শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছে তাহা একবার আসিয়া দেখিয়া যাও! যাহার জন্য তুমি প্রাণপাত করিয়াছিলে, তোমার সেই কীর্ত্তি-মন্দিরের অবস্থা একবার অবলোকন কর।

এখান হইতে আমরা আগ্রা দেখিতে গেলাম। আগ্রায় তাজমহল (মমতাজ) ইত্যাদি দেখিয়া প্রাণে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইল। তথায় আকবরের সমাধি দেখিয়া

দেখিয়া প্রাণ পুলকিত হইয়াছিল। এই সমাধি-ভবন সম্রাট্ আকবর স্বয়ং প্রস্তুত করাইয়াছিলেন ; পরে তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর বাদসাহ ইহার কেবল মাত্র একটী তোরণ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সেকেন্দ্রা মস্‌জিদের উপর হইতে প্রান্তরের দিকে চাহিলে, প্রাকৃতিক দৃশ্যে হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে! ইহার উপর হইতে বহু দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বামপার্শ্বে যমুনা, দক্ষিণে বহুদূর ব্যাপী বিস্তৃত প্রান্তর! মস্‌জিদের উপর উঠিলে আগ্রা সহরটী সুস্পষ্ট নয়ন-গোচর হয়। সেকেন্দ্রা মস্‌জিদের উপর হইতে প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি দেখিতে দেখিতে প্রাণ যেন কোন এক অজানা রাজ্যে চলিয়া যায়! উপর হইতে অবতরণ করিবার আমার আর ইচ্ছা হইতেছিল না। এখান হইতে আগ্রার তাজমহলকে যেন যমুনার উপর একখানি মনোহর চিত্রের মত দেখাইতেছিল। তাজ দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া পড়িলাম। জগতে সবই নশ্বর। মনুষ্য, পশু, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, জঙ্গম সবই কালনেমীর তর্জ্জনি হেলনে চলিয়া থাকে। কিছুই থাকে না—হয় মাটী—না হয় ভস্মস্তূপে পরিণত হয়। সুন্দর দেহ—যাহার জন্য এত পারিপাট্য, এত যত্ন, এত পরিশ্রম সেই দেহ কোথায় চলিয়া যায়! কীর্ত্তি একমাত্র এই জগতে অবিনশ্বর, তার পর প্রেম। বাক্য থামিয়া যায়, শব্দ থাকে। পূর্ণিমা চলিয়া যায়, তাহার স্মৃতি ধরণী-বক্ষে অঙ্কিত করিয়া যায়। ফুল শুষ্ক হইয়া যায়, কিন্তু তাহার

গন্ধ লোপ পায় না। প্রেম অনন্ত, প্রেম অবিনশ্বর। এই শিক্ষা দিবার জন্যই যেন তাজ আজিও সগর্ব্বে মস্তকোত্তলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সম্রাট-মহিষী রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন—জাহাঁপনা আপনি আমায় এত ভালবাসেন, কিন্তু এই মাটীর শরীর যখন মাটীতে মিশাইয়া যাইবে, তখন আপনি কি করিবেন?” সম্রাট্ সাজাহান তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, “প্রিয়তমে যদি তোমার মৃত্যু অগ্রে হয়, আমি তোমার সমাধির উপর এমন এক প্রেমের মন্দির নির্ম্মাণ করিব যে জগতে তাহা চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে।” সম্রাটের এই বাণীর সার্থকতা হইয়াছে। যদি প্রেমের উজ্জ্বল উদাহরণ দেখিতে ইচ্ছা হয়—আগ্রায় মমতাজ মহলের শ্বেত সমাধি-মন্দির দর্শন কর, তুমি ধন্য হইবে এবং শান্তিহারা প্রাণে শান্তি ফিরিয়া পাইবে।

সেকেন্দ্রা মসজিদের উপর হইতে যখন আমরা চারিদিকের প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া হৃদয় ও মন তৃপ্ত করিতেছি, তখন অদূরে কে গায়িয়া উঠিল—

“তোর গণা দিন ফুরায়ে গেল
তবু ভাঙ্গিল না ঘুম।”

কি সুন্দর সুমিষ্ট ভাবস্পর্শী সুগম্ভীর সঙ্গীতধ্বনি! কি ভক্তিপূর্ণ সুললিত স্বর! বোধ হইল যেন ভক্তি ও অশ্রু মাখিয়া গায়কের হৃদয় ভেদ করিয়া সে স্বর বহির্গত হইতেছে, যেন অনেক

শুনিয়াছি, কিন্তু এমন ভক্তিপূর্ণ স্বর কখনও শুনি নাই! এমন সুমিষ্টধ্বনি কখনও কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই। গায়ককে দেখিবার জন্য দ্রুতপদে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নিম্নে অবতরণ করিলাম। চারিদিকে অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলাম না! মসজিদরক্ষক কয়েকজন মুসলমান ভৃত্য সেই স্থানে দাঁড়াইয়াছিল— তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, গায়ক একজন পাগল, সে কখন কখন এখানে আসিয়া এইরূপ ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়া যায়।

গায়ক পাগল? ভৃত্যেরা বলিল গায়ক পাগল? পাগলের এরূপ সঙ্গীতশক্তি কোথা হইতে আসিল? আহা পাগলের স্বর কি মধুমাখা! যে দিক হইতে সঙ্গীতধ্বনি আসিয়া আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া ছুটিলাম। পাগলকে দেখিতে পাইলাম না। আবার দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দেখিলাম, যমুনার ধারে পাগল তন্ময় হইয়া আপন মনে গায়িতেছে—

"তোর গণা দিন ফুরায়ে গেল
তবু ভাঙ্গিল না ঘুম।"

পাগলের আকৃতি দীর্ঘ, মস্তকে রুক্ষ জটাভার, দেহ ভস্ম ও ধূলাচ্ছাদিত। কটীদেশে একটু ছিন্ন কৌপীন ব্যতীত আর কিছুই নাই। সেই কৌপীন তার লজ্জা নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট নহে! মুখখানি, সদাই হাসি মাখা—প্রফুল্ল। কোনও অভাব, দুঃখ

ও দৈন্যের চিহ্ন মাত্র তাহাতে নাই। বয়স অনুমান করা কঠিন! কি সুগোল ভস্মাচ্ছাদিত তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় সেই বিরাট্ দেহ। সেই ছাই ভস্মের ভিতর হইতেও পাগলের কি যেন একটা সৌন্দর্য্য—কি যেন একটা মাধুরী ফুটিয়া বাহির হইতেছে—যাহা আমাদের মত প্রকৃতিস্থদিগের কখনই দৃষ্টিগোচর হয় না!

লোকটি কি সত্যই পাগল! হউক না পাগল, তবু ইহার সহিত আলাপ করিব,—একটি গান শুনিব,—ইহার অঙ্গের ছাই, ভস্ম ও ধূলাগুলি মুছাইয়া দিব! জগতে পাগল নয় কে? কেহ অর্থের জন্য পাগল, কেহ স্বার্থের জন্য পাগল,—কেহ সন্তান-সন্ততি লইয়া পাগল,—কেহ বা ঋণের জন্য পাগল, কেহ বা ঋণ প্রদান করিবার জন্য পাগল। সংসারটা ত পাগলের হাট। যিনি পেটের জন্য ধড়াচূড়া বাঁধিয়া ওকালতি করিতেছেন, তিনিও যেরূপ পাগল—পেটের জ্বালায়,—ক্ষুধার যন্ত্রণায় যে চীৎকার করিতেছে, সেও তেমনই পাগল। নাম কিনিবার জন্য "দেশোদ্ধার" "দেশোদ্ধার" করিয়া যিনি গগন বিদীর্ণ করিয়া বক্তৃতা করিতেছেন, তিনিও তদ্রূপ পাগল। দার্শনিক পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, কবি, গ্রন্থকার, ভাবুক, পর্য্যটক, সকলেই আপনার ভাবে আপনি বিভোর। সকলেই আপনার ধ্যানে আপনি মগ্ন—বাহ্যজ্ঞান রহিত। বড় হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট পর্য্যন্ত সকলেই যখন একই প্রকারে ঘুরিতেছে, তখন জগতে পাগল নয় কে?

চিকিৎসাশাস্ত্র বলেন, যাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, সেই পাগল; কিন্তু যে মিথ্যা বস্তুকে সত্য বলিয়া ভাবে সে কি পাগল নহে? যে অনিত্যকে সত্য জ্ঞান করে, সেই ত পাগল। তবে আর কাহাকে পরিত্যাগ করিব?

সংসারে প্রকৃত সত্য বস্তুকে কে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছে? কেহই নহে। সবাই ভাবিতেছে, আমরা এই ভবের হাটে চিরদিন বাস করিব! সবাই ভাবিতেছে, স্ত্রীপুত্র-পরিবেষ্টিত এই সংসারটা আমাদের মৌরসী স্বত্ব। চিরদিন খোসমেজাজে সুস্থভাবে অবিরত ভোগদখল করিতে থাকিব। কেহ কি ভাবিতেছে যে, এই ভবের হাটে আমরা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ক্রয় বিক্রয় করিতে আসিয়াছি, সময় হইলেই হাট হইতে আমাদিগকে পলাইতে হইবে? এ কথা কেহ কি একবারও চিন্তা করিয়া থাকেন? তবে কি করিয়া বলিব যে, তাহারা বিকৃত মস্তিষ্ক বা পাগল নয়? হাটে আসিয়া এই অল্প সময়ে কে কি কেনা-বেচা করিল, তাহার কি কেহ জমাখরচ করে? যাহারা নিজের লাভ-লোকসানের হিসাব রাখে না, তাহারা যদি পাগল না হয়, তবে পাগল কে? এই ভবের হাটে, পাপ ও পুণ্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, সত্য ও মিথ্যা, পরের অপকার, পরোপকার, নিঃস্বার্থতা, স্বার্থপরতা, দীনসেবা, দান, ধ্যান, হিংসা, দ্বেষ, শঠতা ও চাতুরী সকলই বিক্রীত হইতেছে—তবে এই হাটে কাঞ্চন ফেলিয়া লোকে কাচ খরিদ করে কেন? তাহারা কি পাগল

নয়? পাগল হইয়া যাহারা অপরকে ঘৃণা করে, তাহারাও অদ্ভুত পাগল! যাহারা ভবের হাটে পবিত্র উপাদেয় দেবভোগ্য জিনিষগুলিকে ফেলিয়া, হলাহল ক্রয় করিতে ইতস্ততঃ করে না, তাহারা যে ভীষণ পাগল!

পাগল আবার গায়িল :—

"তোর গণা দিন ফুরায়ে গেল
তবু ভাঙ্গিল না ঘুম।"

আমি দৌড়িয়া গিয়া লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"পাগল তুমি কে?"

পাগল হো হো করিয়া অট্টহাস্য করিল। সেই হাস্যে সহসা বৃক্ষ, লতা, পাতা যেন কম্পিত হইয়া উঠিল! আমি সভয়ে একটু পশ্চাতে সরিয়া আসিলাম।

পরক্ষণেই অগ্রসর হইয়া আবার আমি প্রশ্ন করিলাম,—"তুমি কি সত্য সত্যই পাগল?"

আমার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া পাগল নিকটবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমিও পশ্চাদ্ধাবন করিলাম। সেই জঙ্গল কয়েকটি ক্ষুদ্র, বৃহৎ, ঘন ও নিবিড় বৃক্ষের দ্বারা পরিবেষ্টিত। কৈ? এখানে ত পাগল নাই! কোথায় গেল? তবে কি পাগল মানুষ নয়! চারিদিকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছি—আবার সেই প্রাণ-মাতোয়ারা সঙ্গীতধ্বনি অদূরে শ্রুত হইল।

দেখিলাম, জঙ্গলের এক পার্শ্বে যমুনার তীরে,—আকাশের দিকে চাহিয়া পাগল পুনরায় গায়িতেছে—

"তোর গণা দিন ফুরায়ে গেল!"

আমি স্তম্ভিত হইলাম! চক্ষে ধূলা দিয়া নিমেষের মধ্যে কি করিয়া এত অল্প সময়ে পাগল যমুনার তীরে উপস্থিত হইল!

কৌতূহল বৃদ্ধি হইল! ভাবিলাম, যেরূপে পারি পাগলের পরিচয় লইব! ছুটিলাম,—যমুনার দিকে সেই জঙ্গল লক্ষ্য করিয়া প্রাণপণে ছুটিলাম। পলে পলে আশঙ্কা হইতে লাগিল, পাগল আবার পাছে দূরে পলাইয়া যায়।

অবশেষে তাহার সাক্ষাৎলাভ ঘটিল। আমি সম্মুখে যাইয়া মিনতি করিয়া বলিলাম—"তুমি যেই হও তোমার যথার্থ পরিচয় দাও। পরিচয় না পাইলে আমি কিছুতেই তোমার সঙ্গ ছাড়িব না।"

আবার সেই "হো হো" অট্টহাস্য! এবার পাগলের হাস্য-রবে সত্য সত্যই আমার হৃদয় দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। ভয়ে কি ভক্তিতে জানি না, আমি পাগলের পদপ্রান্তে পড়িয়া গেলাম! চীৎকার করিয়া বলিলাম—"আমাকে মারিতে হয় মার! তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিব না।"

"তবে সঙ্গে আয়" বলিয়া সেইরূপ অট্টহাসে গগন বিদীর্ণ করিয়া পাগল কোথায় চলিয়া গেল! আর দেখিতে পাইলাম না! আমি কাতরপ্রাণে আকুল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম, কিন্তু

কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। ভাবিলাম, আমার সাধ্য কি যে উহার সঙ্গে যাইতে পারি। তবে বড় ক্ষোভ রহিল যে, তাহাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে পাইলাম না! পাগলের জন্য সত্য সত্যই আমি রোদন করিতে লাগিলাম। জানি না—কি মন্ত্রবলে পাগল আমার মন প্রাণ কাড়িয়া লইল! সহসা কেন আগ্রার সেই যমুনা তীরে আমার এই ভাবান্তর ঘটিল।

তাহাকে পাতি পাতি করিয়া খুঁজিলাম,—খুঁজিলাম—সেই যমুনাতীরে,—সেই বৃক্ষলতাসমাকীর্ণ জঙ্গলে, সেই সুদূর প্রান্তরে,—ভগ্ন অট্টালিকায়,—প্রকাণ্ড মহীরুহের পশ্চাতে,—কিন্তু কই তাহার আর সাক্ষাৎ ত মিলিল না। চারিদিকে কতক্ষণ ছুটাছুটি করিয়া খুঁজিয়াছিলাম মনে নাই। যখন সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার আগ্রা নগরীকে বেষ্টন করিল, তখন আমার জ্ঞান হইল! ভাবিলাম, অপরিচিত বিজন যমুনাতীরে যে রজনীর অন্ধকারে ক্রমশঃ ডুবিয়া যাইতেছি! শেষে কি আগ্রার দস্যু তস্করের হস্তে—বন্য জন্তুর কবলে প্রাণ হারাইব? হতাশ অন্তরে কত কি ভাবিতে ভাবিতে সহরে ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কিন্তু সেই অন্ধকারে কে আমাকে পথ দেখাইয়া দিবে? অতি কষ্টে ঘোর অন্ধকারে দ্বিপ্রহর রজনীতে আগ্রা-ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আর তিলার্দ্ধ আমার আগ্রায় থাকিতে ইচ্ছা হইল না। ট্রেনের অপেক্ষায় [illegible] রজনী ষ্টেশনে অতিবাহিত করিলাম।

পাগলের কথা আমার মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল। পাগল কি সত্যই পাগল, না কোন অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী! হায়! যদি সাধুজনের সাক্ষাৎ পাইলাম; তবে তাঁহার চরণাশ্রয় ভিক্ষা করিলাম না কেন! এ চিন্তাদাবানল বক্ষে ধারণ করিয়া শান্তির জন্য দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি; আর সেই শান্তিরূপ বারি সম্মুখে পাইয়া পরিত্যাগ করিলাম কেন? তারপর কতদিন অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার সেই জ্যোতির্ম্ময়মূর্ত্তি এখনও ভুলিতে পারি নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আজ প্রত্যূষে তাঁহাকে স্বপ্নে দেখি, তারপর যে ঘটনা ঘটে, সে কথা পরে বলিতেছি।

সাগরবালা সহসা চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "তার পর?"

"তার পর—সে আজ কতদিনের কথা; কিন্তু সেই পাগলের জন্য আমার অধীরতা এখনও দূর হয় নাই! মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারি নাই! এখন পাগলই আমার ধ্যান জ্ঞান হইয়াছে! তাই সাগরবালা! তুমি প্রাতঃকাল হইতে হয় ত আমার ভাবান্তর দেখিতেছ। আজ কাল ক' দিন সংসার কোলাহলে পড়িয়া একবার তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। সংসারের তমঘোরে, অভাবের বৃশ্চিকদংশনে, মোহের অন্ধকারে,—স্বার্থের বিকট আহ্বানে, মানুষ ইহকাল পরকাল ভুলিয়া যায়! জীবন-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ছুটাছুটি করিতেছি,—পাপ পুণ্য জানি না, ধর্ম্মাধর্ম্ম জানি না, নিজের সুখের জন্যই পাগল। তাই আগ্রায় সেই পাগলের কথা কয়দিন বিস্মৃত হইয়াছিলাম। সংসার এমনই ভীষণ স্থান যে, মানুষ স্বর্গীয় পিতা-মাতাকে কিছুদিন পরে ভুলিয়া যায়,—নয়নের আনন্দ আত্মজকে ভুলিয়া যায়, আর কিছুর জন্য না হউক, তাঁহাদের স্মৃতির জন্য কিছু করে না। অর্দ্ধাঙ্গিণীর মৃত্যুর তিন দিন

পরেই নবপ্রণয়িনীর সহিত প্রেমালাপ করে। স্বার্থের জন্য মানুষ সহোদরকে ত্যাগ করে,—উপকারকেরই অপকার করিয়া হৃদয়ের কৃতঘ্নতার পরিচয় দেয়; স্বার্থের জন্য বন্ধু—বন্ধুর সর্ব্বনাশ করিয়া বন্ধুত্বের পবিত্র নামে কলঙ্ককালিমা অর্পণ করে। শিক্ষিত যাহারা,—দেশের নেতৃস্থানীয় যাহারা, তাহারা স্বার্থের জন্য—স্ত্রী-পুত্রের জন্য দেশকে, সমাজকে, স্বজাতিকে ভুলিয়া কি না করিতেছে? সুতরাং সেই স্ত্রীপুত্রের জন্য, তোমাদের জন্য পাগলের কথা কয়দিন ভুলিয়া ছিলাম।

আজ আমি প্রত্যূষে স্বপ্ন দেখিয়াছি যেন সেই বিদ্রোহীর ঝামেরিয়া-জননীর কুটীরে সেই পাগল বসিয়া আছেন! ঝামেরিয়ার জননী রোগে জীর্ণ শীর্ণ! পাগল তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছে! আমি যাইয়া তাহাকে যেন জিজ্ঞাসা করিতেছি—"পাগল তুমি এখানে কি প্রকারে আসিলে—ইহারা তোমার কে?"

আমার প্রশ্নে তাহার আর সে অট্টহাসি, সে চাঞ্চল্য নাই। স্থির, গম্ভীর দৃষ্টিতে কেবল একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল।

পরক্ষণে দেখিলাম, পাগল বৃদ্ধার সেই রোগজীর্ণ মস্তক নিজ ক্রোড়ে উঠাইয়া লইল। তাহাকে কত সান্ত্বনা-বাক্যে সুস্থির করিল। পাগলের সেবার বিরাম নাই—সে দিবারাত্র তাহাকে শুশ্রূষা করিতেছে। এমন কি বৃদ্ধার মল মূত্র পাগল দুই হস্তে পরিষ্কার করিতেছে।

প্রভাতে এই স্বপ্ন দেখিয়া আমার মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল! পাগলের সেই সৌম্য-মূর্ত্তি বার বার আমার মনে পড়িতে লাগিল! ইচ্ছা হইল, পাগলকে দেখিবার জন্য পর্ব্বত-প্রান্তে বৃদ্ধার কুটীরে ছুটিয়া যাই। পরক্ষণে মনে হইল, ইহা মস্তিষ্কের বিকার; কারণ স্বপ্ন অমূলক চিন্তা মাত্র; কিন্তু এতদিন পরে পাগলকে কেন যে স্বপ্নে দেখিলাম এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিলাম না।

স্বপ্ন দেখিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে প্রত্যূষে ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। কতদূর চলিয়া গেলাম। আমার অগ্রে ও পশ্চাতে মাঠ ধূ ধূ করিতেছে; কিন্তু আমার গমনের বিরাম নাই, দেহে ক্লান্তি নাই,—গন্তব্যস্থান কোথায় তাহারও নিশ্চয়তা নাই। তবুও চলিয়াছি। প্রান্তর শেষ হইয়া গেল, দেখিলাম অদূরে এক পর্ব্বত! সেই জনমানবহীন নিস্তব্ধ স্থানে উপস্থিত হইয়া হঠাৎ আমি চমকিত হইলাম।

এতক্ষণ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে ভ্রমণ করিতেছিলাম। সম্মুখে এক অত্যুন্নত পর্ব্বত আমার পথ রোধ করিল। প্রকৃতিস্থ হইয়া বুঝিতে পারিলাম, আমি মধুপুর হইতে ৮ মাইল দূরে আসিয়াছি। আমার সম্মুখে "পাথরডা" পাহাড়! যাঁহারা মধুপুরে আসিয়াছেন, তাঁহারা "পাথরডা" পাহাড়ের নাম শুনিয়াছেন; অনেকে কেবলমাত্র এই পাহাড় দেখিবার জন্যও আসিয়া থাকেন। কত যোদ্ধা দূর দেশ হইতে এই পাহাড়ে শীকার করিতে আসেন।

ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি অগণিত হিংস্র জন্তু এই পাহাড়ে সদা বাস করে—শুনিয়াছি হরিণশিশুগুলিও পূর্ব্বে পাহাড়ের ধারে ধারে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইত। জানি না কেন এখন আর তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

"পাথরডা" পাহাড়ে এখনও সন্ন্যাসিগণ কত দূর দূরান্তর হইতে আসিয়া থাকেন। কিংবদন্তী যে, এই পর্ব্বত গুহায় ত্রিকালজ্ঞ, যোগিগণ এখনও তপস্যা করিয়া থাকেন! এই পর্ব্বত সিদ্ধ সন্ন্যাসিগণের পুণ্যাশ্রম বলিয়া বিখ্যাত। হিংস্র জন্তুর ভয়ে পাপকলুষিত সংসারাশ্রমিগণ কখন পর্ব্বতারোহণ করিতে সাহস করে না! মধুপুরে আসিয়া আমোদের লোভে দূর হইতে পর্ব্বত দেখিয়া একটা মহৎ কার্য্য সাধন করিলাম ভাবিয়া ফিরিয়া যায়।

আমি যখন পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন মনে হইল, পর্ব্বতের উপর হইতে যোগী ঋষিগণের মুখ-নিঃসৃত যেন পবিত্র ওঙ্কারধ্বনি উত্থিত হইতেছে—সাম গানে চতুর্দ্দিক যেন মুখরিত হইতেছে। কি শান্তিপূর্ণ স্থান! মনে হইল, এরূপ পবিত্র স্থান বুঝি জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে আর কোথাও নাই!

"দিবা গেল, সন্ধ্যা এল,
প্রাণটা যেতে নাইকো দেরি।
এই ভেবে রে পাগল হ'লাম
পাগলা বেশে ঘুরে ফিরি।"

পর্ব্বত প্রতিধ্বনিত করিয়া,—বৃক্ষ, লতা, পাতা কম্পিত করিয়া ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি বন্য জন্তুকে ভীত এবং সন্ত্রস্ত করিয়া, গম্ভীর রবে দিক্ দিগন্ত মুখরিত করিয়া—সপ্তমে সুর চড়াইয়া, পর্ব্বতের শীর্ষ-দেশ হইতে অবতরণ করিতে করিতে কে গায়িতে লাগিল :—

"দিবা গেল, সন্ধ্যা এল,
প্রাণটা যেতে নাইকো দেরি।
এই ভেবে রে পাগল হ'লাম,
পাগ্‌লো বেশে ঘুরে মরি॥"

এই নির্জ্জন জনমানবহীন পর্ব্বতে—প্রাণ মন, বিমোহিত করিয়া কাহার এই মধুর সঙ্গীত ধ্বনি উত্থিত হইতেছে! এ স্বর যে পরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছে! যেন কত দিন পূর্ব্বে এই স্বর একবার শ্রবণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছিল। হায়! সে যেন কত অতীত দিনের কথা! কোথা হইতে আবার সেই সঙ্গীত রব আসিয়া হৃদয়কে আকুল করিয়া তুলিল।

আকুল নয়নে, ব্যাকুল হৃদয়ে চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম! কি? আমি স্বপ্ন দেখিতেছি! না সত্যই আমি জাগ্রত? আমার সই পাগল দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

ক তবে সত্য হয়? কতদিন কত আশার স্বপ্ন দেখিয়াছি শাশা ত জীবনে সফল হইল না! দিনে দিনে, পলে করিয়াছি, সেই সব চিন্তা এক হইয়া নব নব

মূর্ত্তিতে নিদ্রাঘোরে দেখা দিয়াছে, কৈ তাহা ত কখন সফল হইল না! পাগলকে যে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, তাহা কি তবে স্বপ্ন নয়? পাগলের ইচ্ছা প্রভাবে তবে কি আমি বিরোহীর পর্ব্বতপ্রান্তে বৃদ্ধার কুটীরে সমুপস্থিত হইয়াছিলাম? এ প্রহেলিকা বুঝা আমার ন্যায় সংসারদগ্ধ জীবের সাধ্যাতীত!

নিমেষের মধ্যে সেই পাগল আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল! এবার পাগলের মুখে সেই "হো হো" অট্টহাস্য নাই! পাগলের মুখখানি প্রশান্ত—ধীর—স্থির—গম্ভীর।

পাগল আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"দুই দিন তোকে আমার কাছে ডাকিতেছি! আজ তোরই জন্য এই পর্ব্বতের উপর অপেক্ষা করিতেছিলাম।"

একি প্রহেলিকা, তবে কি আমি পাগলের শক্তি প্রভাবে—কোনও অজ্ঞাত শক্তিবলে—নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া—পাথরড়া পাহাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তবে কি এখানে আমার কোনও স্বাধীনবৃত্তি নাই! পাগলের দ্বারা চালিত হইয়া অথবা পাগলের আকর্ষণেই আমি কি এখানে আসিয়াছি! তবে ত ইনি পাগল নহেন! ইনি কি মহাপুরুষ! পাগল ভাবিয়া কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া ইঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম; এখন দেখিতেছি, মহাপুরুষ কৃপা-পরবশ হইয়া আমাকে দেখা দিয়াছেন! ভক্তি, বিস্ময়, আনন্দে আমার মুখ হইতে কথা বাহির হইল না।

মহাপুরুষের পদপ্রান্তে নত জানু হইয়া কত কথা বলিব মনে করিতেছি—শরীরের সমস্ত শক্তি এক করিয়া হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি ; কিন্তু তাহা পারিলাম না ! কে যেন আমার বাক্‌রোধ করিয়া দিল। অনিমেষ নয়নে মহাপুরুষের পদযুগল পানে চাহিয়া রহিলাম—অজস্র অশ্রুধারা আমার বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল। সুন্দর, মহান্ অতুলনীয় মুহূর্তগুলি চলিয়া যাইতে লাগিল ! সে স্মৃতি কি ভুলিবার ? মানুষের সুসময় জীবনে একবার আসে। স্থায়ী হয় কয় জনের ? যাহার স্থায়ী হয়, সেই ভাগ্যবান্ !

মহাপুরুষ বলিলেন—"তোর আকাঙ্খা পূর্ণ করিব। এতদিন তোর আকাঙ্খা পূরণের সময় আসে নাই। সময় না হইলে কাহারও কিছু পূর্ণ হয় না। আজ হইতে চতুর্থ দিবসের মধ্যে বিদ্রোহীর বৃদ্ধার কুটীরে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। যাই—বৃদ্ধা মৃত্যুশয্যায়—

সব কথা শেষ হইতে না হইতেই, দেখিতে দেখিতে মহাপুরুষ পর্ব্বতের উপর উঠিলেন—একবার আবার একবার—এই অধমের দিকে চাহিলেন। আর দেখিতে পাইলাম না। চক্ষের নিমেষে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন ; হৃদয় অবসন্ন হইল ! হায় কি ভাগ্য-বিড়ম্বনা ! এতদিন ধরিয়া যে অমূল্য নিধির অন্বেষণ করিতেছি, তাঁহাকে সম্মুখে পাইয়াও একটি কথা কহিতে পারিলাম না !

সম্মুখে আসিয়া, মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়া, অন্তরালে লুকাইলেন? হৃদয়ের দুঃখ-বেদনা জানাইবার অবসর দিলেন না?

জীবনের অপরাহ্নে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। তপনদেব অস্তমিত হইবার উপক্রম করিতেছেন,—কালনিশা আসিবার আর বিলম্ব নাই! এখন উপযুক্ত কাণ্ডারী ব্যতীত কালনিশায় আমাকে আর রক্ষা করিবার কে আছে! অখণ্ড মণ্ডলাকারে যিনি চরাচরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্ম-দর্শন ব্যতীত এই অপার জলধি অতিক্রম হইবার আর কোনও উপায় নাই! বাল্যকাল হইতে কত স্থানে ঘুরিয়াছি—দেশ-বিদেশে গিয়া কত সাধু-সন্ন্যাসীর চরণপ্রান্তে মস্তক নত করিয়া হৃদয়ের আকাঙ্খা জানাইয়াছি—সেই অজানিত দেশে যাইবার পথ প্রদর্শক কাহাকেও ত পাইলাম না! আজ কতদিন ধরিয়া যে মূর্তি অহঃরহ হৃদয়ে ধ্যান করিতেছিলাম, তাহাকে চক্ষের সম্মুখে পাইয়াও প্রাণ ভরিয়া যে দেখিতে পাইলাম না! আর কি আমার অদৃষ্টে সেই মহাপুরুষের দর্শন ঘটিবে! "গুরুব্রহ্ম গুরুবিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর" বলিয়া আর কি আমি তাহার চরণে মস্তক লুণ্ঠিত করিতে পারিব?

অজস্র দুঃখ ও ব্যথা লইয়া অবসন্নহৃদয়ে আজ পাথরড়া পর্বত হইতে ফিরিয়াছি সাগরবালা! কাল প্রত্যুষে শুভ মুহূর্তে বিরোহী যাত্রা করিব। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডপতির কাছে প্রার্থনা কর—যেন আমার অভিষ্ট সিদ্ধ হয়। সতীলক্ষ্মী তুমি, তোমার কাতর প্রার্থনা তিনি

অপূর্ণ রাখিবেন না! এতদিন কোন কথা তোমার কাছে বলি নাই! আজ হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সকল কথাই শুনাইলাম!"

অজস্র পবিত্র অশ্রুধারায় দম্পতিযুগলের বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল! বহুক্ষণ উভয়েই নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ!

দেখিতে দেখিতে মধুপুরের পশ্চিম গগনে শেষ লোহিতাভা মিশিয়া গেল। সন্ধ্যা বন্দনাদি করিবার জন্য ভবরাম গাত্রোত্থান করিলেন।

তৎপরদিবস ভবরাম যৎকিঞ্চিৎ পাথেয় লইয়া সাগরবালার নিকট বিদায় লইলেন।

"স্বামিন্! জীবনের উন্নতির পথান্বেষণের জন্য বিদায় চাহিতেছেন—আমি কি করিয়া বাধা দিব! জানিবেন প্রাণ ভিন্ন কায়া অধিক দিন থাকে না! বহু বিলম্বে জীবনহীন মাটির কায়া মাটিতে মিশিয়া যাইবে।

সাগরবালার নয়নে দরবিগলিত ধারা! তাহার কণ্ঠ বাষ্পপূর্ণ।

"সাগরবালা! আমি তোমাকে এতদিন চিনিতে পারি নাই! এত ধর্ম্মভাব এত মহত্ত্ব তোমার হৃদয়ে? ভাবিয়াছিলাম, তুমিই আমার পথের কণ্টক! কিন্তু আজ বুঝিলাম—প্রকৃত সহধর্ম্মিণী ধর্ম্মপথের প্রধান সেতু!

মধুপুরের সুন্দর প্রান্তরে স্নিগ্ধ শীতল সমীরণ স্বন স্বন শব্দে

বহিতেছে। বিহগকুল উষার মঙ্গল-গীতি গায়িতেছে—সতী সাগরবালার আঁখিযুগলে ভাবী বিরহ আশঙ্কায় পবিত্র অশ্রু ঝরঝর করিয়া পড়িতেছে—ভবরামের সাধুদর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ছুটিতেছে—এমন সময় ভবরাম মধুপুরের বাঙ্গালা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ভবরাম যে পথে গেলেন, সাগরবালা বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন মুছিতে মুছিতে প্রহরেক বেলা পর্য্যন্ত সেই পথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিরোহীর একটি বৃহৎ পর্ব্বতের অধিত্যকার উপর এক ভীষণ শ্মশান! রজনী দ্বি-প্রহর। শ্মশানে চিতার অগ্নি ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। হুতাশন তাহার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া এক অশীতিপর বৃদ্ধার অস্থিকঙ্কালসার দেহ গ্রাস করিতেছে। বৃদ্ধার এক তৃতীয়াংশ দেহ ভস্ম স্তূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট অস্থি-পঞ্জরগুলি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। শ্মশানের চতুর্দ্দিকে বিজন অরণ্য! পর্ব্বতের উপর দীর্ঘাকার-তরুরাজি এবং উত্তর-দক্ষিণে এক ক্ষুদ্রকায়া পার্ব্বতীয় প্রস্রবণ। শ্মশানের বামদিকে ঘন সন্নিবেশিত ছোট বড় শাল বৃক্ষগুলি বহু ক্রোশ ব্যাপিয়া অরণ্যের মধ্যে বিরাট্ অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে। ব্যাঘ্র, ভল্লুক, প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ এই সকল ঘন শাল বৃক্ষের অন্তরালে নিজেদের আবাসভূমি করিয়া লইয়াছে। শ্মশানের পশ্চিম দিকে বড় বড় পাহাড় মস্তক উন্নত করিয়া, শত শত বৎসর দণ্ডায়মান রহিয়াছে! ইহারা নীরব নিস্পন্দ-দেহে অবস্থিতি করিতেছে—বুঝি বা যোগী তপস্বি-গণকে বক্ষে ধারণ করিয়া যুগ-যুগান্তর এইরূপ সগর্ব্বে দণ্ডায়মান থাকিবে।

শ্মশানের উত্তর-দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত সেই পার্ব্বতীয় ঝরণা আঁকিয়া বাঁকিয়া—কখন বড় বড় উপলখণ্ডের উপর দিয়া, কল্ কল্ ঝির ঝির শব্দে, কখন দ্রুতগতিতে, কখনও ধীরে ধীরে, কখন বা পার্ব্বতীয় গুল্ম ও জলজের উপর দিয়া সঙ্গোপনে বহিয়া চলিয়াছে। কি সুমিষ্ট, সুপেয় বারি। শ্মশানের চতুঃপার্শ্বে ছয় মাইলের মধ্যে কোন লোকালয় নাই! ভীষণ স্থান বলিয়া এদিকে কেহ কখন ভুলিয়াও পদার্পণ করে না। অদূরে দুইটি বৃহদাকার বন্য গাভী ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে—তাহাদের অস্থি, চর্ম্ম, রক্ত চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। দেখিলে বোধ হয়, ইহা অতি অল্প সময়ের ঘটনা!

স্থানটী যতই ভয়াবহ ও নির্জ্জন হউক না কেন, তবুও ইহা তপোবনের মত পবিত্র। অন্ধকার রজনীর দ্বিতীয় প্রহর প্রায় অতীত! পর্ব্বতে, কন্দরে, লতায়, পাতায় নিবিড় অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে! কেবল চিতার আলোকে কিয়দ্দুর মাত্র আলোকিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে শালবনাভ্যন্তরস্থ হিংস্র জন্তুগণ এক একবার ভয়াবহ শব্দ করিয়া উঠিতেছে; যেন প্রেতভূমি!! ভয়ঙ্কর স্থান!! সেই ভীষণ স্থানের হিংস্র জন্তুদের গর্জ্জন কি ভয়ঙ্কর।

প্রজ্বলিত চিতার পার্শ্বে একজন সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। চিতার আলোকে সন্ন্যাসীর তপ্ত কাঞ্চনবৎ দেহখানি অপূর্ব্ব

উজ্জ্বল, আরও জ্যোতির্ম্ময় দেখাইতেছে। সন্ন্যাসীর সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম বিলেপিত, কটিদেশে ছিন্ন কম্বলের কৌপীন জড়িত। উজ্জ্বল স্নিগ্ধ চক্ষু দুটি হইতে কি যেন এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া চিতাগ্নির উজ্জ্বলতা আরও বৃদ্ধি করিতেছে। প্রশান্ত ললাট,—আজানুলম্বিত বাহু, সুদীর্ঘ জটাভারে মস্তক অবনত। বয়ঃক্রম অনুমান করা সুকঠিন! মুখের জ্যোতিঃ দেখিলে মনে হয়, শত শত বৎসরেও বার্দ্ধক্য-রেখা বুঝি এ ললাটে স্থান পাইবে না! এই সংযমী, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, যোগরত সন্ন্যাসীকে দেখিলে কে না তাঁহার শতাধিকবর্ষ বয়স অনুমান করিবেন? শতাধিক বর্ষের শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, সন্ন্যাসীর মস্তকের উপর দিয়া অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, তবু মস্তকের এক গাছি কেশও শুভ্রবর্ণ ধারণ করে নাই। মুখখানি বালকের ন্যায় স্নিগ্ধ, কোমল ও সরলতাপূর্ণ। সন্ন্যাসীকে দেখিলে কখনও মনে হয় যেন, পঞ্চমবর্ষীয় অবোধ বালক চিতার পার্শ্বে বসিয়া আছেন; শোক, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদের চিহ্ন মাত্রও সে মুখে নাই! আবার কখন মনে হয় যে শোক, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতিকে তিনি উপেক্ষার হাসি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন,—এখন তাহারা নিকটে আসিতেও ভয় পায়! কখন মনে হয়, সন্ন্যাসীর হৃদয় ভীষণ বজ্র অপেক্ষাও কঠিন! পরক্ষণে মনে হয় প্রস্ফুটিত সুগন্ধি কুসুমাপেক্ষাও বুঝি ইহা কোমল!

সন্ন্যাসীর সম্মুখে একটি যুবতী ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার সুদীর্ঘ কেশগুলি শ্মশানের ধূলা মাখিয়া, নৈশ-সমীরণ কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে! ইহারই পার্শ্বে একজন রোগতাপদগ্ধ সংসারী ব্যক্তি। ইনি বোধ হয় সন্ন্যাসীর কোন ভক্ত বা সেবক! বার বার ভক্তি-পূর্ণ দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর পদযুগলের দিকে তিনি চাহিতেছেন! এই তিনজন এবং বৃদ্ধার অর্দ্ধ-দগ্ধ দেহ ব্যতীত সে স্থলে আর কোনও জন-মানব নাই, যোগরত মহাপুরুষ ব্যতীত কাহার সাধ্য এই ভয়ঙ্কর স্থানে,—ভীষণ শ্মশানে, দ্বি-প্রহর অন্ধকার রজনীতে দ্বিধাশূন্য হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে?

মৃদু মৃদু হাসিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন,—"শুন বৎস। এইবার তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর প্রদান করিব। এতদিন তোমাকে বলি নাই,—তাহার কারণ বলিবার সময় উপস্থিত হয় নাই! উপযুক্ত ক্ষেত্রে বীজ-বপন না করিলে বীজ ধ্বংসের জন্য বপন-কর্ত্তাই অধিকতর দায়ী! আমি আজ শতাধিক বৎসর গুরুর আদেশে সংসারত্যাগী হইয়াও সংসারের ধারে ধারে বিচরণ করিতেছি! গুরুর আদেশ যে কিয়ৎপরিমাণে মস্তকে বহন করিতে পারিতেছি—ইহাতেই আমি আনন্দিত।"

"এখন ভারতে হিন্দু-ধর্ম্মের ভীষণ বিপ্লবের সময়! ইহা ভগবানের অভিপ্রেত! এই বিপ্লবের মুখে আমাদের পবিত্র হিন্দু-ধর্ম্মের

অস্তিত্ব বোধ হয় একবারে ডুবিয়া যাইত; কিন্তু মহাপুরুষদের তপঃপ্রভাব সে বিপ্লবকে বাধা দিতেছে! কাহার প্রভাবে যে হিন্দু ধর্ম্ম অজেয়, অমর হইয়া আছে, তাহা সংসারতপ্ত জীব কি করিয়া বুঝিবে? হিন্দু হইয়া যিনি যতই ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হউন, তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃস্তলে, হিন্দু-ধর্ম্মের পবিত্র নিনাদ এক একবার উত্থিত হইবেই হইবে।

যে হিন্দু হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে—শিক্ষা ও দীক্ষার দোষে সে যতই নষ্ট হউক না কেন—এক সময়ে না এক সময়ে তাহার হৃদয়ে দিব্য জ্ঞানের উদ্রেক হইবেই হইবে! মুখে সে যতই হিন্দু ধর্ম্মের কুৎসা করুক, ইহার উচ্ছেদ সাধনে যতই চেষ্টা করুক—এক সময়ে তাহার হৃদয়ে আত্মগ্লানি উপস্থিত হইবেই হইবে। হিন্দুর অস্থি, মাংস, মেদ ও মজ্জার ভিতর দিয়া ধর্ম্মের বীজ প্রবেশ করিয়াছে—আজ সহস্র সহস্র বৎসর হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর বেদ, হিন্দুর সংহিতা, হিন্দুর তন্ত্র, হিন্দুর বিজ্ঞান, জগতে প্রচারিত হইয়া, উজ্জ্বল জ্ঞানালোকে পৃথিবী উদ্ভাসিত করিতেছে। ইহার উচ্ছেদ সাধন করিতে যাওয়া পাগলের কল্পনা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? যদিও আজ সেই সকল পবিত্র তপোবন নাই—যদিও আজ ভারতে আর সে সাম গানের মধুর স্বর উত্থিত হয় না—তবুও ভারত হিন্দুর কর্ম্মভূমি—হিন্দু-ধর্ম্মের আধার স্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্থূল চক্ষে না দেখিতে পাইলেও মহাপুরুষগণের

তপঃপ্রভাব যে অহঃরহ ভারতের বায়ুর সঙ্গে মিশিতেছে, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই। ভারতের বায়ু ভারতবাসীর একমাত্র উপযোগী। এই বায়ুর সঙ্গে ভারতবাসী হিন্দু ভারতের নিজস্ব প্রকৃতি লাভ করিতেছে। হিন্দু-ধর্ম্ম ভারতবাসীর নিজস্ব সম্পত্তি। জগতে এরূপ শক্তি নাই, যে শক্তি এই সম্পত্তিকে জয় বা ইহার অপব্যয় ঘটাইতে পারে।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর যে অবনতি ঘটিয়াছে, কে তাহা অস্বীকার করিবে? ভারতের প্রাচীন রীতি-নীতি সকল মহাতেজা ঋষিগণের শক্তিশালী মস্তিষ্ক প্রসূত। কাহার সাধ্য এই রীতি-নীতির মর্ম্মানুধাবন করিতে পারে? সমস্ত রীতি-নীতিই বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম নিয়মের উপর স্থাপিত। বিদেশীর কিম্ভূত-কিমাকার ছাঁচে যাহারা সেই শাশ্বত রীতি-নীতিকে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া পুনরায় গড়িতে চায়, তাহারা হয় উন্মত্ত—না হয় একান্ত ভ্রান্ত!

এই প্রাচীন রীতি-নীতিগুলির পরিবর্ত্তনের জন্য একদল লোক চেষ্টা করিতেছেন—তাঁহারা ভাবেন কেহই তাঁহাদের প্রতিকূলতাচরণ করিতে পারিবে না। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, প্রাচীন রীতি-নীতি যেমনটি ছিল, তেমনটি রাখা উচিত নহে এবং থাকিতেই পারে না; কারণ কালের পরিবর্ত্তনে রীতি-নীতির পরিবর্ত্তনও অনিবার্য্য! যুগের পর যুগ আসিয়া, ক্রিয়া কর্ম্ম,

আচার-ব্যবহার, শাসন সংস্কার, শিক্ষা দীক্ষা সাধনার পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে; সুতরাং রীতি-নীতির পরিবর্ত্তনও অত্যাবশ্যকীয়। হিন্দু-ধর্ম্ম বড়ই সনাতন, তাই আজ বিপ্লববাদীদের শত চেষ্টাতেও ইহার কোনও ক্ষতি হইতেছে না। হিন্দু আজ আপনার এই পুরাতন—পূর্ণসমাজ ও পবিত্র ধর্ম্মকে হারাইয়া পথের কাঙ্গাল হইয়া বসিয়াছে। ইহা কি বাস্তবিকই অধঃপতনের চিহ্ন নয়? এই শতাধিক বৎসরব্যাপী ঘোর রাজসিক শক্তির সংস্রবে হিন্দুর এই অধঃপতন ঘটিয়াছে। মুসলমান বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতের কর্ণধার ছিল এবং তাহারা হিন্দুধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনার্থ অনেক শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল; কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম যে সুদৃঢ় দুর্গে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার প্রস্তরময় প্রাচীরে ইহাদের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হইয়াছিল। তারপর সুদীর্ঘ কালের পরাধীনতায় ও পাশ্চাত্য জাতির ঐশ্বর্য্য দর্শনে আপনার আত্মমর্য্যাদা ও সরল গন্তব্য পথ হারাইল।

হিন্দু-সমাজ আজ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কাহাকেও মানে না—সকলেই স্ব স্ব প্রধান। যে সমাজে গুণের আদর নাই, যে সমাজে গুণানুযায়ী কর্ত্তৃত্বের ভারার্পণ নাই—সে সমাজের এইরূপ দুর্দ্দশা হইবে না কেন?

এই বিপ্লববাদীর দল পাশ্চাত্য কর্ম্ম-স্রোত-প্রবাহে আপনার ধর্ম্মকর্ম্ম হারাইয়া ফেলিয়াছে—সে আপনাকে ভুলিয়াছে—আপনার

যাহা কিছু ছিল সবই ভুলিয়াছে; তাই ইহারা জানে না, হিন্দুধর্ম্ম যে ভিত্তির উপর সংস্থাপিত, সে ভিত্তি কখনও পরিবর্ত্তিত হইবার নয়। যাহারা পরিবর্ত্তনপ্রয়াসী অথবা যাহারা ভারতের প্রাচীন রীতি-নীতিগুলি একটু আধটু ভাঙ্গিয়া চূরিয়া ফেলিতেছেন —কেবল তাঁহারাই হিন্দুধর্ম্মের পবিত্র, শুভ্র সৌধ হইতে বহু যোজনের পথে পিছাইয়া পড়িতেছেন! ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহাদিগকে আবার এই পথেই আসিতে হইবে!

আমাদের ধর্ম্ম, সমাজ, রীতি-নীতি যে ভিত্তির উপর স্থাপিত ও গঠিত, তাহার পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা নাই এবং পরিবর্ত্তনও সম্ভবপর নহে। অন্য দেশ ও অন্য সমাজের রীতি-নীতি হইতে আমাদের ভারতের সমাজ ও রীতি-নীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এতটা প্রভেদ বলিয়াই ভারতবাসী হিন্দু আজিও উন্নত—ভগবৎবিশ্বাসী এবং মুক্তিপ্রয়াসী। এই প্রভেদ আছে বলিয়াই হিন্দু ইহকালকেই সর্ব্বস্ব মনে করে না, তাহাদের লক্ষ্য অনেক উচ্চে। হিন্দুরা রাজাধিরাজ হইতে চাহে না— তাহারা ইহা অপেক্ষাও উচ্চ ধরণের সুখ-শান্তি কামনা করে। হিন্দুর যাহা লক্ষ্য—সে যদি তাহা লাভ করিতে পারে, তবে শত সহস্র রাজ মুকুটও তাহার নিকট তুচ্ছ। এই ভারতেই এককালে তাহা হইত। হিন্দুর সেই পুরাতন রীতি-নীতি কি ত্যাগ করিবার জিনিষ! যাহারা ইহা ভাঙ্গিয়াছে বা

ভাঙ্গিতে উদ্যত, তাহারা হিন্দুর সাধনা, সভ্যতা সুনাম সমস্তই লোপ করিতে বসিয়াছে; কিন্তু ইহা ঠিক পতঙ্গ হইয়া মাতঙ্গের সহিত যুদ্ধ করার মত হইবে। যাহারা হিন্দুর পুরাতন নিয়ম, শৃঙ্খলা, রীতিনীতি ত্যাগ করিতেছে বা করিবে, এই দুষ্কর্ম্মের ফলে তাহারাই নিরয়গামী হইবে। যাহারা বিজাতীয়ের ভাবে আপনার সমাজ গঠিত করিতে চায়—যাহারা বিধবা কন্যার ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতা সহ্য করিতে না পারিয়া, পুনরায় তাহার বিবাহ দিতে চায়—যাহারা ঋষি-নির্দ্দিষ্ট বিবাহের বয়স পরিবর্ত্তন করিতে চায়—যাহারা শূদ্র হইয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে সাহসী হয়—তাহারা কখনও মনে মনে চিন্তা করে না যে, তাহার এই কল্পিত সংস্কারগুলি একদিন তাসের ঘরের মত সব পড়িয়া যাইবে। অজগর হিন্দু সমাজ কখনও নীরবে এ অত্যাচার সহ্য করিবে না—একদিন তাহার বিশাল দেহে সামান্য মাত্র চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলেই, এই বিপ্লববাদীর দল ফেরুপালের ন্যায় দূরে পলায়ন করিবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন কখনও হইতে পারে না। হিন্দুসমাজে সত্যের আদর ছিল—হিন্দুধর্ম্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল; সুতরাং সমাজে ও হিন্দুধর্ম্মে চিরকাল সত্যের আদর অক্ষুণ্ণ থাকিবে। মাতঙ্গের ন্যায় শক্তিশালী হিন্দুধর্ম্মের কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। বিদেশীয় ভাব ও কুহকের বশবর্ত্তী হইয়া, যাহারা উহা অনুকরণ করিয়া আমাদের পূর্ব্ব রীতিনীতি-

গুলি ত্যাগ করে, তাহাদের অধঃপতনের নিমিত্ত পুণ্যাত্মগণ দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন ও তাহাদের উদ্ধারের জন্য সত্য সত্যই তাঁহারা বিচলিত হ'ন। ইহাতে যে কেবল অনাচারীদেরই ক্ষতি হইতেছে, তাহা নহে, ইহাতে ভারতের ক্ষতি ও সর্ব্বনাশ হইতেছে। এই অমঙ্গল নিবারণার্থ মহাপুরুষগণ সততই সচেষ্ট। বাবা! আজ এই নির্জ্জন মহা শ্মশানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও, যেন কখনও ভারতের প্রাচীন রীতি-নীতি ত্যাগ করিবার তোমার প্রবৃত্তি না হয়! সেগুলি অতি মহান্! কোন দেশে,—কোন জাতির মধ্যে, কোনও সমাজের মধ্যে, তাহা খুঁজিয়া পাইবে না।"

"তোমরা যে দেশের—যে সমাজের অনুকরণ করিতে চাও, সে দেশের সকলেরই মধ্যে রাজসিক ভাব প্রবল। তাহাদের দেশে ও সমাজে কেবল পার্থিব বস্তুর জন্য মারামারি, কাটাকাটি,—যুদ্ধবিগ্রহ ও আত্মকলহ। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কেবল অহঃরহ সমর সজ্জা! কেবল পার্থিব বস্তু 'অর্থ অর্থ' করিয়া, কেবল বৃথা ঐহিক সুখের অন্বেষণে—জীবন-সংগ্রামে তাহারা নিষ্পেষিত! অনেকেই আবার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। এই জন্যই ভারতের মত সে সব সমাজে একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা নাই—আছে পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি বাহ্যাড়ম্বের বাহুল্যতা! ভারতের এক সম্প্রদায়ের লোক যে দেশের ও যে সমাজের অনুকরণ করিতে যাইতেছে,

সেই অনুকরণের ফলে তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদের বাহুল্যতা ঘটিতেছে, ভারতের পবিত্র একান্নবর্ত্তী প্রথা ত্যাগ করিতেছে, হিন্দুর পবিত্রতা, সংযম ও সাধনা হারাইতেছে, বিদেশীয় সভ্যতার চাপে হিন্দুর বিশেষত্বকে তাহারা বাঁচাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। হিন্দুর ধর্ম্ম-কর্ম্ম, চিত্তের ঔদার্য্য, চরিত্রের দৃঢ়তা নষ্ট হইতেছে! একান্নবর্ত্তী প্রথার গুণে যে ভারতবাসী সংসার-দুর্গে বসিয়া যুগ-যুগান্তর অবিরাম যুদ্ধ করিয়া উন্নতির দিকে উঠিতেছিল,—যে দুর্ভেদ্য দুর্গে বসিয়া তাহারা দান, ধ্যান, পরোপকার, অতিথি-অভ্যাগতের সৎকার, দুঃস্থ, দৈন্য, কুটুম্ব, আশ্রিত, দূর বা নিকট আত্মীয়গণের ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, পূজা, হোম, ভগবৎ চিন্তা, প্রভৃতি সংসারাশ্রমের কর্ত্তব্যগুলি পালন করিয়া আসিতে-ছিল—সেই দেশ ও সমাজ আজ কোন্ দেশের বা সমাজের রীতি-নীতির অনুকরণ করিতে যাইয়া নষ্ট হইল? ইহা অপেক্ষা সংসারা-শ্রমের উৎকৃষ্ট আদর্শ অবনীমণ্ডলে আর কোথায় কোন্ দেশে তাহারা পাইবে? তবে কোন্ প্রলোভনে তাহারা ইহা ত্যাগ করিল। তাহারা যে দেশের রীতি-নীতি দূর হইতে চাকচিক্যবৎ দেখিয়া ধরিতে যাইতেছে, সে সমাজ দুঃস্থ, জরাজীর্ণ জনক-জননীকে ভরণ পোষণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে না,—বিবাহ করিয়াই পিতামাতা ও আত্মীয়বর্গকে ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র গৃহে স্ত্রী-পুরুষে বাস করা অনুচিত বলিয়া বিবেচনা করে না—ভারতবর্ষীয় হিন্দুদের

কি এই আদর্শ অনুকরণীয়? ভাবিলে সত্য সত্যই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। যাহারা কেবল নিজ নিজ সুখ স্বচ্ছন্দতা ও পার্থিব নশ্বর দেহের ভোগ সাধনের জন্য ইহকালকেই সর্ব্বস্ব মনে করে, সেই দেশের আচার-ব্যবহার হিন্দু অনুকরণ করিবে? আমাদের পূর্ব্ব পিতৃপিতামহগণ যে আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি পালন করিয়া গিয়াছেন, সেই সব মহান্ আদর্শ ত্যাগ করিয়া, চাকচিক্যময় ভঙ্গপ্রবণ আদর্শ কেন ভারতবাসী গ্রহণ করিবে?

বাবা! আমাদের প্রাচীন রীতি-নীতি কি ত্যাগ করিবার জিনিষ? হিন্দুগণ প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তবু মিথ্যা কথা কখনও বলেন নাই, কিংবা আশ্রিতকে পরিত্যাগ করেন নাই। আমাদের এই ভারতেই পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বন গমন করিয়াছিলেন! নারীধর্ম্ম রক্ষার জন্য অগণিত সতী, জলন্ত চিতায় হাঁসিতে হাঁসিতে তনু ত্যাগ করিয়াছেন। যদি সত্য ধর্ম্ম থাকে ত ভারতেই আছে,—যদি সতী ধর্ম্ম থাকে ত এই ভারতবর্ষেই আছে! ভারতের রমণীগণ পতিকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পতিই একমাত্র দেবতা—একমাত্র অঙ্গের ভূষণ—একমাত্র বন্ধু। তাঁহারা এই পতি দেবতাকেই কায়মনোবাক্যে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও যত্ন করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভোগ, ঐশ্বর্য্য, ও সুখের স্পৃহা না করিয়া কেবল পতিকেই অভিলাষ করিয়া থাকেন। এমন নিষ্কাম স্বামী-ভক্তি আর কোথাও

দেখিতে পাইবে কি? এই ভারতেই সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, শৈব্যা, ভদ্রা, চিন্তা, প্রভৃতি আর্য্যরমণীগণ সতীকুল শিরোমণি বলিয়া আজিও হিন্দুদিগের নিকট আহুত হইয়া থাকেন। পৌরাণিক যুগের কথা ধরিলেও রাজপুতানা ও বঙ্গদেশের ইতিহাস পাঠ করিলে শত সহস্র আদর্শ সতীর জ্বলন্ত উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যাইবে। কৈ অপর দেশের এরূপ একটি আদর্শ দেখাও দেখি। এই ভারতই কেবল জানে যে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সব শেষ হয় না। মৃত্যুর পরেও আমাদের স্বতন্ত্র কর্ম্ম থাকে। তাই হিন্দুরা ঐহিকটাকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া ভাবিতে পারে না। হিন্দুরা জানে, সংসারে তা'রা দুদিনের অতিথি মাত্র। সকলেই নট ও নটীর ন্যায় সংসার-রঙ্গভূমিতে দুদিনের নিমিত্ত অভিনয় করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অভিনয় শেষ হইলেই, গাঢ় অন্ধকারে আবৃত হইয়া সকলেরই জীবনে যবনিকা পড়িবে। হিন্দু এই কথা জানে, হিন্দু এই কথা মানে, তাই সকলে সাংসারিক ধর্ম্ম পালন করিয়াও আবার একটী কর্ম্মের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। সকলেরই লক্ষ্য এক—সকলেরই কর্ম্ম এক। তবে শিক্ষা-দীক্ষার দোষে কোথাও বা বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তাই এই সব আদর্শ ভারতেই সম্ভবে। যাক সে কথা। এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব; কিন্তু তোমায় জিজ্ঞাসা করি—"তুমি সংসারে যাইতে অস্বীকৃত কেন?"

সেই সংসার-ভয়ে ভীত ব্যক্তি কাতর বচনে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে, ভক্তিগদগদচিত্তে নতজানু হইয়া করযোড়ে বলিতে লাগিল :—

"গুরুদেব! সংসার জ্বালার প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে তনু দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। সংসারে যে সুখ, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। আবার আমাকে কেন সেই স্বার্থের কোলাহলপূর্ণ জঘন্য সংসারে প্রবেশ করিতে অনুমতি করিতেছেন। আর আমার সেই রোগ-শোকপূর্ণ, হাহাকারময় সংসারে যাইবার বাসনা নাই! আপনার পদাশ্রয় লাভ করিয়া, আমি জীবনের গন্তব্যপথের সন্ধান পাইয়াছি। আমি আপনার অমৃতময় বাক্যে সেই আনন্দময়, অমৃতময়ের সন্ধান পাইয়াছি। আমাকে আর পরিত্যাগ করিবেন না। আমার জীবনের এখন অপরাহ্নকাল উপস্থিত! সংসারের সুখ হাড়ে হাড়ে ভোগ করিয়াছি! এখনও কি আমার ভোগের,—কর্ম্মফলের অবসান হয় নাই গুরুদেব?"

সন্ন্যাসী মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিলেন :—

"বৎস! কর্ম্মেরও অবসান নাই, কর্ম্মফলেরও ক্ষয় নাই। সে বহু দূরের কথা! কত যুগ-যুগান্তরের পর যে, সে দিন আসিবে তাহা আমি হৃদয়ে এখনও ধারণা করিতে পারি না। তুমি আজই বাবা কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের শেষ দেখিতে চাও! সংসার ত্যাগের সময় তোমার হয় নাই! যাহারা প্রকৃত সংসারী, তাহাদিগকে মার্ত্তণ্ডতাপে দগ্ধ হইতে হয় না,—তাহারা কখনও স্বার্থের

কোলাহলে আত্মবিস্মৃত হয় না,—রোগ-জ্বালা হাহাকার ধ্বনিও তাহারা কখন শ্রবণ করে না। জীবনের অপরাহ্ণ সায়াহ্ণ নাই,— অনন্তকালের সহিত এই জীবন সংসৃষ্ট। বৎস! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি প্রকৃত সংসারী হও। যাহারা প্রকৃত গৃহী বা সংসারী, তাহারা কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করিবে; কিন্তু কর্ম্মফলের আকাঙ্খা রাখিবে না। সুখে বা দুঃখে কখন মুহ্যমান হইবে না! অচল, অটল মহীরুহের ন্যায় গৃহীকে সংসার-প্রান্তরে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। শাখা, প্রশাখা পল্লব ও ঘন পত্র বিশিষ্ট মহীরুহের বাহ্যাকৃতি দেখিয়া মানুষ যেরূপ তাহার দুঃখের চিহ্ন মাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না; গৃহীকেও তদ্রূপ হইতে হইবে। কখন প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে শাখা-প্রশাখা ভগ্ন হইবে,—কখন বজ্র পতনে ঝলসিয়া যাইবে,—কখন বা প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে পত্র শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়িবে; কিন্তু মহীরুহের ন্যায় অচল ও অটল হইয়া ঊর্দ্ধ মস্তকে, আকাশের দিকে, ভগবানের পানে গৃহীকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে। অন্যদিকে সে কখন দৃক্‌পাত করিবে না। বৎস! যোগ বিয়োগই সংসার! তাহাতে মুহ্যমান হইলে চলিবে কেন? কঠোর হইয়াও যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে-তাপিত পথিক পিপাসু হৃদয়ে যেরূপ লোকালয়হীন মরু প্রান্তরে বৃক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রান্তি দূর করে, গৃহস্থাশ্রমীও তদ্রূপ দীন, আতুর, বিপন্ন, অভাবগ্রস্তকে আশ্রয় প্রদান

করিবে। যদি প্রকৃত সংসারী হইতে চাও, তবে তোমার হৃদয়ে যেন কখন মিথ্যা বা কপটতা স্পর্শ না করে। গৃহীর পক্ষে "পাটোয়ারি" বুদ্ধি মহা পাপের কারণ! কথায় বলে, সহস্র ক্ষতি হইলেও হৃদয়ের ভাব, মুখে ব্যক্ত করিবে! 'মনকে কখন আঁখি ঠেরিও না!' তাহা হইলে তোমার মনুষ্যত্ব একেবারেই নষ্ট হইয়া যাইবে। সকলের অন্তরেই স্বয়ং ভগবান—নারায়ণ বিরাজ করিতেছেন। অতএব বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া চলিবে। প্রকৃত গৃহস্থাশ্রমীর কাছে সন্ন্যাসধর্ম্মও লজ্জা পায়! সংসার হইতেই সন্ন্যাসীর জন্ম! তবে বিদেশী ভাব ও রীতি-নীতি অনুকরণ করিয়া, আজকাল যে সব সংসারের সৃষ্টি হইয়াছে, সে সব সংসারে কখন সন্ন্যাসী জন্মগ্রহণ করে না—বা করিবে না! সে সব সংসারে চশমাপরা বিলাসী বাবুর উৎপত্তি হইতেছে। তাহারা কয়েক বৎসরের পাশবিক লীলা সংসারে সীমাবদ্ধ রাখিয়া কাল-স্রোতে ভাসিয়া পড়িবে। জগৎ বিন্দুমাত্র তাহাদের দ্বারা উপকৃত হইবে না।"

সন্ন্যাসী কথা শেষ করিয়া, চিতায় দুই একটী শুষ্ক কাষ্ঠ প্রদান করিলেন। পরে সেই যুবতীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"হতভাগিনী এখনও তোমার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল না। তবে ঘুমাও, আরামে নিদ্রা যাও, এই অচৈতন্য অবস্থায় তোমার প্রাণে শান্তি ফিরিয়া আসিলেও, আসিতে পারে।"

সেইভক্ত পূর্ব্ববৎ অশ্রুপূর্ণনয়নে করযোড়ে বলিল,—"দেব! আমাকে পুনর্ব্বার সংসারে যাইতে আদেশ করিতেছেন সত্য, কিন্তু কি করিয়া প্রকৃত সংসার ধর্ম্ম পালন করিব? বিদেশী শিক্ষা-প্রভাবে ও বিজাতীয় ভাবানুকরণে আপনার কথিত হিন্দুর সংসার এখন আর নাই। গোড়া হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, খৃষ্টান এই চারি জাতির ভাব, রীতি, নীতি ও ধর্ম্মের সংমিশ্রনে হিন্দুর সংসার এখন খিচুড়ীর পাকে দাঁড়াইয়া, আঁকিয়া যাইবার মত হইয়াছে। প্রাচীন রীতি-নীতি সম্পূর্ণভাবে পালন করিবার সুযোগ বা সুবিধা নাই। সংসার প্রতিপালন করিবার জন্য অর্থের প্রয়োজন; কিন্তু পূর্ব্বের রীতি-নীতি সংসারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, অধিক অর্থের প্রয়োজন হয় না এবং সে অর্থ সত্য, সততা ও ন্যায়ধর্ম্মের দ্বারা লাভও হয়, ইহাও সত্য, কিন্তু এই সমস্ত লোকের সংস্পর্শে বা সংশ্রবে না থাকিলে অথবা ইহাদের সহিত আদান-প্রদান না চলিলে আবার সংসার রক্ষা বা অর্থোপার্জ্জন হইবে না! বিশেষতঃ সংসর্গ একটি ভয়ঙ্কর জিনিস! কুসংসর্গে নিজ চরিত্র রক্ষা করা কেবল যে কঠিন তাহা নয়, নিজ গন্তব্যপথে চলিতে পদে পদে তাহাদের কাছে অপদস্থ ও ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে। মনে করুন, সংসার রক্ষার জন্য কোন কারণে আমাকে হয় ত কোনও রাজকর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। আমি দেশীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া

তাঁহার নিকট গমন করিলে, হয় ত তিনি ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন। আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করা দূরের কথা, একটি কথা পর্য্যন্ত কহিবেন না, অধিকন্তু তাঁহার দ্বারবান-হস্তে অর্দ্ধচন্দ্র লাভ করিয়া আমাকে অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে।"

সন্ন্যাসী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"বাবা! এটা ত স্বাভাবিক, সত্য কথা। তাহা হইলে তুমি প্রকৃত সংসারী কি করিয়া হইবে? পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি যে, অচল, অটল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কর্ত্তব্যবোধে কার্য্য করিয়া যাইবে। ফলাফলের দিকে দৃষ্টি রাখিবে না! নগ্নপদে যাইয়া যদি তোমাকে লাঞ্ছিত, অপদস্থ ও বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিতে হয়, তাহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই! প্রাচীন রীতি-নীতি ভারতের ঘরে ঘরে পুনঃপ্রচলিত হইবে, ইহা ধ্রুব সত্য; কিন্তু বৎস! সকলেই যদি বলে, "বিদেশী ভাবস্রোতে যখন সকলেই ভাসিতেছে, তখন আমি একা স্রোতের বিপরীতে কি করিয়া সন্তরণ দিব?" তাহা হইলে মহাত্মাদের চেষ্টা যে পণ্ড হইয়া যাইবে! একাই তুমি যদি বিপরীত-স্রোতে সাঁতার দিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে দলে দলে ভারতবাসী তোমার পশ্চাদনুসরণ করিবে। লোকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেশভূষা দেখিয়া প্রথমে উপহাস করিয়াছিল; কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হ'ন নাই। এই পোষাকের জন্য তিনি কতস্থানে, কত প্রকারে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছেন, তবুও তিনি তাঁহার

সংকল্প এক দিনের জন্যও পরিবর্ত্তন করেন নাই। ইহারই ফলে আজকাল "বিদ্যাসাগরী চাদর" ও "চটী জুতার" প্রচলন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সমাজের সংস্কার প্রভৃতি কিছু আবশ্যক হইলেই সকল সময়ে, সকল যুগে মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া লোক শিক্ষা দিয়া থাকেন। বর্ত্তমান যুগে রামকৃষ্ণ দেব, বিদ্যাসাগর মহাশয়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি মহাত্মগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া কি সেই সময়ের জঘন্য স্রোত কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন নাই? অবশ্যই একথা তুমি অস্বীকার করিতে পারিবে না। তাই বলিতেছিলাম যে, সমাজের একটা পরিবর্ত্তন ঘটিবেই ঘটিবে—সে দিনের আর বিলম্ব নাই।"

"আজকাল দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ বিলাসিতার পঙ্কিল স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছেন, একথা সত্য এবং তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই দেশের লোক সর্ব্বনাশের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে! যাহারা বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত,—যাহারা বিদেশী শিক্ষায় দীক্ষিত, —যাহারা বিদেশী ভাবের ভাবুক,—পার্থিব বস্তু লাভের জন্য যাহাদের বুকে অহরহঃ চিতার আগুন জ্বলিতেছে,—ভারতের বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা যাহারা কখনও স্পর্শ করে না,—সংযম আচার কাহাকে বলে যাহারা জানে না,—বিলাস ভোগেচ্ছা অহরহঃ যাহাদের হৃদয়ে জাগরূক,—স্বার্থত্যাগের মধুরতা যাহারা জীবনে আস্বাদ পায় নাই,—বিদেশী পোষাক-পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত

যাহারা দেবতার প্রসাদ জ্ঞানে গৃহে বাহিরে ত্যাগ করিতে পারে না, তাহারাই ত এখন দেশের নেতা ও পথ-প্রদর্শক। বিষবৎ ইহাদের সংসর্গ সর্ব্বদা ত্যাগ করিবে! ইহাদের কার্য্যের বা হাব-ভাব পোষাক-পরিচ্ছদের কেহ যেন কখন কল্পনাতেও অনুকরণ না করে।”

“বৎস! ভারতের প্রাচীন রীতি-নীতি মানিয়া চলিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও। সেই প্রাচীনভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা কর—গৃহে গৃহে ভারতের সেই প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্য ও সংযম প্রতিষ্ঠিত হউক,—দেখিবে অচিরে নগ্নপদে, গীতা-পাতঞ্জল, ও বেদ-বেদাঙ্গ হস্তে লইয়া ওঙ্কারধ্বনি ও সামগান করিতে করিতে পর্ব্বতগুহা হইতে তোমাদের দেশ-নেতৃগণ আগমন করিবেন। আবার এই ভারতভূমি অতীতের যোগভূমি হইয়া উঠিবে—ঘরে ঘরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে,—দুঃখ, দৈন্য, হাহাকার ধ্বনি,—দুর্ভিক্ষ মহামারি অশান্তি প্রভৃতি তিলার্দ্ধের জন্যও এ দেশে স্থান পাইবে না। ধর্ম্মবলের নিকট কোনও বল দাঁড়াইতে পারে না।”

ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া দুইখানি শুষ্ক কাষ্ঠ পুনরায় প্রজ্বলিত চিতায় নিক্ষেপ করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—

“বৎস! তোমার পিতা কি ভাবে সংসারে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি অবগত আছ?”

ভক্ত অশ্রুসিক্ত নয়নে উত্তর করিল ;—

"দেব! আমি যখন বালক, তখন তিনি নিত্যধামে গিয়াছেন তাঁহার চরণ-দর্শনের সুবিধা বা সুযোগ আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই।"

"তোমার পিতৃপিতামহের চরিত্র কখন কি জানিবার চেষ্টা করিয়াছ?"

"না গুরুদেব।"

"বৎস! কেবল তুমি বলিয়া নয়—আজকাল কেহই তাহা করে না! এই জন্যই দেশের এতদূর অধঃপতন! পিতৃপিতামহ কি ভাবে জীবন-যাপন করিয়া গিয়াছেন, লোকে যদি তাহা জানিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করিত,—পূর্ব্বতন মহাত্মগণের অগাধ অনন্ত শাস্ত্রগ্রন্থ যদি একবার পাঠ করিত, তবে কি তাহারা বিদেশী আচার-ব্যবহারের বাহ্যিক চাকচিক্য দেখিয়া, এত শীঘ্র আকৃষ্ট হইত? ঘরের দেবতাকে যাহারা কখন ভক্তি করিতে পারে না,—শালগ্রাম শিলাকে যাহারা 'পাথর-নুড়ি' বলিয়া ঘৃণা করে,—পৌত্তলিক বলিয়া যাহারা স্বজাতী ও পিতৃ-পুরুষকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে, তাহাদের দুর্দ্দশায় শৃগাল কুক্কুর ক্রন্দন করিবে, ইহা কি বিচিত্র? ভারতের অগাধ শাস্ত্রগ্রন্থ,—যাহার ভাব গ্রহণ করিতে অন্য জাতির যুগ-যুগান্তর কাটিয়া যাইবে, তাহার স্বাদ গ্রহণ না করিয়া, অর্থোপার্জ্জনের জন্য, যাহারা পঞ্চম বর্ষ হইতে

বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিতে ধাবমান হয়, তাহাদের পরিণাম যে ভয়াবহ হইবে, ইহাও ত স্বাভাবিক।

"বৎস! তোমার পিতৃদেব আমার অপরিচিত ছিলেন না। তাঁহার পুণ্য-কাহিনীর কিয়দংশ এই মহাশ্মশানে বসিয়া আজ তোমাকে শুনাইব।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী আবার একখানি শুষ্ক কাষ্ঠ প্রজ্বলিত চিতায় নিক্ষেপ করিলেন। একবার ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন পরক্ষণেই ভক্তের মুখের দিকে একবার চাহিলেন। আবার কিয়ৎক্ষণ আকাশের দিকে উজ্জ্বল চক্ষু দুটি স্থাপিত করিলেন। সেই বিশাল আঁখিদ্বয় জলভারাক্রান্ত হইল। বুঝি কত পূর্ব্ব ঘটনা, কত পুরাতন স্মৃতি সন্ন্যাসীর মনে উদিত হইয়া তাঁহাকে উদ্বেলিত করিতেছে।

অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে ভক্তের দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন--

"শুন বৎস! সে আজ কিঞ্চিতধিক পঞ্চাশ বৎসরের কথা। এই সময়ের মধ্যে ভারতের এবং হিন্দুর যে সামাজিক ও নৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে---আমার গুরুদেব বলেন, কোন দেশে কখন এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুর যে ধর্ম্মভাব ছিল, ব্রাহ্মণের যে ব্রহ্মত্ব ছিল, যে ব্রত, নিয়ম ও সংযম ছিল, এখন আর তাহা নাই। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রজনীকে হটাৎ যেন অমানিশার অন্ধকার আসিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে। আরও কত দিন যে ভারতের সেই ধর্ম্মের জ্যোতি

ঢাকা থাকিবে, তাহা ভগবানই অবগত আছেন। আমাদের পিতৃপুরুষ সেই প্রাচীন ঋষিগণের ধর্ম্মের মূলধন—বড় লোকের বিলাসী ছেলের মত পাপস্রোতে গা ভাসাইয়া আমরা যেন একবারেই ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া পথের কাঙ্গাল হইতে বসিয়াছি!” বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী ভাবাবিষ্ট হইলেন, চক্ষু দিয়া প্রবলবেগে অশ্রু বহির্গত হইতে লাগিল. কিয়ৎক্ষণপরে প্রকৃতিস্থ হইয়া সন্ন্যাসী পুনরায় বলিতে লাগিলেন:—

“আসিবে আবার ফিরিয়া আসিবে! আমার গুরুদেবের বাণী মিথ্যা হইবার নয়। ভারতে আবার আর্য্যধর্ম্মের বিমল জ্যোতি ফুটিয়া উঠিবে! বিসর্জ্জনের বাদ্যের পর আবার আগমনীর বাদ্য-ধ্বনি হয়, ইহাই জগতের নিয়ম! নগ্নপদে নগ্নগাত্রে ব্রাহ্মণগণ আবার বেদগান করিবে। বিলাসিতা পরিবর্জ্জন করিবে, পাশ্চাত্য মোহ দূর হইয়া যাইবে।”

হুগলি জেলার সারাটী গ্রামে তোমার মহাত্মা পিতা জন্মগ্রহণ করেন। সারাটীর সুদীর্ঘ দশ ক্রোশব্যাপী প্রান্তর হরিদ্বর্ণ শস্যে পরিপূর্ণ থাকিয়া “সুজলা সুফলা” নামের সার্থকতা সম্পাদন করিত। ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলপথের কল্যাণে সে মাঠ তখন বর্ত্তমানের শ্মশানভূমিতে পরিণত হয় নাই। এখন যেমন ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী করালবদনে সারাটীকে গ্রাস করিয়া ধ্বংসের পথে ভাসাইয়া দিয়াছে, তাহার তীব্র হলাহলে জর্জ্জরিত

হইয়া মৃত্যুর ক্রোড়ে গ্রামবাসী ঢলিয়া পড়িয়াছে, তখন সে প্রকার হয় নাই। তখন সকলেই নীরোগ দেহ ও অটুট স্বাস্থ্য লইয়া বীরদর্পে জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হইত। সকলেই অঋণী অবস্থায়, স্বদেশে থাকিয়া, সহস্ত-রোপিত ধান্যে সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিত। পূজা, হোম, দান, ধ্যান, অতিথি সেবা, বার মাসে হিন্দুর তের পার্ব্বণ প্রত্যেক গৃহেই অনুষ্ঠিত হইত। তখনকার হিন্দুর সংসার এখনকার মত ম্লেচ্ছের সংসার ছিল না।"

"তখন ইংরাজী শিক্ষার বেশ প্রচলন হইয়াছে। তোমার পিতামহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি জীবিত থাকিতে বংশে কাহাকেও ইংরাজী পুস্তক স্পর্শ করিতে দিবেন না। তিনি বলিতেন আমাদের হিন্দুর যে শাস্ত্রগ্রন্থ আছে, তাহার শতাংশের এক অংশও সারাজীবনে যখন শেষ করিতে পারা যায় না, তখন আবার অপরের ভাষা শিক্ষা করিবার প্রয়োজন কি? কেহ কেহ বলিতেন—"বন্দোপাধ্যায় মহাশয় ইংরাজী বিদ্যা যে অর্থকরী বিদ্যা, ইংরাজী শিক্ষা না করিলে সন্তান-সন্ততি কি প্রকারে জীবিকা উপার্জ্জন করিবে?" তোমার পিতামহ রোষকষায়িত নেত্রে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া বলিতেন—"অর্থই কি জীবনের সার বস্তু? আমাদের অয়স্কান্ত মণি স্বরূপ অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থ [illegible] রাখিয়া, অন্য অর্থের জন্য লালায়িত হইবার প্রয়োজন কি? অর্থ কি দুদিনের সুখের জন্য? কিন্তু অনন্ত-সুখ, অনন্ত [illegible]

মণি পুঁথির ভিতরেই আছে। যে সব কুলাঙ্গার অর্থকরী বিদ্যার দিকে ছুটিতেছে, দেখিবে ভবিষ্যতে তাহারা হা অন্ন হা অন্ন করিয়া আত্মসম্ভ্রম, প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি, কুলশীল সকলই জলাঞ্জলি দিবে। এক মুষ্টি অন্নের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ শুদ্রোচিত কার্য্য করিতেও বিরত হইবে না। উদরান্নের নিমিত্ত অস্পৃশ্য জাতিরও তোষামোদ করিবে; কিন্তু কিছুতেই তাহাদের সে আশা তৃপ্ত হইবে না। চাকরী, ভিক্ষা, ইত্যাদিতে কিছুতেই তাহাদের ব্যয় সঙ্কুলান হইবে না—তখন আবার ঋষি-প্রণোদিত হইয়া পুরাতন পথে ফিরিয়া আসিবে। লাঞ্ছনা, অবমাননা ও আশাভঙ্গে তাহাদের চৈতন্য আবার ফিরিয়া আসিবে; কিন্তু সহজে ইহা ঘটিবে না। মানব মৃত্যু সুনিশ্চয় জানিয়াও পতঙ্গবৎ অগ্নিতে ঝম্প প্রদান করিবে—তাহারা বংশগৌরব, জাতির গৌরব, হিন্দুত্ব ঐ বিদ্যার স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া পিতৃপুরুষের জ্ঞান ও ধর্ম্মে, কালিমা লেপন করিবে—তাহারা আয়ু স্বাস্থ্য, বল, সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়া জগতের নিকট ভিক্ষা প্রার্থী হইবে। কেহ বাক্ সর্ব্বস্ব হইবে, কেহ মিথ্যা কথার বিপণী খুলিয়া ইহকাল পরকাল বিসর্জ্জন দিবে! কেহ বা অস্থিকঙ্কালসার হইয়া দাসত্ব বৃত্তি অবলম্বন করিবে। ইচ্ছা থাকিলেও তাহারা পর-কালের চিন্তা করিতে অবসর মাত্র পাইবে না। নিজের অগাধ শাস্ত্র-গ্রন্থে কি আছে, তাহা না দেখিয়া যে পরভাষা শিক্ষা করিতে চায়, তাহার পাপ অমার্জ্জনীয়। সেই অমার্জ্জনীয় পাপে কেবল তাহারা

নিজে নয়, দেশ উৎসন্ন যাইবে! ইহাতে "নিজের যা কিছু" তাহা ভুলিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক! আর যদি কেবল অর্থের কথাই ধর— ব্রাহ্মণের অর্থের প্রয়োজন কি? কত কোটী কোটী জন্মের পর মনুষ্য জন্ম লাভ হয়। আবার কত তপস্যার ফলে ব্রাহ্মণকুলে আমরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, এ জন্মটা কি বৃথা হারাইবার জন্য! ব্রাহ্মণ কি অর্থের জন্য এমন জন্মটা হেলায় নষ্ট করিবে? এমন পাপ কথা তোমরা কখনও মুখে আনিও না; শুনিলেও পাপ হয়।"

তোমার পিতা, জনকঋষিতুল্য তাঁহার জনকের কাছে বাল্যে শাস্ত্র গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াছিলেন। মৃত্যু সময়ে তোমার পিতামহ তোমার পিতাকে পরোপকার ও দীন দুঃখীর সেবার জন্য আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আদেশ করেন। তোমার পিতা রামময় পিতার অন্তিম আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। সে কি অদ্ভুত শাস্ত্র-অধ্যয়ন! সেরূপ একাগ্রতা, সেরূপ উদ্যম, সেরূপ পরিশ্রম—অসাধারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঋষিতুল্য পিতার অন্তিম-আদেশ তাঁহাকে যেন প্রবল জলস্রোতের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র-সিন্ধুর মধ্য দিয়া ওতঃপ্রোতভাবে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল! তিনি ব্যাকরণ, বেদ, পাতঞ্জল, গীতা প্রভৃতি কত শাস্ত্র গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু এরূপ অভিনিবেশ সহকারে গ্রন্থ পাঠ করিতে কখন দেখি নাই! বৎসরের পর বৎসর এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে

তিনি কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়াছেন! তাঁহার অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দেখিয়া ভাবিতাম, ব্রাহ্মণের অস্থিমজ্জা ব্যতীত এমন অসাধারণ শক্তি জগতে আর কার আছে? পিতার আশীর্ব্বাদে ও ঐকান্তিক চেষ্টায় রামময় বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলি জেলায় কেবল বলি কেন, তৎসময়ে তাঁহার সমকক্ষ চিকিৎসক সে দেশে আর কেহ ছিল না। জ্ঞান, ধর্ম্ম, পুণ্য, দান, পরোপকারিতা, সহিষ্ণুতা, ব্রহ্মচর্য্য, সংযম, বিদ্যা ও দৈহিক বলে তাঁহার সমকক্ষ হুগলি জেলায় তখন আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যাইত না।

বৎস! তোমার মহাত্মা পিতৃদেবের জীবনের সমস্ত ঘটনার পরিচয় দিবার আর সময় নাই! রজনীর তৃতীয় যাম অতীত প্রায়! একদিনকার একটি ঘটনার কথা বলিব। এই ঘটনাটি যদি তুমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পার তবে "তোমরা কি ছিলে কি হইয়াছ" বেশ বুঝিতে পারিবে।

সে আজ অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কালের কথা নয়, গুরুদেবের সহিত আমরা হিমালয়ের গুহা হইতে তীর্থযাত্রীরূপে বহির্গত হইয়াছি। তৎপূর্ব্বে ত্রিংশত বর্ষ তিনি লোকালয় দর্শন করেন নাই। ধ্যান-নিমীলিত নেত্রে এই ত্রিংশত বর্ষ হিমালয়ের নিভৃত গুহাভ্যন্তরে নিশ্চল নিস্পন্দরূপে তাঁহার অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। বুঝি এই লোকালয় দর্শনের কোন উদ্দেশ্য ছিল। বহু তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া গুরুদেব লোকালয়ের পথ ধরিয়া সেতুবন্ধ গমন করিতেছেন।

অমাবস্যার ভীষণ অন্ধকার তখন রজনীর দ্বিতীয় প্রহরকে আরও ঘনীভূত করিয়াছে।

আমরা বহু ক্রোশব্যাপী এক প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সহসা দেখিলাম অদূরে একটি ব্রাহ্মণ ও তৎপশ্চাতে আর একজন লোক দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছে। পশ্চাতের লোকটি সম্ভবতঃ ব্রহ্মণের ভৃত্য হইবে—কারণ তাহার এক হস্তে একটি মশাল অপর হস্তে যষ্টি ছিল। সেই বিরাট অন্ধকারে সেই মশালের উজ্জ্বল আলোক খদ্যোতের ন্যায় দেখাইতেছিল। সময়টা গ্রীষ্ম কাল—বৈশাখ মাস। ব্রাহ্মণের নগ্নপদ, নগ্নদেহ, বক্ষে শুভ্র সদ্যোপবিতের গোছা। শান্ত, স্নিগ্ধ, দেহখানি হইতে যেন ব্রহ্মতেজ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। স্কন্ধে সামান্য একখানি উত্তরীয় মাত্র। তাহাতে যেন কি জড়ান রহিয়াছে। পরে জানিয়াছিলাম, সেটি বেদের পুটলি। ভৃত্যের লম্বা কাল মেঘের ন্যায় চুলগুলি স্কন্ধে পড়িয়া গ্রীষ্মের স্নিগ্ধ বাতাসে ফুর ফুর করিয়া উড়িতেছে। সে ব্যক্তি যে অদ্বিতীয় বলশালী, তাহার দেহ দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাহার বর্ণ গাঢ় শ্যামবর্ণ, প্রশস্ত বক্ষঃস্থল, লৌহ মুষলের ন্যায় বাহুযুগল বলিষ্ঠ; কিন্তু তাহাকে দেখিলে ভয়ের উদ্রেক হয় না! মনে হয়, বাহু দুইখানি অপরিমেয় শক্তির আধার হইলেও যেন উহা দীনের সহায়,—আর্ত্তের বন্ধু,—অত্যাচারীর যম সদৃশ। তাহার ভুজদণ্ড অপেক্ষা হস্তস্থিত প্রকাণ্ড বংশ দণ্ড

দেখিলে মনে ভয়ের উদ্রেক হয় বটে। সে প্রভুর পশ্চাতে হন্ হন্ করিয়া চলিয়াছে! কোনদিকে তাহার দৃক্পাত নাই! প্রভুর ন্যায় ভৃত্যটিও যেন ধর্ম্মবলে বলীয়ান! তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া আমার গুরুদেব বলিলেন—"বাবা! এই ব্রাহ্মণের শক্তি অদ্ভুত। ইহার ব্রহ্মতেজ দেখিয়া আজ আমি প্রাণে বড়ই আনন্দলাভ করিতেছি।"

পরক্ষণে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"হায়! ভারতভূমি! কালধর্ম্মে এই ব্রহ্মতেজ তোমার বক্ষঃচ্যুত হইবে!"

গুরুদেব শেষ কথাটি একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন। জনহীন প্রান্তরে হঠাৎ মানবের স্বর শুনিতে পাইয়া ভৃত্য চমকিত হইয়া দাড়াইল। তারপর আমাদের সম্মুখীন হইয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিল—"কে তোমরা—এত রাত্রে এই বিজন প্রান্তরে কি করিতেছ?"

সেদিন ব্রহ্মতেজ দেখিয়া দিব্যানন্দে গুরুদেবের হৃদয় নৃত্য করিতেছিল। তাঁহার আরও কিছু বুঝি প্রত্যক্ষ করিবার ইচ্ছা হইল!

তিনি বলিলেন—"তুমি কে বাবা?"

"আমি কিনু সর্দ্দার! তোমরা কে এখনও যে বল্‌ছ না?"

কি প্রভুত্বব্যঞ্জক গম্ভীরস্বর! সে স্বরে নরঘাতী নির্ম্মম দস্যুও চমকিত হয়। তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিলাম যে, সে আমাদিগকে

দস্যু মনে করিয়াছে এবং তাহার প্রভুকে হত্যা করিবার জন্যই যেন এই দ্বিপ্রহর রজনীতে আমরা মাঠে সুযোগ অন্বেষণ করিতেছি!

গুরুদেব বলিলেন—"বাবা! আমাদের আর কি পরিচয় দিব, আমরা সন্ন্যাসী মাত্র।"

কিন্তু সর্দ্দার পূর্ব্বের ন্যায় গম্ভীরস্বরে বলিল—"মিথ্যা কথা।"

"বাবা! সন্ন্যাসী কখনও মিথ্যা কথা কহে না।"

এতক্ষণ তাহার প্রভু কিছু বলেন নাই। এইবার প্রভু ও ভৃত্যে কি বলাবলি করিয়া উভয়ে সমস্বরে বলিল—"সত্যই আপনারা সন্ন্যাসী?"

"হাঁ বাবা।"

ব্রাহ্মণ। "আপনাদের সেবা হইয়াছে?"

গুরুদেব বলিলেন—"না।"

ব্রাহ্মণ। "তবে কি আপনারা অভুক্ত?"

গুরুদেব। "হাঁ বাবা! আমরা আজ তিন দিন অভুক্ত অবস্থায় আছি।"

ব্রাহ্মণ। "তবে দয়া করিয়া অদ্য রজনীতে এই দীন ব্রাহ্মণের গৃহে পদার্পণ করিতে হইবে।"

গুরুদেব। "বেশ বাবা চল।"

আমরা তিন দিন জলস্পর্শ করি নাই; লোকালয়ে আসিলেও

গৃহীর নিকট যাচ্ঞা করিবার আদেশ গুরুদেবের নাই। ব্রাহ্মণের অনুরোধ গুরুদেব উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। বুঝি ত্রিংশৎবর্ষের পর একটি হিন্দু সংসার—নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পরিবার দেখিবার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। গৃহস্থের আশ্রমে গুরুদেবকে আমি এই প্রথম অতিথি হইতে দেখিলাম।

আমরা চারিজনে সেই অমাবস্যার গাঢ় তিমিরাবৃত রজনীতে বহু ক্রোশব্যাপী ত্রিপান্তর মাঠ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। গুরুদেব তাঁহার গতি হ্রাস করিলেন! সন্ন্যাসীরা যে গতিতে পথ চলেন, সেইরূপ ভাবে চলিলে তোমার পিতার ভবনে পৌছিতে আমাদের এক দণ্ডের অধিক সময় লাগিত না! বুঝিলাম, ব্রাহ্মণ আজ কৃপা-লাভ করিয়াছেন। আজ বুঝিলাম, ব্রহ্মতেজের কাছে ভগবান কেন মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। হায়! ব্রাহ্মণ কোন পাপে তোমরা আজ সে তেজ হারাইতে বসিয়াছ!”

সন্ন্যাসীর আঁখি-যুগল আবার জলভারাক্রান্ত হইল।

প্রকৃতিস্থ হইয়া সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন—“পথ চলিতে চলিতে আমি কিন্তু সর্দ্দারের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলাম। কথোপকথনে যাহা বুঝিলাম, তাহাতে ব্রাহ্মণের প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তির উদ্রেক হইল। ব্রাহ্মণ রাত্রিকালে অনাথ আতুরের গৃহে গিয়া, তাহাদিগের শুশ্রূষার ও ঔষধ প্রদানের ব্যবস্থা করেন। দিবাভাগে অন্যান্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়, দীন সেবার তাঁহার

সুবিধা ঘটে না। এজন্য ব্রাহ্মণকে প্রায়ই বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিতে হয়। ভৃত্য কেনারাম বাগ্দী ওরফে কিনু সর্দারই ব্রাহ্মণের এই কার্য্যের একমাত্র সহায় ও অবলম্বন। হায়! পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সেরূপ প্রভুভক্ত ভৃত্যও ভারতভূমি হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

কিনু সর্দার বলিল—"ঠাকুর! সাধে কি তোমাদের উপর আমার রাগ হইয়াছিল। তিনমাস আগে এই মাঠেই আমার ঠাকুরকে ডাকাতে ঘিরিয়াছিল। সেদিন আমাদের বাটীতে কয়জন অতিথি আসিয়াছিল বলিয়া, ঠাকুর আমার উপর তাহাদের সেবার ভার দিয়া রোগী দেখিতে বাহির হইয়াছিলেন। আমি বার বার বলিলাম—"ঠাকুর তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি অতিথি-সেবার উদ্যোগ করিয়া দিয়া, তোমার সঙ্গে যাইব; কিন্তু তিনি কিছুতেই আমার কথা শুনিলেন না, বলিলেন—"না! তুমি আসিলে অতিথিদের কষ্ট হইবে। তাঁহাদের কখন কি আবশ্যক হয়, তাহা ত বলা যায় না।" ঠাকুর রোগী দেখিতে গেলেন; আমার মনটা কিন্তু খারাপ হইল। কারণ, ডাকাতের উপর আমার বরাবরই সন্দেহ ছিল। অতিথিদিগকে আহারাদি করাইয়া শয়ন করাইতে রজনী একপ্রহর অতীত হইয়া গেল। মা বলিলেন—"বাবা কিনু! এইবার তুমি ভোজন কর।" আমি বলিলাম—"না মা! ঠাকুর মহাশয় আজ একা গিয়াছেন; আমি তাঁহাকে বাটী না আনিয়া অন্ন গ্রহণ করিব না।

আমার কথা শুনিয়া মা জননীর মুখ শুখাইয়া গেল। মায়ের মুখের পানে চাহিয়া আমারও কান্না পাইল। কেনার চোখ দিয়া সহজে জল পড়ে না ঠাকুর! কিন্তু মায়ের মুখ দেখিয়া সে দিন সত্য সত্যই আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িল। মা আমার কেবল প্রভুপত্নী ন'ন! মা আমার সাক্ষাৎ গর্ভধারিণী তুল্য এবং গৃহের লক্ষ্মী ঠাক্রুণ!

মাকে প্রণাম করিয়া এই লাঠিগাছটী ঘাড়ে করিয়া জোর করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। "এই লাঠি গাছটিই আমার একমাত্র সম্বল ঠাকুর!" এই বলিয়া কিনু লাঠিগাছটিকে মস্তকে স্পর্শ করাইল। তারপর আবার বলিতে লাগিল—"মনে করিলাম রূপা ছুটো বার করি। আবার ভাবিলাম না থাক্! তুই দণ্ডে মাঠ পার হইয়া যাইব।"

ঠাকুর সেদিন কোথায় গমন করিবেন, তাহা আমার জানা ছিল। দহগাঁ গ্রামে এক গোয়ালা বাস করিত—তাহার নাম শ্রীধর ঘোষ। বেচারীর বড়ই দুঃখের সংসার। দুগ্ধ ও দধি বিক্রয় করিয়া কোন প্রকারে দুবেলা দুটি অন্নের যোগাড় করে। তার ছেলেটি আজ কয়দিন কঠিন পীড়ায় শয্যাগত! ভুল বকিতেছে! বাতশ্লেষ্মা না কি ব্যায়রামটার নাম। বৈদ্য দেখাইতে কোথায় বা পয়সা পাইবে। তবু ঘরে একটা ঘড়া ছিল, সেইটা বেচিয়া একজন হাতুড়ে বৈদ্যকে দেখাইয়াছে। তারপর যখন তাহার বিত্তেয় আর কুলাইল না

এবং সে জবাব দিয়া চলিয়া গেল, তথন ঘোষের-পো সন্ধ্যাবেল ছুটিয়া আসিয়া আমার ঠাকুরের কাছে পড়িল। তার কান্ন দেখিয়া আমার দয়াল ঠাকুরের চক্ষুও আর্দ্র হইয়া উঠিল। তাহাবে ছুটা কি শক্ত বড়ী দিয়া বলিলেন—"তুমি এখন বাটী যাইয়া তারে শিউলিপাতার রস দিয়া এই ছুটা বড়ী সেবন করাও। আমি বাবার শীতল দিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিক করিয়া, দেড় প্রহরের মধ্যে তোমার গৃহে পৌছিব।" ঘোষ চলিয়া গেলে, আমি লাঠিগাছি বাহির করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে রাখিয়া গরুগুলিকে গোয়ালে তুলিতে গেলাম। ঠাকুর একটু পরেই বিগ্রহের ঘরে ঢুকিলেন। গরীব দুঃখীর অসুখের কথা শুনিলেই আমার ঠাকুর সেদিন স্বত প্রকারে উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহার সেই কথাগুলি শুনিতে আমার বড়ই ভাল লাগে। ঠাকুর কি বলেন, শুনিবা জন্য আমি ঠাকুর-ঘরের জানালার নিকট গমন করিয়া নীরবে দাড়াইয়া রহিলাম।

ঠাকুর গৃহে প্রবেশ করিয়া, রামচন্দ্রের সিংহাসনের সম্মু আসনের উপর বসিলেন। কোশার জল লইয়া প্রথমতঃ মু চোখে দিলেন। তারপর পৈতার গোছাটি হাতে জড়াইয়া বলি লাগিলেন—

"দেব! আপনি আমার কেবলমাত্র নিশ্চল রামচন্দ্র শিলা নন আপনি যে আমার জাগ্রত অভীষ্ট দেবতা। দেব! গরীব গোয়া

পুত্রটীর উপর কৃপাদৃষ্টি করুন। তাহার আর কেহ নাই। আমি আপনার নাম স্মরণ করিয়া ঔষধ দিয়াছি—ঠাকুর! একবার তাহার বাটী যাইয়া ছেলেটির মস্তকে পদ্মহস্ত বুলাইয়া দিন। প্রভো! আপনার পূত পবিত্র স্পর্শ ভিন্ন কিছুতেই সে রক্ষা পাইবে না। আমি যাইয়া যদি ছেলেটির মন্দ অবস্থা দেখি; তবে কোন্ মুখ লইয়া ফিরিব দেব! কি বলিয়া সেই পুত্র-শোকাতুর বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিব? আমি আপনার নাম স্মরণ করিয়া যখন ঔষধ দিই, সে ঔষধ ত কখন বিফল হয় না ঠাকুর! একবার গরীব গোয়ালার প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করুন্। দরিদ্রের বন্ধু, অনাথের নাথ, আপনি ভিন্ন আর তাহার কে আছে?”

বলিতে বলিতে আমার ঠাকুরের নয়ন দিয়া ভক্তি-অশ্রু অজস্র ধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার সেই স্বর্গীয়ভাব দেখিয়া, আমার এই কঠিন প্রাণেও আঘাত লাগিল। আমি ঠাকুরের আন্তরিক রোদন দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, সে স্থান হইতে পলাইয়া আসিলাম। আসিয়া দেখি, বাহিরে কয়জন অতিথি আসিয়াছেন। আমি তাঁহাদের ব্যবস্থা করিতেছি, এমন সময়ে প্রভু বাহিরে আসিলেন। তখনও তাঁহার কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ, আমি বড়ই কাতর হইলাম। আমি আমার পিতা-মাতার চক্ষের জল কখনও দেখিতে পারি না ঠাকুর!”

একটু থামিয়া কিনু সর্দার আবার বলিতে আরম্ভ করিল।—

"রূপা ঝা লইয়া ছুটিতে আরম্ভ করিলাম। মায়ের সেই মলিন মুখখানি দেখিয়া মনটা আরও খারাপ হইয়াছিল ঠাকুরের জন্যও একটু ভাবনা হইয়াছিল। যেখানে তোমাদের সহিত দেখা হইল, তাহার বামদিকের মাঠে হঠাৎ যাইতে যাইতে একটা শব্দ শুনিতে পাইলাম। তখন প্রথম প্রহর অতীত হইয়াছে, বুঝিলাম, ইহা ডাকাইতদিগের সাঙ্কেতিক শব্দ। লাঠিগাছটিকে আমি দৃঢ়রূপে ধরিয়া দ্রুতপদে দৌড়াইতে লাগিলাম।"

"সাবধান নিরীহ ব্রাহ্মণের অঙ্গস্পর্শ করিও না। আমার কাছে এক কপর্দ্দকও নাই, কেবলমাত্র অযথা নরহত্যার পাতকে নরকগামী হইতে হইবে।"

"বুক দুর-দুর করিতে লাগিল। এ যে আমার চিরপরিচিত আমার ঠাকুরের কণ্ঠস্বর। আশঙ্কায় আমার পা আর উঠিল না। এক লহমা দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিলাম। প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, কোন্ দিক হইতে আওয়াজটা আসিল। আবার তাঁহার স্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করিল! তখন ক্রোধে আমার সর্ব্বদেহ কাঁপিতে লাগিল! ঈশ্বর শপথ করিয়া বলিলাম, যদি আমার পিতৃচরণে ভক্তি থাকে, যদি আমার মা জননীর আশীর্ব্বাদ থাকে, তবে দেখিব, কেনা সর্দ্দারের জীবনের শেষ রক্তবিন্দু থাকিতে কে আমার ঠাকুরের কেশ স্পর্শ করে। এত সাহস! এত স্পর্দ্ধা! আমার ঠাকুরকে হত্যা করিবার

চেষ্টা ? স্বয়ং যম আসিলেও আজ কেনার হাতে কাহারও নিস্তার নাই !”

“দোহাই তোমাদের ! সত্য বলিতেছি, আমার নিকট কিছুই নাই ! আমাকে মারিয়া তোমাদের কোনও লাভ হইবে না। আমাকে দয়া করিয়া পরিত্যাগ কর।”

“ঠাকুরের কাতর চীৎকার কোন্ দিক হইতে আসিতেছে, এবার আর আমার বুঝিতে বাকী রহিল না। ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া শূন্যে দুইবার লাঠি মারিলাম। আমার চক্ষু দুটা যেন ফাটিয়া বাহির হইবার মত হইল। চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল ! আমি বাঁচিয়া থাকিতে আমার ঠাকুরের এই লাঞ্ছনা ! মা শুনিলে আমায় কি বলিবেন ! রাগে দাঁতগুলা কড়মড় করিতে লাগিল ! আমার মস্তকের কেশগুলি সোজা হইয়া উঠিল। কোন্ পথে ছুটিব, রাগে ভুলিয়া গেলাম। মা বলিয়াছিলেন—“বাবা কিনু ! রাগের বশীভূত কখন হইও না। ক্রোধ মানুষের বিষম শত্রু।” সহসা মায়ের এই উপদেশ বাণী আমার মনে পড়িল। আমি স্থির হইয়া ক্রোধকে মন হইতে দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিলাম।

আবার সেই কাতরস্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করিল—

“বাবা ! কেন আমায় মারবি ! আমার নিকট ঔষধ ভিন্ন আর কিছুই নাই।”

আর না ! সজোরে লাঠিটা ধরিয়া সেই স্বর লক্ষ্য করিয়া

ছুটিতে লাগিলাম। ছুটিতে ছুটিতে দুইবার পড়িয়া গেলাম, কতকগুলা বাবলা কাঁটা একস্থানে ছিল, আমার পৃষ্ঠে ফুটিয়া গেল। অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল, আমি ইহা গ্রাহ্য করিলাম না।

যাইয়া দেখি সর্ব্বনাশ! আট জন ডাকাতে আমার অন্নদাতা পিতাকে ঘিরিয়াছে! ঠাকুর প্রথমটা অনুনয়-বিনয় করিয়া তাহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন দুই জন ডাকাতের লাঠি তাঁর পৃষ্ঠে পড়িল, তখন তিনি আর উপায় নাই দেখিয়া, একটা ডাকাতের হস্ত হইতে তার লাঠিটা কাড়িয়া লইয়াছেন। সেই লাঠির সাহায্যে সাত জনের লাঠি ব্যর্থ করিয়া তিনি পিছনের দিকে হাঁটিয়া হাঁটিয়া আসিতেছেন! তাহাদের একটা লাঠিও আর ঠাকুরের গায়ে লাগিতেছে না; কিন্তু বুঝি ঠাকুর আর পারিয়া উঠিতেছেন না। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হাঁফাইতে হাঁফাইতে তিনি অতি কষ্টে পশ্চাতের দিকে আসিতেছেন।

দেখিয়া আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইবার মত হইল! আমি হুঙ্কার করিয়া বলিলাম—"হয় আমার মৃত্যু, না হয় তোদের মৃত্যু।" এই বলিয়া আট জনের মধ্যস্থলে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম।

ঠাকুর হঠাৎ আমাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, ডাকাতগুলাও চমকাইয়া গেল। আমি তাহা দেখিয়াও গ্রাহ্য না করিয়া বলিলাম—"তোদের যদি বাঁচবার সাধ থাকে, লাঠি ফেলিয়া এক জায়গায় দাঁড়া

হইয়া দাঁড়া।” তিন জন থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। পাঁচ জন আমার সঙ্গে যুঝিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আবার সেই তিন জন আসিয়া দলে যোগদান করিল। বুঝিলাম—এরা দুইনের ফেলা হাড়ির দলের লোক। ঘাটিতে আরও লোক আছে।

যা ভাবিয়াছিলাম, ঠিক তাই হইল। এক জন ছুটিয়া গিয়া সাঙ্কেতিক শব্দ করিল। দেখিতে দেখিতে আরও পাঁচ জন আসিয়া তাদের দলে মিশিয়া আমার উপর লাঠি চালাইতে লাগিল। তখন সেই ঘোর নিশিতে ভয়ঙ্কর স্থানে তেরজনের সঙ্গে আমার শক্তি পরীক্ষা হইতে লাগিল। আনন্দে আমার দেহে যেন শত হস্তীর বল আসিল। সহসা দেখিলাম, ডাকাইতদের মধ্য হইতে এক জন ভীষণ জোয়ান হঠাৎ আসিয়া আমাকে তীব্রবেগে আক্রমণ করিল। তাহার ক্ষমতা দেখিয়া আমি বুঝিলাম, এই ব্যক্তিই দলের সর্দ্দার ফেলা হাড়ি। ফেলা হাড়ি হুগলি জেলার প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল। ইহার সমকক্ষ লাঠিয়াল এদেশে আর কেহ নাই।

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলাম—“সর্দ্দার, অনেক ডাকাতি করিয়াছিস্,—এই মাঠে অনেক মানুষ মারিয়াছিস্,—অনেক অত্যাচার করিয়াছিস্,—অনেক লোমহর্ষণ পাপ করিয়াছিস্, কিন্তু আজ যখন তোর দলের লোক আমার অন্নদাতা পিতার গায়ে হাত দিয়াছে, তখন আর তোর আমার হস্তে কিছুতেই নিস্তার নাই।”

আমার মুখে ফেলা সর্দ্দারের নাম শুনিয়া, ঠাকুরের মুখ শুকাইয়া গেল। আমি তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলাম,—"ঠাকুর! তুমি আমার পশ্চাতে দাঁড়াও। তোমার আর আমার মা-জননীর আশীর্ব্বাদে, আজ আমি সর্দ্দারের নাম পৃথিবী হইতে মুছিয়া দিব। আজ হইতে হুগলি জেলার লোক নির্ভয়ে নিদ্রা যাইবে। আর যদি মরি, মাকে বলিও, তিনি যেন আমার জন্য না কাঁদেন। তাঁর চখের জল পড়িলে আমি মরিলেও শান্তি লাভ করিতে পারিব না।"

প্রায় আড়াই দণ্ড ধরিয়া, আমি তাহাদের সহিত যুঝিতে লাগিলাম। আমার জ্ঞান চৈতন্য যেন কোথায় চলিয়া গেল। আমি কে, কোথায় আমি, কি করিতেছি কিছুই মনে রহিল না। কেবল বোঁ বোঁ লাঠির শব্দ কাণে ঢুকিতে লাগিল। যখন আমার জ্ঞান হইল, তখন দেখি, ফেলা সর্দ্দারের বুকে বসিয়া তার গলা টিপিয়া ধরিয়াছি, তার জিবটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তার দলের চারজন লোকের মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তারা বেহুঁস হইয়া পড়িয়া আছে, ঠাকুর বলিতেছেন,—"কিনু ছেড়ে দে বাবা! ছেড়ে দে! এখনই লোকটা মারা যাবে।"

হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলাম—"আর সব কোথায়?"

ঠাকুর বলিলেন,—"রক্তের স্রোত দেখিয়া লাঠি ফেলিয়া তাহারা সব প্রাণভয়ে পলাইয়াছে।"

চাহিয়া দেখি, রক্তের নদী বহিতেছে। ঠাকুর হাত ধরিয়া তখন ফেলা সর্দ্দারের বুক হইতে আমাকে নামাইয়া লইয়াছেন। আমারও মাথা দিয়া রক্ত ঝরিতেছে।

ঠাকুর ছুটিয়া গিয়া মাঠের পুকুর হইতে জল আনিয়া, তাহাদের মুখে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। আমারও তখন তাহাদের সেই অবস্থা দেখিয়া মনটা কেমন হইয়া গেল। মড়ার কলসী করিয়া জল আনিয়া, আমিও তাহাদের মাথায় ঢালিতে লাগিলাম!

ঠাকুর বলিলেন—"বাবা কিনু! আগে তোমার মাথাটা ধুইয়া ফেল, বড়ই রক্ত ঝরিতেছে!"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"ঠাকুর, উহা রক্ত নয়, আমার মা-জননীর আশীর্ব্বাদ-চিহ্ন, উহা এখন মাথায় থাক্।"

ঠাকুরের সেবা ও শুশ্রূষায় তাহারা শীঘ্রই উঠিয়া বসিল।

ঠাকুর বলিলেন—"বাবা কেন তোরা এমন অধর্ম্মের কাজ করিস্?—সৎপথে থাকিয়া পরিশ্রমের অর্থে তোদের কি পেট ভরে না?"

ঠাকুরের কথা শেষ হইতে না হইতে, তারা আমার দিকে চাহিয়া ছুটিয়া পলাইল। বোধ হয়, ভয় হইল, আবার যদি লাঠি চালাই।

যখন গৃহে আসিলাম, তখন ভোর হইয়া গিয়াছে। মা স্নান করিয়া আসিয়া, বাবা রামচন্দ্রের পূজার উদ্যোগ করিতেছেন।

আমাকে দেখিয়াই মা চীৎকার করিয়া বলিলেন—"কি হয়েছে রে কিনু ?"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম,—"কিছুই হয় নাই মা! এই দেখ না, তোমার আশীর্ব্বাদ-চিহ্ন মস্তকে রহিয়াছে।"

তারপর মা আমূল বৃত্তান্ত শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

কেনারামের কথা শেষ হইতে না হইতে, আমরা তোমাদের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখনও চারি পাঁচ দণ্ড রাত্রি ছিল। রামনয় করযোড়ে গুরুদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাত্মন্! যদি দয়া করিয়া পদধূলি দিলেন, তবে সেবার কি আয়োজন করিব আজ্ঞা করুন।" গুরুদেব বলিলেন, —"এখন কিছুই করিতে হইবে না বাবা! সূর্য্যোদয়ের পর সে ব্যবস্থা হইবে।"

আমরা মুণ্ডেশ্বরী নদীতে স্নান করিতে গেলাম। তোমার পিতাও আমাদের সঙ্গী হইলেন। কেনারামও সঙ্গ ছাড়িল না। স্নান করিয়া প্রত্যাগমন করিতে সূর্য্যোদয় হইল।

গুরুদেব বলিলেন—"অগ্রে তোমার গৃহ-দেবতার পূজা হউক, পরে আমাদের আহারের উদ্যোগ হইবে।" তখন রামনয় তোমাদের বাটীর দেবতা রামচন্দ্র শীলার পূজা করিতে বসিলেন; আমরা একটু দূরে বসিয়া তাহা দেখিতে লাগিলাম।"

"কি অপূর্ব্ব ভক্তি! কি একাগ্রতা! কি মন্ত্রোচ্চারণ!

কি মধুর স্তব-পাঠ! আমরা দেখিলাম, পূজায় বসিয়া তোমার পিতার চৈতন্য ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইল। কুম্ভক ন্যাস, মাতৃকা ন্যাস, ভূতশুদ্ধি—যাক্, সে সব কথা তুমি এখন বুঝিতে পারিবে না; সে সময়ের বিলম্ব আছে।”

তোমার পিতা যখন যোগাসনে বসিয়া “সচন্দনং তুলসীপত্রং নমস্তে বহুরূপায় পরমাত্মনে বিষ্টবে স্বাহা” বলিয়া শালগ্রাম শিলার মস্তকে তুলসীপত্র অর্পণ করিতে লাগিলেন, তখন গুরুদেবের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল! এই ভাবে পূজা করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলাম যে, তোমার পিতা আসন হইতে একহস্ত উর্দ্ধে উঠিয়াছেন।

দিবা দ্বিপ্রহরের সময় তোমার পিতার পূজা সমাপ্ত হইল। পূজার শেষ ঘণ্টাধ্বনি হইবামাত্র, তোমার জননীদেবী আসিয়া—গললগ্নীকৃতবাসে বিগ্রহকে প্রণাম করিলেন। বহুক্ষণ তাঁহার মস্তক ভূমি হইতে উঠিল না। ভক্তির উন্মাদনায় তিনি যেন সংজ্ঞাহারা হইলেন। হায়! হিন্দুর গৃহলক্ষ্মীগণ, দেশের দুর্দ্দিন দেখিয়া তোমরাও অন্তর্হিত হইয়া গেলে! হিন্দুর গৃহ এখন অনাচার ও পাপে পরিপূর্ণ। সে গৃহে এখন আর তোমরা থাকিতে পারিবে কেন মা! তোমরা যে স্থানে গৃহ-দেবতার ভোগ রাঁধিয়া গিয়াছ, সেই স্থান এখন অস্পৃশ্য জিনিষে পূর্ণ! তোমরা কি সে গৃহে তিষ্ঠিতে পার। লক্ষ্মীরূপিণী মা! আর কি তোমরা হিন্দুর

এ গৃহে আসিবে না? তোমরা আসিলে যে, তোমাদের পুণ্যপ্রভাবে, তোমাদের স্বামী-পুত্রেরা পুনরায় হিন্দুর ঘরের ছেলে হইবে! সেদিনের আর কত বিলম্ব মা! আমরা কেবল তোমাদিগকে দেখিতে চাই। তোমরা আবির্ভূতা হইলেই ধর্ম্ম আপনি আসিবে। হিন্দুর হিন্দুত্ব আবার জাগিয়া উঠিবে। আমরা অর্থের আকাঙ্ক্ষা করিতেছি না! আমরা যদি রাজ্যসুখ চাহিতাম, তাহা হইলে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ [illegible]-ঋষিগণের চরণতলে সম্রাটের হেম-মুকুট গড়াগড়ি দিত না! [illegible]। তোমাদের স্থাপিত তুলসী—তোমাদের প্রতিষ্ঠিত অশ্বথ [illegible] গৃহস্থের নিত্যাবশ্যকীয় বৃক্ষগুলি আজ জলাভাবে শুষ্ক হইয়া যাইতেছে! পুণ্যাহ বৈশাখে কেহ আর সেখানে জলধারা দেয় না। তোমাদের প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণী ব্রহ্মডাঙ্গায় পরিণত হইয়াছে। তোমাদের পুত্র-পৌত্রবধূরা বিদেশী সাজে, বিদেশী ভাবে, বিদেশী ছাঁচে কিম্ভূতকিমাকার রূপ ধারণ করিয়াছে! তাহারা আর সে লজ্জাবনত স্নেহ-মমতাপূর্ণ পল্লীবধূ নাই! প্রত্যূষে গৃহদ্বারে গোময় লেপন, সন্ধ্যায় তুলসীমঞ্চে দীপদান, পুত্র-কন্যার পীড়ায় দেব-দেবীর মানস-পূজা, এখন সমস্তই উঠিয়া গিয়াছে। গৃহ-দেবতার [illegible] এখন উৎকলবাসী ব্রাহ্মণের হস্তে ন্যস্ত! দেব-দেবীর ভোগ দেওয়া কাহাকে বলে, এখন গৃহলক্ষ্মীদিগকে বুঝাইয়া দিতে হয়! বিগ্রহসেবার পরিবর্ত্তে সেস্থানে এখন কেবল কর্ত্তার জন্য সীতাভোগ মোহনভোগ শোভা পাইতেছে।

সন্ন্যাসী কিয়ৎক্ষণ চক্ষু মুদিয়া নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—

"তোমার জননী বহুক্ষণ পরে যখন প্রণাম করিয়া উঠিলেন, তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব সতীত্ব-তেজ ফুটিয়া উঠিল। মা আনন্দময়ী ভগবতী বোধে আমি তাঁহাকে মনে মনে বারংবার প্রণাম করিলাম।

তোমার জননী উঠিয়াই স্বামীকে প্রণাম করিলেন। বেশ বহুক্ষণ ধরিয়া! তাহার পর বিষ্ণুপূজার চরণামৃতপূর্ণ তাম্রকুণ্ড হস্তে লইয়া, কেনারামকে ডাকিলেন। সে ছুটিয়া আসিয়া দ্বারে ভূমিষ্ঠ হইয়া একে একে সকলকে প্রণাম করিল! তোমার জননী তাহার হস্তে চরণামৃত ঢালিয়া দিলেন। কেনারাম ভক্তিভরে তাহা পান করিয়া হাতটি সর্ব্বাঙ্গে মাখিল।

এইবার তোমার জননী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সন্ন্যাসী-দের সেবার কিরূপ আয়োজন করিব! আপনি বলিয়াছেন যে, আজ চারিদিন উঁহারা অভুক্ত!"

কথা শেষ হইতে না হইতে গুরুদেব উঠিয়া গিয়া বলিলেন,—"কেন মা চঞ্চলা হইতেছ? কমলালয়ে আসিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা কি কাহারও থাকে!"

তোমার জননী গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"বাবা! যদি

দয়া করিয়া পদধূলি দিয়াছেন, তবে কিরূপভাবে সেবার আয়োজন করিব, তাহা দয়া করিয়া আদেশ করুন।"

গুরুদেব বলিলেন—"মা অগ্রে তোমার রামচন্দ্রশীলাকে দর্শন করিয়া নয়ন তৃপ্ত করি, তারপর ভোজনের বন্দোবস্ত হইবে।" গুরুদেব তোমাদের দেবগৃহে প্রবেশ করিয়া, শীলাকে দর্শন করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন! আমাকেও দর্শনের আদেশ করিলেন! কি দেখিলাম, তাহা আর বলিব না! শরীর যেন পবিত্র হইয়া গেল! গুরুদেব যাহা দেখিলেন, আমি বুঝি তাহা দেখিতে পাইলাম না! তবু আমার ভাগ্যে যাহা দর্শন ঘটিল, জীবনে তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব না।"

গুরুদেব তোমার পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"বাবা রামময়! এ যে তোমার সজীব শীলা! ধন্য তুমি, সার্থক জন্ম তোমার যে, তুমি ইহার সেবা করিয়া ধন্য হইতেছ!"

তোমার জননী পরিষ্কার অন্ন, নানাবিধ ব্যঞ্জন এবং পায়স-পিষ্টকাদি ভোগ আনিয়া দিলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া, করযোড়ে ভক্তি-গদগদ-চিত্তে তোমার পিতা, রামচন্দ্রশীলাকে তাহা নিবেদন করিয়া দিলেন।

ভোগ সমাধা হইবার পর আবার বহুক্ষণ ধরিয়া সকলে প্রণাম করিলেন। এবার দেখিলাম, গুরুদেবের চক্ষে জলধারা বহিতেছে।

তোমার জনকজননী করযোড়ে গুরুদেবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তোমার জন্য কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন।

তোমার পিতার সেই শুভ্র যজ্ঞোপবীতধারী, স্রক্‌ ও চন্দন-বিভূষিত দেহ, আজানুলম্বিত বাহু, সাত্ত্বিক ভাবের পবিত্র জ্যোতির্মণ্ডিত মুখমণ্ডল, এখনও যেন আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি! তোমার জনকজননী হরগৌরী মূর্ত্তিতে যেন সে সময়ে শোভা পাইয়াছিলেন।

গুরুদেব বলিলেন,—"বাবা! আমাকে একটি সামান্য ফল দিলেই তোমাদের অতিথি সেবা সম্পন্ন হইবে! চারিদিনের উপবাসী অতিথির একটি ফলই যথেষ্ট।" এই কথা শুনিয়া তোমার জনকের মুখ দিয়া আর বাক্য নিঃসৃত হইল না—গুরুদেবের মুখের দিকে অনিমেষনয়নে তিনি চাহিয়া রহিলেন।

এইবার তোমার জনক বোধ হয় বুঝিতে পারিলেন, যাঁহাকে তিনি এতক্ষণ সন্ন্যাসী বলিয়া ভাবিতেছিলেন, আমার সেই গুরুদেব সাধারণ সন্ন্যাসী নহেন।

তারপর সে অনেক কথা, বলিবার আর সময় নাই! রজনী প্রভাত হইয়া আসিতেছে। এদিকে বৃদ্ধার দেহও আর ভস্মীভূত হইবার বিলম্ব নাই! সে দিন তোমার পিতা গুরুদেবকে আর ছাড়িলেন না! তাঁহারও সেদিন তোমাদের আবাস ত্যাগ করিবার ইচ্ছা ছিল না! সেইদিনই গুরুদেব তোমার জনকজননীকে দীক্ষা দান করিলেন। দীক্ষিত হইবার পর, সংসার ত্যাগ করিয়া তোমার পিতার গুরুদেবের সঙ্গী হইবার প্রবল বাসনা জন্মিল;

কিন্তু গুরুদেব নিষেধ করিয়া বলিলেন—"বাবা! ইহজন্মটা অপেক্ষা কর! সে সময়ের একটু বিলম্ব আছে, বিশেষতঃ তুমি ব্যতীত তোমার বংশের আর কাহারও দ্বারা রামচন্দ্রশীলার পূজা হইবে না।

"বাবা! এখন জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কি সেই বংশের সন্তান? যদি পূর্ব্বপুরুষগণের রীতি-নীতি বজায় রাখিতে, তবে তোমরা আজ এরূপ অধঃপতিত হইবে কেন? তোমরা বিদেশী শিক্ষা-প্রভাবে এখন মনে করিতেছ, হিন্দুর তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা কেবল 'নুড়ি ও গাছ-পাথরের পূজা'—এগুলা অশিক্ষিত হিন্দুর কার্য্য! তোমরা এখন ভাব যে, হিন্দুর বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, সংহিতা, দর্শন সবই কুসংস্কারপূর্ণ। পাশ্চাত্য শিক্ষায় তোমরা এখন এমন বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়াছ যে, এই সকল ধর্ম্মগ্রন্থগুলি আদৌ গ্রহণ করিতে চাও না। "গুরু", "শিষ্য" এই সকল কথা শুনিলে নাসিকা কুঞ্চিত কর। তোমাদের মতে গুরু আবার কে? দীক্ষা আবার কি প্রকার? তোমাদের বিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বল বিজ্ঞানালোকোদ্ভাসিত নয়নযুগল অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কারপূর্ণ বেদবিধান দেখিতে ইচ্ছা করে না। তোমরা ভাব যে, তোমাদের পিতৃপুরুষগণ মূর্খ, অশিক্ষিত ও বর্ব্বর ছিল। যাহারা নগ্নপদে নগ্নদেহে শিখা ও উত্তরীয় লইয়া, কৃষিকার্য্য বা যজন দ্বারা দিনপাত করিয়া গিয়াছে, তাহারা আবার কৃতবিদ্য কিসে?

যাহারা ভ্রান্ত, সংকীর্ণ, কুসংস্কারপূর্ণ, শাস্ত্রাদেশে অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সংসার পালন করিত ; তাহাদের আদর্শ কি গ্রহণ-যোগ্য ?

হায় ! অধঃপতিত হিন্দু-সন্তান, তোমরা এখন কাচ ও কাঞ্চনকে সমমূল্য জ্ঞান করিতেছ। বিজাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া তোমাদের ধর্ম্ম গেল, কর্ম্ম গেল, ইহকাল গেল, পরকাল গেল— পূর্ব্বপুরুষদিগের পবিত্র আর্য্য-নাম পর্য্যন্ত লোপ পাইতে চলিল। তোমরা আবার কত দিনে তোমাদের পিতৃপিতামহের মত অশিক্ষিত কুসংস্কারাপন্ন হইবে ? কবে তোমরা হারাণ ধর্ম্ম আবার ফিরিয়া পাইবে ?

হিন্দুর এখন পানভোজনই সর্ব্বস্ব হইয়াছে। হিন্দু-সন্তান এখন মানুষ নয়, শিশ্নোদর-পরায়ণ বিকৃত দানবের মত ভারত-শ্মশানকে আরও ভয়াবহ করিয়া তুলিতেছে। হিন্দু-সন্তান এখন সত্য সত্যই ভারত-শ্মশানে অস্থিচর্ম্মসার প্রেতমূর্ত্তিতে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে ! কবে যে উপযুক্ত নেতা আবার ভারতভূমে অবতীর্ণ হইয়া, ভারতের বক্ষঃস্থলে প্রেত-তর্পণ করিয়া ইহা-দিগকে মুক্ত করিবেন, তাহা আমার অন্তর্য্যামী গুরুদেবই বলিতে পারেন। ভারতভূমে এখন আর শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রয়োজন নাই ! এখন দীনবেশী মূর্খ ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হইয়াছে ! এখন আর বিষয়, বৈভব, ধন ও যশপ্রার্থী-অধ্যাপকের আবশ্যকতা

নাই, এখন নির্লোভ ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের জন্য কাতর প্রাণে সকলেরই প্রার্থনা করা উচিত। এখন পাশ্চাত্য জ্ঞানদীপ্ত প্রতারক ভণ্ড,—হিন্দুনামধারী সৌখীন নেতার আর প্রয়োজন নাই, এখন চাই—সরল অন্ধ-বিশ্বাসী অতীতের সেই নিষ্ঠাবান হিন্দু সন্তান! পরের অনুকরণে দেহ সাজাইয়া, যাহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাদের সেই হিন্দুত্ব বিসর্জ্জন দিয়া নগ্নপদ নগ্নদেহ হিন্দুর সেই চিরন্তন সহজ-সৌন্দর্য্যকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। বিদেশী শিক্ষা বর্জ্জন করিয়া হিন্দুর প্রাচীন শিক্ষায় সংসারে শান্তি-দীপ জ্বালিতে হইবে। কোট-পেণ্টুলেনধারী বাবু না হইয়া এখন নগ্নদেহ মলিন বসন-পরিহিত পুরাতন হিন্দু হইতে হইবে। বিদেশীর অনুকরণে গলাবাজী করিয়া হুহুঙ্কারের অভিনয় করিলে ভারতের সুখের দিন ফিরিয়া আসিবে না ; ভারতের যে উপায়ে উন্নতি হইয়াছিল, এখন সেইরূপ প্রাণহীনবৎ নিশ্চলভাবে যোগাসনে বসিতে হইবে। এখন হিন্দু হাসে বটে, কিন্তু সেটা হাসি নয়। সে হাসি হৃদয়ের অশান্তি ও দুঃখের আবরণ মাত্র। যোগাসনে বসিয়া প্রেমানন্দে মৃদু মৃদু হাসিতে হইবে। হিন্দুর ঐ হাসি—কেবল দুঃখ দৈন্য, রোগ জ্বালা বিলাস ব্যাধিজনিত অভাবের বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা নিবারণার্থ এ হাসি হৃদয়ের আনন্দের অভিব্যক্তি নয়! সেই প্রাচীনকালের আনন্দের হাসি ভারতশ্মশানে এখন আর নাই।

এই ভারতবাসী একদিন পুণ্য-প্রভাবে মৃতের রাজ্য হইতে প্রাণকে ফিরাইয়া আনিয়াছে,—এই ভারতবাসীর পুণ্য-প্রভাবে মৃদুমন্দ সমীরণ নবোল্লাসে স্পন্দিত হইয়াছে। যাহারা ভারতবাসীর মত বহুমূল্য রত্ন এখনও পায় নাই, তাহারা দুর্ভাগ্য বটে ; কিন্তু আমাদের মত হতভাগ্য আর কাহারা ? আমরা পূর্ব্ব-পুরুষের পৈতৃক সম্পত্তি, পৈতৃক ধন-রত্ন হেলায় হারাইতেছি! গুপ্তগৃহে কি আছে, তাহা কেহ দেখিবারও চেষ্টা করিতেছে না। পরের চাকচিক্য বিলাস-ব্যাধিতেই তাহারা জর্জ্জরিত হইয়াছে! দেখিবার শক্তি তাহাদের নাই।"

সন্ন্যাসীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিরোহীর পূর্ব্ব গগন পরিষ্কার হইয়া আসিল। এদিকে বৃদ্ধার অস্থিপঞ্জরগুলিও ভস্মাকারে পরিণত হইল।

সন্ন্যাসী ভক্তের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"বাবা! আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে। এখন আমি চলিলাম। আমার শেষ দুটী কথা আছে। আজ হৃদয়ের আবেগে অনেক কথা তোমায় বলিলাম—তুমি বেশ জানিও, আবার এই ভারতে ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিবে, আবার ব্রাহ্মণ সেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে, সংসার-চিন্তা দূরে ফেলিয়া, দিবানিশি অর্থকরী-বিদ্যার আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া, আবার হিন্দু সেই পরমার্থদায়িনী চরমশান্তিবিধায়িনী মহাবিদ্যার আরাধনা আরম্ভ করিবে—

অবিদ্যার শত সহস্র প্রলোভন তখন তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিবে না।

আবার ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়া ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ধর্ম্ম জাগরিত করিবে। আবার সেই সরল, অকপট শূদ্র আসিয়া বর্ণত্রয়ের সেবায় নিযুক্ত হইয়া আপনার আত্মোন্নতি করিবে। আবার গ্রামে গ্রামে দয়ালু, নিষ্ঠাবান, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী নিরহঙ্কারী ব্রাহ্মণ চতুষ্পাঠী খুলিয়া সমাজের হিতকল্পে অধ্যাপকের অধিকার লাভ করিবে। তাহাদের তখন আর কোন স্পৃহা থাকিবে না—কামনা থাকিবে না—বাসনা থাকিবে না—কোনও প্রকার লক্ষ্য থাকিবে না—থাকিবে কেবল সমাজের ইষ্ট চিন্তা—দয়ালু ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্ত্তা ইংরাজরাজের মঙ্গলানুষ্ঠানে সততই নিযুক্ত থাকিবে। ব্রাহ্মণ চিরকালই রাজার দক্ষিণ হস্ত—সেই ব্রাহ্মণই আবার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া বিজাতীয় শাসনকর্ত্তার নিকট খ্যাতি ও প্রভুত্ব লাভ করিবে। আর একটি কথা, এই অসভ্য গৃহপালিতা বালিকা ঝামেরিয়ার ভার তোমার উপর দিয়া যাইতেছি! সংসারে ঝামেরিয়ার অনেক কার্য্য অবশিষ্ট আছে। বৃদ্ধার কুটীরের পূর্ব্বদিকে পর্ব্বতগাত্রে একখানি বৃহৎ লোহিত বর্ণের প্রস্তর আছে। সেই প্রস্তরখানি অপসারিত করিয়া মৃত্তিকা নিম্নে একটী লৌহ-পেটিকা দেখিতে পাইবে। তন্মধ্যে যে কাগজ পত্র আছে, তাহা দেখিয়া ইহার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিও।”

সন্ন্যাসী একবার ঊর্দ্ধে আকাশের পানে চাহিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন।

ভক্ত রোদন করিতে করিতে বলিলেন—"গুরুদেব! সত্যই কি আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিলেন! বলুন, কবে আবার শ্রীচরণ-দর্শনে পুণ্য অর্জ্জন করিব!"

সন্ন্যাসী ভক্তের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সে স্পর্শে ভক্ত যেন নবজীবন লাভ করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আবার একবার সাক্ষাৎ হইবে। তুমি সংসারে ফিরিয়া যাও। মা তোমার জন্য ভাবিতেছেন, সতীর নয়নাশ্রুর বিরাম নাই; কিন্তু বাবা! বিস্মৃত হইও না যে তোমরা হিন্দুর সন্তান; ভুলিয়া যাইও না যে, তোমরা তেত্রিশ কোটী দেবতার সেবক। মনে রাখিও, সকল কার্য্যেই তোমাদের ধর্ম্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ! প্রভাত হইতে সূর্য্যাস্ত—আবার সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত হিন্দুর প্রত্যেক কার্য্যই ধর্ম্মের সহিত গ্রথিত। আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে ও মৃত্যুতে ধর্ম্মকে দূরে রাখিয়া হিন্দুর কোন কার্য্যই হইতে পারে না। সূর্য্যোদয়ের বিলম্ব নাই। গুরুদেবের আহ্বান পৌঁছিয়াছে। আর বিলম্ব করিবার শক্তি নাই।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী সহসা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। বোধ হইল যেন কঠিন বক্ষ পর্ব্বতরাশি তাঁহাকে হঠাৎ গ্রাস করিল। চক্ষের নিমেষে সন্ন্যাসীকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না।

ভক্ত তন্ময় হইয়া সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন। বাক্য থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু পর্ব্বত-কন্দরে তখনও তাহার প্রতিধ্বনি হইতেছে—মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই ব্যক্তি বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে উত্থান করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ বর্ণিত ভক্ত, যিনি বিরোহীর শ্মশানে বসিয়া সন্ন্যাসীর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, তিনি যে ভবরাম, আর সন্ন্যাসী যে সেই আগ্রার পাগল, তাহা বোধ হয় পাঠকগণকে আর বলিয়া দিতে হইবে না। ভবরাম সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষিত হইয়া ধন্য হইয়াছেন।

ভবরাম গুরুর অদর্শনজনিত বেদনায় শ্মশানে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ রোদনের পর মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—গুরুদেব ঝামেরিয়ার ভার আমার উপর প্রদান করিলেন কেন? পুনরায় ভাবিলেন "ঝামেরিয়ার অনেক কার্য্য অবশিষ্ট আছে। মৃত্তিকা নিম্নে লৌহপেটিকার মধ্যে কাগজপত্র দেখিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।" জানি না, গুরুদেব কি কার্য্যের ভার আমার উপর অর্পণ করিয়া গেলেন! ইহা কি তাঁহার ছলনা? আমাকে কি তিনি এই কঠিন কার্য্যের ভার দিয়া পরীক্ষা করিবেন? এই প্রকার কত কি চিন্তা ভবরামের মন অধিকার করিল।

এই ভীষণ স্থানে ঝামেরিয়াকে লইয়া চিন্তা করিলে ফলোদয়

হইবে না বুঝিয়া, ভবরাম তাহাকে উঠাইয়া ঝরণার জলে স্নানাদি করাইল। বৃদ্ধা জননী ব্যতীত ঝামেরিয়ার ত্রিসংসারে আর কেহ ছিল না! সুতরাং তাহার মনের অবস্থা কিরূপ, তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। ঝামেরিয়ার নয়নদ্বয় ক্রমাগত ক্রন্দনে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাহার ক্রন্দনের বিরাম নাই। বৃদ্ধা জননীর বক্ষে মস্তক রাখিয়া, ঝামেরিয়া নিদ্রা যাইত, একমাত্র জননীই তাহার আশ্রয়স্থল ছিল। এখন ঝামেরিয়া কোথায় দাঁড়াইবে, কোথায় যাইবে? ঝামেরিয়া সপ্তদশবর্ষীয়া হইলেও পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা অপেক্ষা অধিক সংসারের অভিজ্ঞতা তাহার নাই। ঝামেরিয়া অপরের গৃহে কিছুদিন কার্য্য করিয়াছিল বটে; কিন্তু একদিন একটা লোক ঝামেরিয়াকে কু-অভিসন্ধিতে কি কথা বলিয়াছিল। অরণ্য কুটীরে-প্রতিপালিত সরলা ঝামেরিয়া—সে কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া রজনী দ্বিপ্রহরের সময় ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধা জননীর বক্ষে মস্তক রাখিয়া অজস্র রোদন করিয়াছিল। সেই হইতে বৃদ্ধা সরলতা ও পবিত্রতার আধার ঝামেরিয়াকে মুহূর্ত্তের জন্যও কোথাও যাইতে দিত না। বৃদ্ধা যখন কাষ্ঠাদি আহরণার্থ কুটীর ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে যাইত, ঝামেরিয়াও তাহার সঙ্গিনী হইত। ঝামেরিয়া জানিত, জগতে তাহার একমাত্র অবলম্বন সেই বৃদ্ধা জননী—আর তাহাদের ক্ষুদ্র কুটীরখানি! বিরোহীর প্রত্যেক পর্ব্বত ও অরণ্য তাহার নিকট পরিচিত ছিল।

সে কুরঙ্গিণীর ন্যায় প্রকৃতির এই উলঙ্গ প্রদেশে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইত।

ভবরাম ঝামেরিয়াকে যে সব প্রশ্ন করিতে লাগিল, তাহার একটিরও সে উত্তর দিতে পারিল না। বোধ হয় তাহার এক বর্ণও সে বুঝিল না?

ভবরাম ঝামেরিয়াকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি এখন কোথায় যাইবে? আমার সঙ্গে যাইবে কি? আমার স্ত্রী তোমাকে দেখিলে কত আহ্লাদ করিবে, কত ভালবাসিবে।" ঝামেরিয়া জলভরা চক্ষু দুটি লইয়া ভবরামের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার কাতর দৃষ্টি যেন বলিতেছিল—"আমাদের কুটীর ও বিরোহীর অরণ্য পর্ব্বত ছাড়া আর কি কোথাও কোন স্বতন্ত্র স্থান আছে না কি? বাবুর স্ত্রী আমাদের রুইয়া ছাগলের মত কোন জিনিষ নাকি? আহা! রুইয়া আমাকে কতই ভালবাসে! কয়দিন তাহাকে আদর করি নাই! সে আমাকে না দেখিয়া কতই চীৎকার করিতেছে।" ঝামেরিয়ার জলভরা চক্ষু দুটি হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। ভবরাম ঝামেরিয়াকে লইয়া বড়ই বিপন্ন হইল। আহা! সে যে সংসারের কিছুই জানে না! বিরোহী পাহাড়ের মৃগশিশুগুলিরও আত্মরক্ষার চেষ্টা আছে, তাহারাও অরণ্যের ভিতর আত্মগোপন করিতে জানে, কিন্তু ঝামেরিয়া তাহাদের অপেক্ষাও সংসারে অনভিজ্ঞা! ঝামেরিয়াকে ক্ষুধার সময় বুঝা না

খাওয়াইলে, সে কোনদিন খাইত না! ভবরাম ভাবিল, ঝামেরিয়ার মতামত গ্রহণ বা তাহাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা অরণ্যে রোদন মাত্র।

ভবরাম সিক্তবসনে ঝামেরিয়ার হস্ত ধারণ করিয়া, তাহাকে বৃদ্ধার কুটীরে আনয়ন করিল। প্রথমতঃ বন্যফল সংগ্রহ করিয়া ঝামেরিয়াকে বহুকষ্টে কিঞ্চিৎ আহার করাইল। কুটীর পার্শ্বে বৃক্ষতলে ঝামেরিয়াকে শয়ন করিতে বারবার অনুরোধ করিল। আজ সায়াহ্নিককাল বৃদ্ধাকে লইয়া ঝামেরিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াছে—মুহূর্ত্তের জন্যও সে চক্ষু মুদ্রিত করে নাই। শোকে, দুঃখে, চিন্তা, আশঙ্কা ও রাত্রি জাগরণের অবসাদে ঝামেরিয়া শয়ন করিবামাত্র বৃক্ষতলে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমন্ত ঝামেরিয়ার মুখখানি যেন আমাদের প্রাচীন ভারতের ঋষিবালিকাদের মত! কি সুন্দর সরলতাপূর্ণ মুখ! লোভ, অহঙ্কার, কুটীলতা, হিংসা, দ্বেষ, চাঞ্চল্য, ক্রোধ, প্রভৃতির চিহ্ন-মাত্রও সে মুখখানিতে নাই! তাহার বর্ণ শ্যামবর্ণ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুগোল। রুক্ষ অযত্নে-রক্ষিত লম্বিত কেশগুলি স্নিগ্ধ সমীরণে ধূলার উপরে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে। যেন প্রকৃতি সুন্দরী তাঁহার লালিতা-কন্যার সিক্তকেশগুলি স্নিগ্ধ কোমল হস্তে স্পর্শ করিয়া অতি আদরে শুষ্ক করিয়া দিতেছেন! জননী ব্যতীত এরূপ যত্ন করিবার প্রবৃত্তি আর কাহার আছে? অহরহ শীতল

ব্যজনে প্রকৃতি জননী নিদ্রিতা কন্যাকে আরও গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত করিতেছেন।

ভবরাম ঝামেরিয়াকে এই অবস্থায় শায়িতা ও নিদ্রিতা দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। গুরুদেব! একি গুরুভার আমার উপর অর্পণ করিলেন। প্রভো! এই সরলা, সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা ঝামেরিয়াকে লইয়া আমি কোথায় যাইব?

আহা! মা আমার শ্যামাঙ্গিনী, আলুলায়িতকুন্তলা, দিগ্বসনার ন্যায়, ধরণীর বুকে শ্যামাঞ্চল পাতিয়া শয়ন করিয়া আছেন! জগদ্ধাত্রী প্রতিমার ন্যায় সুগোল—কোমল মায়ের হাত দুইখানি,—করালবদনার ন্যায় লম্বিত কেশরাশি! লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর ন্যায় সুন্দর হস্ত-পদের কোমল অঙ্গুলিগুলি! দেবীর মতই স্বচ্ছ, নির্ম্মল, আপনার ভেদজ্ঞানহীন হৃদয়খানি! মাগো! আজ কি মূর্ত্তিই আমাকে দেখাইলি মা! ভবরাম মস্তক অবনত করিয়া বারংবার কাহার উদ্দেশে প্রণাম করিল। তাহার চক্ষে অজস্র দরবিগলিত ধারা! ধারার পর ধারা আসিয়া ভবরামের বক্ষ ভাসাইয়া দিল। ভবরাম করযোড়ে বলিতে লাগিল—"মাগো! তুই উপায় বলিয়া দে মা! ঝামেরিয়াকে কোথায় লইয়া যাইব?"

গুরুর আদেশ ভবরামের স্মরণ হইল। প্রকৃতিস্থ হইয়া ভবরাম বৃদ্ধার কুটীরে প্রবেশ করিয়া প্রস্তরের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বদিকে পাষাণ গাত্রে একস্থানে স্তূপাকার শুষ্ক কাষ্ঠ

সুসজ্জিত ছিল! কাষ্ঠরাশি অপসারিত করিবার সময় মনে হইল প্রস্তরখণ্ডকে গোপনে আবৃত রাখিবার জন্যই বৃদ্ধা এই স্থানে কাষ্ঠগুলি সুসজ্জিত করিয়া রাখিত।

বহুক্ষণ চেষ্টা করিবার পর ভবরাম অতি কষ্টে প্রস্তর-খণ্ডকে দূরে সরাইতে সমর্থ হইল। একটি গহ্বর দৃষ্ট হইল। গহ্বরে বহু অনুসন্ধানের পর একটি লৌহপেটিকা চক্ষে পড়িল। ভবরাম অতি কষ্টে লৌহপেটিকা উত্তোলন করিয়া তাহা ভগ্ন করিলেন। তন্মধ্যে রাশি রাশি কাগজপত্র। সে সমস্ত কাগজপত্র বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। উহা পাঠ করিয়া শুনাইতে গেলে, পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে পারে। আমরা উহার সার মর্ম্ম পর পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিতেছি। পাঠক! ধৈর্য্য সংবরণ করুন—উহা পাঠ করিলে বাস্তবিকই বিস্ময়ান্বিত হইবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সীতাপুর একখানি গণ্ডগ্রাম। এই গ্রামে রামসুন্দর চট্টোপাধ্যায় নামক একঘর মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাস করিতেন। তিনি একজন পরম হিন্দু এবং ধার্ম্মিক ছিলেন। পূজা এবং সন্ধ্যাহ্নিকেই তাঁহার অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইত। ব্রাহ্মণের বিংশতি বিঘা নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর এবং কিছু জমার জমিও ছিল তাহাতেই তাঁহার সুখ-স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। হিন্দুর বার মাসে তের পার্ব্বণ কিছুই তাঁহার গৃহে বাদ যাইত না। তখন জুতা, জামা, ছাতা ইত্যাদির প্রচলন ছিল না—বর্ত্তমানের ন্যায় বিলাসিতা-স্রোত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে প্রবেশ করে নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণকে একটি কপর্দ্দকও বৃথা ব্যয় করিতে হইত না। পরিবারের মধ্যে তাঁহার স্ত্রী, দুইটি লাঙ্গলবাহী বলদ, তিনটি দুগ্ধবতী গাভী ও ভৃত্য রামদুর্ল্লভ ডুলে।

ব্রাহ্মণ চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে শয্যাত্যাগ করিয়া শৌচাদি ক্রিয়া সমাপন করিতেন। বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া একখানি রক্ষার কাপড় পরিধান করিতেন। তারপর সাজি হস্তে

গৃহদেবতা জনার্দ্দনশিলার জন্ত পুষ্পচয়নে বহির্গত হইতেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই পুষ্পচয়ন সমাধা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া গামছাখানি স্কন্ধে ফেলিয়া প্রাতঃস্নানে বহির্গত হইতেন। স্নান করিয়া আসিয়াই জনার্দ্দনের ঘরে প্রবেশ করিতেন। দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে তাঁহার পূজা ও সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ হইত না। তারপর সহধর্ম্মিণী ভোগ আনিয়া দিতেন, ভোগাদির পর উভয়ে প্রসাদ পাইতেন। মৎস্য বা মাংস ব্রাহ্মণের গৃহে কখনও প্রবেশ করিতে পাইত না। আতব অন্ন, নিরামিষ ব্যঞ্জন, গৃহজাত-দুগ্ধের বিশুদ্ধ গব্যঘৃত ও দুগ্ধে জনার্দ্দনের ভোগ হইত। ঠাকুরের নিবেদিত দ্রব্য ব্যতীত ব্রাহ্মণ-দম্পতি কোনদিন কোন জিনিস আহার করিতেন না। আহারাদির পর ব্রাহ্মণ শাস্ত্র-গ্রন্থাদি লইয়া একটু বসিতেন। অপরাহ্নে চাষবাসের তত্ত্বাবধানের জন্য একবার ভগবানের নাম গান করিতে করিতে ক্ষেত্রে গমন করিতেন। অল্পক্ষণ রামদুর্লভের সঙ্গে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিতেন। পুনরায় সন্ধ্যা-স্নান করিয়া জনার্দ্দনের গৃহে প্রবেশ করিতেন। সন্ধ্যারতি ও আহ্নিকাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে কোন কোন দিন রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যাইত। তারপর গৃহিণীর সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করিতে করিতে নিদ্রা যাইতেন। সাত আট দণ্ডের অধিক ব্রাহ্মণ-দম্পতি কখন নিদ্রা যাইতেন না। তখন ডাক্তারি চিকিৎসার

প্রচলন ছিল না এবং দম্পতি-যুগল কথনও জীবনে ঔষধ সেবন
করেন নাই। ব্রাহ্মণ, জীবনের মধ্যে একবার তুলসী পত্রের রস
ও ব্রাহ্মণী একবার বিল্ব পত্রের রস ঔষধরূপে সেবন করিয়া-
ছিলেন। ব্রাহ্মণের তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় দেহখানি দেখিলেই তাঁহার
অটুট স্বাস্থ্যের পরিচয় পাওয়া যাইত। চাষবাসের জন্য ব্রাহ্মণ
কখন চিন্তিত হইতেন না। তিনি বলিতেন, জনার্দ্দনের ভোগের
ব্যবস্থা উনি নিজেই করিবেন। ব্রাহ্মণের এই বিশ্বাসে জনার্দ্দন
নিজ হস্তে কৃষিকার্য্য না করিলেও রামদুর্লভই সমস্ত সম্পন্ন
করিত। ভগবদ্‌চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তাই ব্রাহ্মণের হৃদয়ে
কখন স্থান পাইত না। পৌষ মাঘ মাসে রামদুর্লভ একা শত
রামদুর্লভের বল ধারণ করিত। এ সময় তাহার আহার নিদ্রা
[illegible]ঞা থাকিত না, দিবাভাগে কাষ্ঠের তক্তার উপর ধান্য আ
[illegible]ত্রে বিচালীগুলি গুছাইয়া ফেলিত। তার পর তু
[illegible]ই স্তুপাকার খড়ের উপরেই স্বহস্তে প্রস্তুত এক
[illegible]মছা পাতিয়া ঘুমাইয়া লইত। এইরূপে ধান-ঝা
[illegible]লে, সরু ধান্যগুলি জনার্দ্দনের ভোগের জন্য
[illegible]রিত। তারপর অতিথি, লক্ষ্মীপূজা, স্নান
[illegible]গুলি পৃথক পৃথক গোলায় রাখিয়া দিত।
[illegible]হ্মণীর প্রসাদ যে দিন না পাইত, সে দিন
[illegible]রিত না। জনার্দ্দনের ভোগের অন্ন আনিয়া

বিড় বিড় করিয়া বলিত। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী কাছে বসিয়া তাহাকে নানাপ্রকারে শান্ত না করিলে রামদুর্লভ মুখে অন্ন তুলিত না।

ব্রাহ্মণ-দম্পতির সন্তানাদির আশা ছিল না, কিন্তু অনেক বয়সে জনার্দ্দন মুখ তুলিয়া চাহিলেন। ব্রাহ্মণের একটী সন্তান হইল। রামসুন্দরের স্ত্রীর আর আনন্দের সীমা নাই। 'আট কড়াইয়ে'র দিনে রামদুর্লভ পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। রামসুন্দর চট্টোপাধ্যায় সন্তানের নাম রাখিলেন জনার্দ্দন।

পাঁচ বৎসর পাঁচ মাসে শুভদিনে জনার্দ্দনের হাতে-খড়ি হইল। ব্রাহ্মণ সেদিন খুব ঘটা করিয়া জনার্দ্দনের ভোগ দিয়া অনেক দীন-
ক যত্ন করিয়া ভোজন করাইলেন। দিবাভাগে সে দিন
পতি আর জল গ্রহণ করিলেন না।

:সর বয়স পর্য্যন্ত জনার্দ্দন গুরু-মহাশয়ের পাঠশালায়
রিল। তখন ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হইয়াছে।
ত এক মাইল দূরে বামুন-হাট নামক একখানি
াই গ্রামে ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়া একজন
ন। তিনি রামসুন্দরকে বড়ই ভক্তি করিতেন।
পাধ্যায় কলিকাতায় দালালী ব্যবসায় করিতেন
। বেশ দুপয়সা সঞ্চয়ও করিয়াছেন। বন্দ্যো-
দিন প্রস্তাব করিলেন—"রামসুন্দর দাদা!

জনার্দ্দনকে আমার সঙ্গে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিন। ছেলেটি যেমন সুশ্রী, তেমনই বুদ্ধিমান। ইংরাজী না শিখিলে আজকাল পয়সা হয় না। এই দেখ না, আমি যদি ইংরাজী জানিতাম, তবে সাহেব-সুবাকে হাতের মুঠায় রাখিতাম। জনার্দ্দনকে আমি কলিকাতায় রাখিয়া ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিব।”

ইংরাজী শিক্ষার নামে রামসুন্দর চমকাইয়া উঠিলেন; কিন্তু কিছু প্রকাশ না করিয়া বলিলেন—“আচ্ছা ভাই, গৃহিণীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তোমাকে পরে বলিব।” কিন্তু গৃহিণীর সঙ্গে তাঁহার পরামর্শ করিতে হইল না। ভৈরব-গৃহিণী আসিয়া নানা যুক্তি-তর্কে চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণীকে রাজী করিয়া ফেলিলেন।

ভৈরব-গৃহিণী বলিলেন—“এই দেখনা ভাই, উনি যদি চাষ লইয়া ঘরে বসিয়া থাকিতেন, তবে কি সোণাদানার মুখ দেখিতে পাইতাম। পাড়াগেঁয়ে হইয়া চাষবাস করিয়াই জীবন যাইত। একটু ইংরাজী শিখিলে জনার্দ্দন কত টাকা উপায় করিতে পারিবে, কলিকাতায় কত বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ হইবে, সাহেবের চাকুরী করিয়া দশ জনের একজন হইবে ইত্যাদি।”

পুত্রের ভাবী সুখেচ্ছা কোন্ জননী না কামনা করেন? তিনি সম্মত হইয়া পুত্রকে ভৈরব-দম্পতির হস্তে সমর্পণ করিলেন। সীতাপুরের বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পরম ধার্ম্মিক এবং নিষ্ঠাবান্ হিন্দু রামসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র জনার্দ্দন চট্টোপাধ্যায় পিতৃপিতামহের নামে

কলঙ্ক লেপন করিয়া, কলিকাতায় ইংরাজী শিখিতে গেল। পুত্রকে বিদায় দিয়া রামসুন্দর জনার্দ্দনের ঘরে প্রবেশ করিয়া আকুল প্রাণে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রন্দন করিতে করিতে তিনি বলিতে লাগিলেন—"জানি না প্রভো! তোমার কি ইচ্ছা! বংশের অবনতির পথ বুঝি আমিই প্রশস্ত করিয়া দিলাম।" বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ বসিয়া পড়িল। সমস্ত দিন ব্রাহ্মণ আর জলস্পর্শ করিল না।

ভৈরব ও ভৈরব-গৃহিণীর এই কার্য্যের মধ্যে "নিঃস্বার্থতা" কিছুমাত্র ছিল না। তাঁহারা বলিষ্ঠ ও সুস্থ জনার্দ্দনের রূপ, গুণ ও বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া, একমাত্র কন্যা বিজলীর সঙ্গে জনার্দ্দনের বিবাহ দিবার সঙ্কল্প মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন। ভৈরবের অন্য সন্তানাদি না থাকায়, একমাত্র কন্যা বিজলীই তাহাদের জীবনসর্ব্বস্ব ছিল। অর্থের সচ্ছলতা হেতু এই বালিকা পিতামাতার নিকট যৎপরোনাস্তি সুখে পালিতা হইয়াছিল। সাহেব-সুবার সঙ্গে ঘুরিয়া ও জুড়ীগাড়ীওয়ালা অৰ্দ্ধ-ক্রিশ্চান বড়লোকগণের সঙ্গে মিশিয়া, পল্লীগ্রামবাসী ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় ভৈরববাবু হইয়াছিলেন। সংসর্গদোষে ধীরে ধীরে ভৈরববাবুর পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি প্রায়ই গৃহিণীকে আসিয়া বলিতেন—"যদি বিজলী আমাদের সন্তান হইত, তবে উহাকে ইংরাজী শিখাইয়া একজন মানুষ করিয়া যাইতাম।" স্বামীর ইচ্ছা ভৈরব-গৃহিণী কিছুতেই পূরণ করিতে

পারিলেন না। তাঁহার আর পুত্রসন্তান হইল না। তাহার পর জনার্দ্দনের উপর ইঁহাদের দৃষ্টি পড়িল। তাহাকে জামাতারূপে বরণ করিয়া, ইংরাজী লেখা-পড়া শিখাইলে পুত্রের ক্ষোভ কতকটা মিটিবে—এই আশায় দম্পতি-যুগল কতকটা আশ্বস্ত হইল। এতদিনে সেই চিরঈপ্সিত সঙ্কল্প, কার্য্যে পরিণত হওয়ায় স্বামী-স্ত্রীর আর আনন্দের সীমা রহিল না।

বাঁকুড়া জেলার বামুনহাট গ্রামের ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায়—ওরফে কলিকাতার দালাল ভৈরববাবু, জনার্দ্দনকে শান্ত স্নিগ্ধ মধুর পল্লীভবন হইতে, তাহার ধর্ম্মপ্রাণ জনকজননীর ক্রোড় শূন্য করিয়া, কলিকাতায় লইয়া গেলেন এবং তথায় তাহাকে ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। ক্রমে ক্রমে ইংরাজী জুতা ও ইংরাজী ধরণের কোট প্রভৃতিতে সেই পল্লী-বালকের দেহ শোভিত হইল।

বিজলীর বয়স যখন ছয় বৎসর, তখন দশ বৎসর বয়স্ক জনার্দ্দনকে ভৈরববাবু কলিকাতায় আনিয়াছিলেন। এখন বিজলীর বয়স ত্রয়োদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে, জনার্দ্দনের বয়সও সপ্তদশবর্ষ উত্তীর্ণপ্রায়। এই সাত বৎসরের মধ্যে বিজলী ও জনার্দ্দনের অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

কয়েকবৎসর পূর্ব্বে বিজলী ও জনার্দ্দন একত্রে ভ্রমণ করিত, একসঙ্গে ভোজন করিত, গল্প করিত, কিন্তু এখন আর সে প্রকার করে না। সঙ্কোচ ও লজ্জার আবরণ উভয়ের মধ্যে

একটা ব্যবধানের রেখা অলক্ষ্যে টানিয়া দিয়াছে। কৈশোরের এ মধুর গণ্ডীর ভিতরে হঠাৎ আসিয়া বালকবালিকা যেন একটা নূতন জীবনের স্বাদ পাইয়াছে। বিজলী সাধ্যমত জনার্দ্দনের সহিত সাক্ষাৎ করে না; তবে একত্রে বাস করায়, ইহা সে সব সময়ে রক্ষা করিতে পারিত না। জনার্দ্দন প্রথম প্রথম বৎসরে দুই তিনবার তাহার পিতামাতার কাছে যাইত. জনার্দ্দনের প্রসাদ খাইয়া কত আনন্দলাভ করিত,—মাতার ক্রোড়ে বসিয়া কলিকাতার কত গল্প বলিত,—রামদুর্ল্লভ দাদার স্কন্ধে উঠিয়া, বক্ষে মুখ রাখিয়া বাল্য-স্মৃতিকে সজীব করিয়া তুলিত। ক্রমশঃ জনার্দ্দন বৎসরে একবার গ্রীষ্মকালে বাটী যাইতে আরম্ভ করিল। তারপর দুই বৎসর আর স্বগ্রামে গমন করিল না। একবার দেশ হইতে আসিয়া জনার্দ্দনের খুব জ্বর হইল, ডাক্তারের কয়েক শিশি ঔষধ খাইয়া সে জ্বর আরোগ্য হইল বটে; কিন্তু সেই অবধি জনার্দ্দনের ভাবী শ্বশুর মহাশয় আর তাহাকে দেশে যাইতে দেন নাই। জনার্দ্দন দেশে যাইবার কথা বলিলেই ভৈরববাবু বলিতেন—"বাবা! আবার দেশের নাম করিতেছ? দেশে যাইয়া জ্বর লইয়া আসিলে। দেশের জল হাওয়া কি আর পূর্ব্বের মত আছে? তোমার পিতামাতা তৃতীয় প্রহর না হইলে অন্নগ্রহণ করেন না; দশটার সময় তোমার খাওয়া অভ্যাস; জনার্দ্দনের ভোগ না হইলে তোমায় তাঁহারা খাইতে দেন না। সেই সাবেক

বন্দোবস্ত তোমাদের ঘরে এখনও বর্ত্তমান! এখন দিন দিন লোক সভ্য হইতেছে, কিন্তু তোমার পিতামাতা "যে তিমিরে সেই তিমিরে।" জনার্দ্দনও আর এখন সীতাপুরের সেই পাড়াগেঁয়ে জনার্দ্দন নাই! সে এখন কলিকাতার জনার্দ্দনবাবু হইয়াছে। বিশেষতঃ বিজলীকে ছাড়িয়া তাহার কোথাও যাইবার ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং ভাবী-শ্বশুর মহাশয়ের কথাগুলি যুক্তিযুক্ত বলিয়া তাহার মনে হইত।

সেই বৎসরে বৈশাখ মাসে গ্রীষ্মাবকাশে বিজলীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল। রামসুন্দরের অমতেই প্রায় এই কার্য্য সমাধা হইল। পিতা রামসুন্দর বুঝিলেন, আমি "না" বলিলেও পুত্র জনার্দ্দন সে কথা শুনিবে না। বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের নিকট অপমানিত হওয়া তিনি কর্ত্তব্য মনে করিলেন না। সুতরাং শুভকার্য্য নির্ব্বিঘ্নেই সম্পন্ন হইয়া গেল।

বিবাহের পর দেখিতে দেখিতে সুদীর্ঘ তিনটী বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। জনার্দ্দন ইহার ভিতর আর দেশে আসে নাই। ইহাতে তাহার জনকজননী যত দুঃখিত—ততোধিক দুঃখিত জনার্দ্দনের রামদুর্ল্লভ দাদা! পুত্র ও পুত্রবধূকে দেখিবার জন্য বৃদ্ধ রামসুন্দর চট্টোপাধ্যায় কলিকাতায় আসিবেন ভাবিলেন; কিন্তু গৃহ-দেবতা জনার্দ্দনের সেবার ব্যাঘাত হইবে ভাবিয়া, তিনি আসিতে পারিলেন না। সুতরাং ভৃত্য রামদুর্লভকে পুত্র ও পুত্রবধূ আনিবার জন্য কলিকাতায় পাঠাইলেন।

একটি দীর্ঘাকার বংশ-যষ্টি বগলে করিয়া ও কটিদেশে ক্ষুদ্র বুচকি বাঁধিয়া রামদুর্লভ কলিকাতায় ভৈরববাবুর বাটীতে উপস্থিত হইল। তখন বেলা চারিটা বাজিয়াছে। জনার্দ্দনবাবু ও ভৈরববাবু তখনও কর্ম্মস্থল হইতে বাটী ফিরেন নাই।

বলিতে ভুলিয়াছি। জনার্দ্দনবাবু বিবাহের পরেই ইংরাজী বিদ্যা সমাপন করিয়া, শ্বশুর ভৈরববাবুর সুপারিশে একটি বড় সওদাগিরি আফিসে চাকুরী করিতেছেন। যেদিন প্রথম ভৈরববাবু জামাতাকে সাহেবের সঙ্গে ইংরাজীতে কথা কহিতে স্বকর্ণে শুনিলেন, সেদিন তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। জামাতা একটা পাশ করিতে পারিলে ভৈরববাবু আরও খুসি হইতেন; কিন্তু শ্বশুরের দুরদৃষ্টে তাহা ঘটে নাই, এজন্য ভৈরববাবুও দুঃখিত নহেন। গৃহিণীকে প্রায়ই বলিতেন—"জনার্দ্দন আমাদের পাশ করে নাই বটে; কিন্তু ইংরাজীতে খুব পারদর্শী হইয়াছে। সাহেবের সহিত যদি তাহার ইংরাজী কথাবার্ত্তা শ্রবণ কর, তাহা হইলে তুমি অবাক্ হইয়া যাইবে।" ভৈরব-গৃহিণী মৃদু হাসিয়া বলিতেন—"আহা! উহারা দীর্ঘজীবী হউক—আমি যেন উহাদের কোলে মরিতে পারি।"

রামদুর্লভ ভৈরববাবুর গৃহে উপস্থিত হইয়া ডাকিল "বাড়ুজ্যেমশায় কোথা গো? ও বাড়ুজ্যেমশায়?"

একজন হিন্দুস্থানী বেহারা বাহিরে আসিয়া রুক্ষস্বরে বলিল, "তুম্ কোন্ হ্যায়—কাহে চিল্লাতা?"

রামদুর্লভের হাঁটুর উপরে কাপড়! এক পা ধূলা, ধান্যের ধূলা মস্তকের দীর্ঘ কেশে পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চিত ছিল, তাহার উপর কলিকাতার রাজপথের ধূলা জমিয়া তাহার মস্তকটীকে পূর্ণ করিয়াছে।

রামদুর্লভ বলিল—"বাঁড়ুজ্যে মশায় কোথা? আমাদের জনার্দ্দন কোথায়?"

বেহারাটা তাহার এই ধৃষ্টতাপূর্ণ উত্তরে রাগে কি বলিতে যাইতেছিল! তাহার বাবুকে ও জামাইবাবুকে অপমানসূচক বাক্যে সম্বোধন! এমন সময় গৃহিণী আসিয়া বলিলেন—"কে রে রামদুর্লভ? আয় বাড়ীর মধ্যে আয়।"

গিন্নি রামদুর্লভকে দুটি রসগোল্লা জল খাইতে দিলেন। রামদুর্লভ মনে মনে হাসিয়া বলিল মা ঠাক্‌রুণ কি আমার সহিত ঠাট্টা করিতেছেন। এই প্রকার শাদা গোল্লা যে দশ গণ্ডা পাইলেও আমার উদর পূর্ণ হয় না। ইহাই কি কলিকাতার জলযোগের নমুনা! জঠরাগ্নিতে তখন তাহার পেট পুড়িয়া যাইতেছিল।

রামদুর্লভ গৃহিণীকে কর্ত্তার ও জনার্দ্দনের কথা আবার জিজ্ঞাসা করিল। গৃহিণী বলিলেন—"আজ তাঁহাদের নিমন্ত্রণ আছে। আফিসের পর নিমন্ত্রণে যাইবেন। আসিতে সন্ধ্যা হইবে।"

একটু পরেই গৃহিণী রামদুর্লভকে আহার করিতে ডাকিলেন। সরু বালাম চাউলের অন্ন প্রথমে যাহা দিয়াছিল, তাহা তিন

গ্রাসেই শেষ হইল। বামুন ঠাকুর তিনবার অন্ন পরিবেশন করিল; চতুর্থবারে রামদুর্লভের কর্ণে হাস্যরব প্রবেশ করিল। রামদুর্লভ আর অন্ন লইল না। বেচারীর ক্ষুধার অর্দ্ধেকও তখন উপশম হয় নাই।

আচমন করিতে করিতে বেচারী দুইবার চক্ষু মুছিল। তাহার প্রভুপত্নী কাছে বসিয়া কত যত্নে তাহাকে ভোজন করান, আর আজ তাঁহার বধূমাতা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ঘৃণা, তাচ্ছিল্য, বিদ্রূপপূর্ণ হাসি হাসিল; রামদুর্লভের চক্ষুদুটি ক্ষোভে অভিমানে জলে ভরিয়া আসিল।

পরক্ষণেই রামদুর্লভের মনে পড়িল, ইহারা ত নিরামিষ ভোজন করে না। যদিও মাছ আমার পাতে দেয় নাই, তথাপি মাছের সংস্পর্শেই ত রান্না হইয়াছে! রামদুর্লভ নর্দ্দমার ধারে গিয়া বমি করিয়া ফেলিল। একটি অন্নও তাহার উদরে রহিল না। পরে সে চুপ করিয়া বহির্ব্বাটীর এক পার্শ্বে শয়ন করিল।

সন্ধ্যার পর ভৈরববাবু ও জনার্দ্দন গৃহে আসিলেন। পথশ্রমে রামদুর্লভ তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ভৈরববাবু উপরে চলিয়া গেলেন। জনার্দ্দনবাবু বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। বেহারা গড়গড়ায় তামাক দিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে জনার্দ্দনবাবুর কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের গল্প ও উচ্চ হাস্যরবে গৃহখানি মুখরিত হইয়া উঠিল।

জনার্দ্দনবাবুর বন্ধুবর্গের কৌতুকহাস্যের শব্দে রামদুর্লভের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে নেত্র মার্জ্জনা করিয়া ইতস্ততঃ চাহিল, প্রথমতঃ জনার্দ্দনবাবুকে রামদুর্লভ চিনিতেই পারিল না! সুন্দর টেরি, গাত্রে শুভ্র ধোপদস্ত সুন্দর কামিজ, তদুপরি সোণার বোতাম। মুহুর্মুহু রুমালে মুখ মুছিতেছেন! রামদুর্লভ ভাবিতে লাগিল, ইনিই কি আমাদের সেই জনার্দ্দন! যাহাকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছি! আমি ঘোড়া হইয়াছি, সে পিঠে চাপিয়াছে, বুকে শুইয়া কত মলমূত্র ত্যাগ করিয়াছে, আমি ডানহাতে তাহা মুছিয়াছি, খাবার জিনিষ নষ্ট করিয়াছে, আমি তাহা খাইতেও দ্বিধা করি নাই। এই কি আমাদের সেই জনার্দ্দন? রামদুর্লভ ভাবিল, তাহার ঘুমের ঘোর এখনও বুঝি কাটে নাই।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সে স্থির করিল, সত্যই সে জাগ্রত। নিদ্রা তাহার অনেকক্ষণ দূর হইয়া গিয়াছে।

রামদুর্লভ উঠিয়া আসিয়া জনার্দ্দনের সম্মুখে দাঁড়াইল। বাবুদের দেখিয়া একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিল—"কি ভাই জনার্দ্দন! ভাল আছ ত? বাপ-মাকে ও তোমার এই রামদুর্লভ দাদাকে একেবারে ভুলে গেছ! কতদিন বাড়ী যাওনি বল দেখি? কলিকাতায় থাকিলেই কি এমন খিষ্টানের মত হ'য়ে যে'তে হয়! বউমাকে নিয়ে ঘরে চল! কর্ত্তা, মাঠাকরুণ, তোমাদিগকে নিতে পাঠিয়েছেন।"

মর্ম্মযাতনায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে রামদুর্লভ একবারেই কথাগুলি বলিয়া ফেলিল। বন্ধুবর্গ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ঘরে অনেকক্ষণ: পর্য্যন্ত বিকট হাস্যের প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল! কেহ বলিল—"এটা কেহে?" কেহ বলিল "পাগলটাকে কোথা থেকে ধরে আন্‌লে হে?" কেহ বলিল—"পাড়াগেঁয়ে জানোয়ার স্বচক্ষে দেখা গেল।" কেহ ইংরাজীতে বলিলেন—"লোকটা কি কাল ভাই! রাত্রে দেখিলে ভূত ভিন্ন অন্য কিছু মনে হয় না।" বন্ধু-বর্গের মন্তব্যের আর বিরাম হইতেছে না।

জনার্দ্দনবাবু লজ্জায় জড়সড় হইলেন! অসভ্যটা আর একটু অপেক্ষা করিতে পারিল না! তারপর ক্রোধ হইল—বাটীর বেহারার উপর। সে বেটা উহাকে এখানে আসিতে দিল কেন! প্রকাশ্যে বলিল—"ও আমাদের দেশের চাকর হে! অনেকদিন আছে কি না, তাই আপনার লোকের মত ব্যবহার করে।" রামদুর্লভের দিকে চাহিয়া বলিল—"কাল সকালে কথা হবে এখন যা।" এই বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন "বেহারা"। বেহারা ছুটিয়া আসিয়া বলিল "হুজুর"।

"এই লোকটাকে তোর ঘরে নিয়ে যা।" বাবু এই হুকুম দিয়া আবার আমোদ-কৌতুকে মত্ত হইলেন। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য রামদুর্লভ আসিয়া রস ভঙ্গ করায় তিনি বন্ধুগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে ত্রুটি করিলেন না।

রামদুর্লভের রাত্রে নিদ্রা হইল না। যাতনায় সে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। কত কথাই তার মনে হইতে লাগিল। ক্রিশ্চানী লেখাপড়ার উপর তার ঘৃণা হইতে লাগিল।

ক্রোধে, ঘৃণায়, লজ্জায় সে মাথার চুল ধরিয়া টানিতে লাগিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও মাঠাকুরাণীর জন্য তার কান্না পাইতে লাগিল। তার মনে হইতেছিল, একবার গঙ্গার পবিত্র সলিলে জনার্দ্দনকে স্নান করাইয়া দেশে লইয়া যাইতে পারিলে হয়; কিন্তু তাহা ত হইবে না। ঐ ডাকিনী বুঝি আমার সোণার জনার্দ্দনের মাথা খাইয়াছে! কলিকাতার হাওয়া লাগিলেই কি মানুষের এমন মাথা বিগড়াইয়া যায়? আহা! ভাইটী আমাদের একবারেই হাতছাড়া হইয়া গেল। বাবা জনার্দ্দন! তুমি একি করিলে? ছোকরাগুলি সব জনার্দ্দনকে ঘিরিয়া বসিয়া কি করিতেছিল? সকলেরই মস্তকে টেরিকাটা! কোঁচান ফিন্‌ফিনে ধুতি পরা। এইগুলাই বুঝি ব্যারাম! বাবা জনার্দ্দন! ভাইটির আমার ব্যারাম আরোগ্য করিয়া দিন্! আমি ঘরে লইয়া গিয়া চরণামৃত খাওয়াইয়া তাহাকে পবিত্র করিব! আমার জীবন থাকিতে আর কখন কলিকাতার হাওয়া উহার গায়ে লাগিতে দিব না। নয়নাশ্রুতে বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া অস্থিরচিত্তে রামদুর্লভ সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিল।

প্রভাতে জনার্দ্দনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া, রামদুর্লভ আরও হতবুদ্ধি হইল! কত সাধ্য, সাধনা, উপরোধ, অনুরোধ করিল।

একটি দিনের জন্য বউমাকে লইয়া গৃহে যাইতে বলিল। উপেক্ষার হাসি হাসিয়া শিক্ষিত জনার্দ্দনবাবু অশিক্ষিত রামদুর্লভের কথা উড়াইয়া দিলেন। শেষে ইংরাজী কায়দায় বলিলেন—"আমার পিতামাতাকে বলিও, তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারায় আমি দুঃখিত হইলাম। যদি আফিসের ছুটীর সুবিধা করিতে পারি, তবে একবার দেশে যাইবার চেষ্টা করিব।"

রামদুর্লভ চক্ষের তপ্ত অশ্রু মুছিতে মুছিতে বিদায় হইল। বাটী আসিয়া রামসুন্দর ও তাঁহার গৃহিণীর সঙ্গে কথা কহিতে তাহার সাহস হইল না।

রামদুর্লভের কাছে কর্ত্তা-গৃহিণী যখন পুত্রের উন্নতির কথা শুনিলেন, তখন আর তাঁহাদের দুঃখের সীমা রহিল না। জনার্দ্দনের গৃহে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণ-দম্পতি চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর বিংশতি বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে যে দু'একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা এই পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

পুত্রের আচরণ ও অধোগতি দেখিয়া, রামসুন্দর চট্টোপাধ্যায় গৃহিণীকে লইয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। যাইবার সময় গৃহ-দেবতা জনার্দ্দনকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা গৃহত্যাগ করেন। বিশ্বস্ত ভৃত্য রামদুর্লভকে জমিজমা তৈজসপত্র যাহা কিছু ছিল, সমস্তই দানপত্র লিখিয়া দিয়া যান। দানপত্রে লিখিত ছিল, রামদুর্লভ তাঁহার সন্তান অপেক্ষা প্রিয় ও স্নেহের সামগ্রী। সে যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন এই বিষয়ের আয় হইতে তাঁহার অনুষ্ঠিত ক্রিয়া-কলাপ, অতিথি-সেবা ও ব্রাহ্মণভোজনাদি বজায় রাখিবে। জনার্দ্দনের ঘরে দিবারাত্র একটি ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিবে। তাহার শেষ সময়ে এই কার্য্যগুলি বজায় রাখিতে সে বিষয়ের বন্দোবস্ত করা যেরূপ কর্ত্তব্য বুঝিবে, তাহাই করিবে। আমার বিষয়াদির উপর ভবিষ্যতে আমার পুত্রের কোন দাবী থাকিবে না। অদ্য হইতে জনার্দ্দন চট্টোপাধ্যায় আমার ত্যাজ্য-পুত্র।

বিংশতিবর্ষের মধ্যে রামদুর্লভ বিষয়াদি অনেক বাড়াইয়াছে। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ক্রিয়াগুলি সমস্তই বজায় আছে, এখন দলে দলে অতিথি-সন্ন্যাসীর ভজন-সঙ্গীত ও বোম্ বোম্ হর হর শব্দে সেস্থান অহরহঃ মুখরিত হয়। রামদুর্লভ বৃদ্ধ হইয়াছে। পরিধানে কৌপীন, সর্ব্বাঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত—একবেলা দুটি আতপ অন্ন গ্রহণ করে—আর মুখে কেবল "জনার্দ্দন" "জনার্দ্দন।"

রামসুন্দর চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে লইয়া কোথায় গিয়াছেন, তাহা কেহই বলিতে পারে না। একজন সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া যান। কেহ কেহ বলে, সেই সন্ন্যাসীই ইঁহাদের গুরু। জনপ্রবাদ নানাপ্রকার—শুনিতে পাওয়া যায় না কি তাঁহারা কুরুক্ষেত্রের একটি অরণ্যে সন্ন্যাসীর আশ্রমে বাস করিতেছেন। আবার কেহ বলেন, কাশীধামে তাঁহাদের নশ্বর দেহের অবসান হইয়াছে। কেহ বা বলেন, এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁহারা হিমালয়ের দিকে চলিয়া গিয়াছেন।

এদিকে ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর এক বৎসর পরেই তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি জামাতা ও কন্যার নামে বিষয়াদি উইল করিয়া যান। দালালি করিয়া ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন। চৌরঙ্গীর দুইখানি ত্রিতল অট্টালিকা, বিডন্ ষ্ট্রীটের তিনখানি বাড়ী, একলক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ এবং তাঁহাদের বাসভবন চিৎপুরের

বৃহৎ অট্টালিকা এখন জামাতা জনার্দ্দন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পত্তি। ইহা ব্যতীত ভৈরববাবুর স্ত্রীর সমস্ত অলঙ্কার ও নগদ লক্ষাধিক টাকা জনার্দ্দনবাবু পাইয়াছেন। ভৈরববাবুর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে, জনার্দ্দনবাবু নিলামে কতকগুলি নূতন জমিদারী খরিদ করিয়াছেন। এই জমিদারীর বাৎসরিক আয় অন্যূন লক্ষ টাকা। জনার্দ্দনবাবু এখন সহরের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; তাঁহার নাম-ডাক যথেষ্ট—সাহেব-সুবার কাছে তাঁহার খাতির ও সম্মানের সীমা নাই।

বিজলীর দুইটী সন্তান হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ হরপ্রসাদের বয়স বার বৎসর এবং কনিষ্ঠ রামপ্রসাদের বয়স দশ বৎসর। একজন সাহেব-শিক্ষক আসিয়া ছেলে দুইটীকে দুই বেলা পড়াইয়া যায়। জনার্দ্দনবাবু এখন সাহেবী ধরণে জীবন যাপন করেন, সাহেবী-খানায় তাঁহার গৃহাদি সজ্জিত। মাঝে মাঝে তাঁহার বরানগরের বাগানে নাচের মজলিস্ হয় এবং বড় বড় সাহেব-বিবি ইহাতে নিমন্ত্রিত হ'ন।

কয়েক বৎসরের মধ্যে জনার্দ্দনবাবু আরও সভ্য হইলেন। কলিকাতার সমস্ত বড় বড় লোক তাঁহার বন্ধু হইল। রাত্রিতে প্রায়ই গৃহবাস ঘটিত না। তদুপরি বাক্সবন্দী হইয়া কত রকমের বিলাতী বোতল নিত্য গৃহে শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিল। কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল এবং নানাবিধ দুরারোগ্য

রোগ তাঁহার দেহ অধিকার করিয়া বসিল। আরও কিছুদিন গত হইবার পর তাঁহার লিভার বিকৃত হইল। সহরের বড় বড় ইংরাজ ডাক্তার তাঁহার চিকিৎসা করিলেন। বাটীতে মেডিক্যাল কলেজ বসিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। শীতপ্রধান দেশবাসী, মদ্যমাংসভোজীদের অনুকরণে কু-খাদ্য উদরস্থ করিলে, শাকান্নভোজী বাঙ্গালীর যাহা ঘটে, এক্ষণে জনার্দ্দনবাবুরও তাহাই হইল। দিন দিন তাঁহার পরমায়ু হ্রাস হইয়া আসিতেছিল—একদিন হঠাৎ হৃদয়ের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাঁহার জীবন-প্রদীপ নিবিয়া গেল।

শ্রাদ্ধান্তে জ্যেষ্ঠ হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও কনিষ্ঠ রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পিতার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইলেন। হরপ্রসাদের বয়স তখন বিংশতি বর্ষ এবং কনিষ্ঠ রামপ্রসাদের বয়স অষ্টাদশ বর্ষ। উভয় ভ্রাতাই বিদেশীভাবে শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়াছেন। পিতার জীবদ্দশায় হরপ্রসাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছিল—কনিষ্ঠ রামপ্রসাদের এখনও বিবাহ হয় নাই। জ্যেষ্ঠ পিতার প্রকৃতি ষোল আনা পাইয়াছিল। সাহেবী আদব-কায়দা, তাহার পিতা অপেক্ষাও অধিক ছিল। এমন কি হিন্দুর অন্নব্যঞ্জন তাহার পছন্দ হইত না। মুসলমান বাবুর্চ্চি হরপ্রসাদের আহারাদি প্রস্তুত করিত। কনিষ্ঠ রামপ্রসাদ বিদেশীভাবাপন্ন হইলেও, বাল্যকাল হইতে হিন্দুয়ানী প্রিয় ছিলেন। মাংসাদিতে তাঁহার রুচি

ছিল না; তিনি মাঝে মাঝে গীতা ও হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতেন।

শাস্ত্র-গ্রন্থাদি পাঠে ক্রমশঃ রামপ্রসাদের মন অনেক পবিত্র হইয়া উঠিল। হৃদয়ের তারে কত রকমের সুর উঠিল। সেই সুর রামপ্রসাদ নিবিষ্টচিত্তে শুনিতে লাগিল, ক্রমে উন্মাদনা আসিল। এই সুরের যে একবার মধুর আস্বাদন পাইয়াছে, সে কি আর ভুলিতে পারে? এ সুর যে হিন্দুর রক্ত, মাংস এবং অস্থিমজ্জায় বাঁধা। যাঁহাদের হিন্দুশাস্ত্র জীবনস্বরূপ ছিল, যাঁহাদের হিন্দু রীতি-নীতি জীবনের অবলম্বন ছিল, তাঁহাদেরই রক্তমাংসে আমাদের জন্ম। হিন্দু-মাত্রেরই এই সুর হৃদয়ের মাঝে গুণ গুণ করিয়া সদাই বাজিতেছে। বিদেশীয় হাবভাব ও কোলাহলে আমরা তাহা শুনিতে পাই না। পিতৃপুরুষের আশীর্ব্বাদে ও পুণ্যবলে যে একবার সে সুমধুর স্বর শুনিবে, সেই পাগল হইবে।

রামপ্রসাদ কাজেই পাগল হইল। কোট-পেণ্টুলেন ছাড়িল। হবিষ্যান্ন তাহার সম্বল হইল। বাহিরের একখানিমাত্র ক্ষুদ্র ঘর তাহার পবিত্র আশ্রমে পরিণত হইল। সত্যসত্যই সে রামসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের বংশধর হইল। জ্যেষ্ঠ হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তখন হিন্দু নামের অযোগ্য হইয়াছেন। যাহাদের অনুকরণ করিতেছেন, তাহাদের যাহা অখাদ্য, হরপ্রসাদ এখন তাহাই আহার করেন। বিদেশীয়দের যাহা কিছু মন্দ, হরপ্রসাদ সে সমস্তই গ্রহণ করিয়া-

ছেন। তাঁহাদের যেগুলি গুণ অর্থাৎ—সাহস, উদ্যম, একতা, উদারতা, ব্যবসাবুদ্ধি, উপার্জ্জন-শক্তি, সেগুলিকে হরপ্রসাদ আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।

কনিষ্ঠ রামপ্রসাদ প্রতিজ্ঞা করিল—জ্যেষ্ঠকে হয় স্বপথে স্বধর্ম্মে টানিয়া আনিবে, না হয় এ সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।

একদিন জোষ্ঠ হরপ্রসাদকে একটু প্রকৃতিস্থ দেখিয়া, রামপ্রসাদ অবনত মস্তকে শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বরে বলিল, "দাদা!"

রুক্ষস্বরে হরপ্রসাদ কনিষ্ঠের পানে চাহিয়া বলিল—"কি রে কি বল্‌ছিস্‌?"

রামপ্রসাদ। আজ আপনাকে একটী অনুরোধ করিব।

হরপ্রসাদ। কি অনুরোধ?

রামপ্রসাদ। আমরা স্বর্গীয় রামসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র। আমরা হিন্দু ব্রাহ্মণ; কিন্তু আজ আমরা ম্লেচ্ছেরও অধম হইয়াছি। বলুন দেখি দাদা! আমরা ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া কত নিম্নে আসিয়া পড়িয়াছি। অমূল্য শাস্ত্র-গ্রন্থরাজি আমরা অবজ্ঞা-ভরে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছি। কত রত্ন তাহাতে লুক্কায়িত আছে, তাহার কিছুমাত্র সন্ধান আমরা রাখি না—তাই হিন্দুত্বের মহিমাও উপলব্ধি করিতে পারি না।

হরপ্রসাদ। তুই যে একেবারে হিন্দুর পাদ্রীসাহেব হলি!

বক্তৃতা রাখ্! অনুরোধটা কি শীঘ্র বল্, আমার অনেক কাজ আছে।

রামপ্রসাদ। আপনার ত এখন বাগানবাটী যাইবার সময়! অন্য কাজ এখন—

হরপ্রসাদ বাধা দিয়া বলিল, "কি কাজ, তোকে হিসাব দিতে হবে না কি?"

রামপ্রসাদ। একি কথা বল্‌ছেন দাদা! জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে কি হিসাব দিবে! এ কথা বলাতেও যে আমার পাপ হয় দাদা!

হরপ্রসাদ। তবে তুই বাগানবাড়ীর কথা বলছিলি কেন?

রামপ্রসাদ। দাদা! আপনি আমার পিতৃতুল্য; কিন্তু হিন্দু-শাস্ত্রে, পিতৃতুল্য সম্মানের পাত্র জ্যেষ্ঠকেও পাপপথ হইতে ফিরাইবার কনিষ্ঠের অধিকার আছে।

হরপ্রসাদ। বাগানবাড়ীতে বন্ধুবান্ধব লইয়া বেড়াইতে যাওয়াটা হিন্দুশাস্ত্র মতে পাপ না কি?

রামপ্রসাদ। কনিষ্ঠের কাছে আপনার মিথ্যা কপটতার আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য নহে! সত্যই কি আপনি বাগানবাড়ীতে বেড়াইতে যান?

হরপ্রসাদ। তবে কি করিতে যাই?

রামপ্রসাদ। আপনিই তাহার উত্তর দিতে পারেন।

হরপ্রসাদ। আমি তোকে উত্তর দিতে বাধ্য নই। তোর হুকুম লইয়া কি আমাকে কার্য্য করিতে হইবে?

রামপ্রসাদ। আমার কেন হুকুম লইবেন? কেন আমায় পাপের ভাগী করিতেছেন! চিরদিন যেন আমি আপনার আদেশ মস্তকে বহন করিয়া মরিতে পারি; কিন্তু আর আমি আপনাকে ম্লেচ্ছ হইয়া অনাচার ও পাপস্রোতে ভাসিতে দিব না, ইহাতে আমার অদৃষ্টে যাহাই ঘটে ঘটুক।

হরপ্রসাদ। 'অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক!' বটে, তোর যে বড়ই লম্বা লম্বা কথা দেখ্‌ছি! পিতার অর্থ, পিতার গৃহ! আমি এখানে বসিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব। তোর বলিবার কোনই অধিকার নাই!

রামপ্রসাদ। বলিবার অধিকার নাই? জ্যেষ্ঠ নরকের পঙ্কিল স্রোতে ভাসিয়া যাইবে—কনিষ্ঠের বলিবার অধিকার নাই? ভ্রাতা দেহ মন কলঙ্কিত করিতেছে, আয়ু, বল, শক্তি হারাইতেছে—কনিষ্ঠের বাধা দিবার অধিকার নাই? পিতার গৃহ কলঙ্কিত হইবে, পিতার অর্থ নরকের পথে ভাসিয়া যাইবে, আর আমার বাধা দিবার অধিকার নাই?

হরপ্রসাদ। এতক্ষণে তোর গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিয়াছি! পিতার গৃহে, পিতার অর্থে তোর অধিকার আছে বৈকি! বেশ! পিতার অর্থ, পিতার গৃহ আজই বিভাগ করিয়া লও। এত ভূমিকা না

করিয়া এ কথা স্পষ্ট বলিলেই ভাল হইত! মনে যখন অন্য ভাব আছে, তখন মুখে লজ্জা সঙ্কোচ কেন? হরপ্রসাদ তাহার স্বর একেবারে পরিবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিল।

রামপ্রসাদ। দাদা! মনে অন্য ভাব যেদিন উদয় হইবে, সেদিন যেন আমার অস্তিত্ব জগতে না থাকে। ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার তুচ্ছ বিষয়-বিভাগ! এ পাপ-কল্পনা আমার মনে কখনই উদিত হয় নাই। দাদা আপনার সহিত আমার কি কোন প্রভেদ আছে? আমাদের পিতামাতা যে এক! এক রক্ত, এক মাংস, এক অস্থি—একই শরীর! ইহা কি কখনও পৃথক হইবার? ভিত্তি যাহার এক, তাহাকে পৃথক করিবে কে? কাহার সাধ্য তাহাকে ভিন্ন করিতে পারে? এক মাতৃস্তন্যে আমাদের শরীর পুষ্ট হইয়াছে। আমাদের উভয় ভ্রাতার জীবনের প্রধান উপাদান এক। একই জিনিষে যে শরীরের উৎপত্তি, সেই জীবনটা কি পৃথক্ হইতে পারে? কেবল সেই মৃত্যুর দিনেই আমরা উভয় ভ্রাতায় পৃথক্ হইব! হিন্দুর নিকট জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য—ইহাই শাস্ত্রবাক্য। হিন্দুর শাস্ত্র যদি সত্য হয়, তবে পিতৃতুল্য ব্যক্তিকে পৃথক্ ভাবিবে কে? দাদা! অযথা কিছু বলিয়া যদি আপনার মনে কষ্ট দিয়া থাকি, তবে তাহার জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি, আপনি যদি মার্জ্জনা না করেন, তবে সমগ্র জীবনেও কি তার প্রায়শ্চিত্ত

করিতে পারিব না? এই আশীর্ব্বাদ করুন, আর যেন কখন এই অধম ভ্রাতা-কর্ত্তৃক আপনাকে মনঃকষ্ট পাইতে না হয়।

কনিষ্ঠ রামপ্রসাদ জ্যেষ্ঠকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল! হরপ্রসাদও "পাপ বিদায় হইল" ভাবিয়া আপন কার্য্যে গমন করিলেন।

* * * *

পরদিবস প্রাতঃকালে রামপ্রসাদের কক্ষে কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না। ক্রমে এ কথা হরপ্রসাদ শুনিল; কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরিধানে একখানি সামান্য ধুতি, গায়ে একটিমাত্র পিরান ; গৃহ পরিত্যাগ করিয়া রামপ্রসাদ বিষ্ণুপুরের পথ ধরিয়া চলিয়াছে। সঙ্গে একটি কপর্দ্দকও নাই। তিন দিবস আজ সে অনাহারী। ক্ষুৎপিপাসাতুর হইয়া নিকটস্থ একটি অশ্বথ বৃক্ষের ছায়ায় গিয়া দূর্ব্বাঘাসের উপর শয়ন করিল। বিশ্রামান্তে উঠিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু আর উঠিবার শক্তি নাই। ধনীর সন্তান, আজন্ম সুখে প্রতিপালিত, অভাব কাহাকে বলে জানে না! দাস-দাসী, দ্বারবান যাহার গৃহে অহরহঃ কোলাহল করিতেছে, অগণিত স্বর্ণমুদ্রা যাহার লৌহ-সিন্দুকে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, যাহার নায়েব, কার্কুন ও কর্ম্মচারিগণ দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করে, সেই সুখৈশ্বর্য্য-পালিত অগাধ অর্থের অধিকারী রামপ্রসাদ, আজ বৃক্ষছায়ায় তৃণশয্যার উপরে গড়াগড়ি দিতেছে! ঘটনাচক্রে আজ সে একটি পয়সার জন্য লালায়িত, এক মুষ্টি অন্নের জন্য প্রাণ বুঝি বহির্গত হইয়া যায়! সংসারের নিয়মই বুঝি এই। যাহার সম্বল নাই, সে ক্ষুধার যাতনায় অস্থির হইতেছে—খাইতে পায় না ; আবার যাহার আছে, সেও রোগাদির জন্য বিধিবিড়ম্বনায় খাইতে পায় না। কেহ উপার্জ্জন

করে, ভোগ করিতে পারে না, আবার কেহ আজন্ম উপার্জ্জনের চেষ্টা মাত্র না করিয়াও অন্যের উপার্জ্জিত অর্থ ভোগ করিতে পায়। কেহ ক্রোড়পতি হইয়াও কৌপীন মাত্র পরিধান করিয়া, অগ সম্পদকে ধূলিমুষ্টি জ্ঞানে সমস্ত ত্যাগ করিয়া যায়—আবার কেহ সেই অর্থের জন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম না মানিয়া হা হা করিয়া ছুটিতেছে! সংসারের একি প্রহেলিকা! একি ভীষণ কর্ম্মফল! মানবের এই অবস্থা দেখিয়া মনে হয়—বিধাতার বিধান এত কঠোর কেন? ক্ষুধার যন্ত্রণায় একবার রামপ্রসাদের মনে হইল, কোন গৃহস্থের গৃহে যাইয়া কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা করে! পরক্ষণে আবার ঘৃণা জন্মিল! ভাবিল, জনার্দ্দন চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র হইয়া—হর প্রসাদের সহোদর হইয়া, লোকের দ্বারে ভিক্ষা করিব! জীবনকে যদি ভিক্ষার উপর নির্ভর করিতে হয়—এমন জীবন ধারণ করিবার প্রয়োজন নাই! এই অশ্বত্থবৃক্ষতলই আমার অন্তিমস্থান হউক। ক্ষুৎপিপাসা ও পথশ্রমে আমার জীবনীশক্তি দ্রুত হ্রাস হইতেছে, অদ্য রজনীতেই দেহ হইতে জীবন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। এই সময় আমার জ্যেষ্ঠের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া তাঁহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি! আমি তাঁহার চরণে অপরাধী! তাঁহাকে মনঃকষ্ট দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না; কিন্তু আমি ক্রোধের বশে হয় ত মনের কথাগুলা তাঁহাকে গুছাইয়া বলিতে পারি নাই। তাই হয় ত তিনি ভাবিলেন, আমার পিতার সম্পত্তি আমি তাঁহার

নিকট হইতে বিভাগ করিয়া লইতে ইচ্ছুক! ভ্রমক্রমে যদি ভাবের বা ভাষার ব্যতিক্রমে এ কথা মুখ দিয়া বাহির হইয়া থাকে, তবে ত রামপ্রসাদ আজ নরকের কীট! আমার জ্যেষ্ঠ যিনি, তিনি যদি পিতার সর্ব্বস্ব উড়াইয়াও সুখী হ'ন, তাহাতে আমি বলিবার কে? কঠোর পরিশ্রমে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া জ্যেষ্ঠকে সুখী করাই ত কনিষ্ঠের কর্ত্তব্য! সে কর্ত্তব্য ত আমি কোনদিনই পালন করি নাই! সুমিত্রানন্দন আদর্শচরিত্র লক্ষ্মণ, চৌদ্দবর্ষ কাল বিনিদ্র-নেত্রে জ্যেষ্ঠের সুখের জন্য অরণ্যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন! ভরত জ্যেষ্ঠের অভাবে তাঁহার পাদুকা মস্তকে ধারণ করিয়া, রামের ভৃত্যরূপে রাজ্য পালন করিয়াছিলেন। চারি পাণ্ডবভ্রাতা জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের বিনা অনুমতিতে একপদও কোথাও অগ্রসর হইতেন না! যখন কুরুগণ তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পাঞ্চালীকে কুরুসভায় কেশাকর্ষণ করিয়া উলঙ্গ করিবার প্রয়াস পাইলেন, তখন ইচ্ছা করিলে ভীমার্জ্জুন সেই দণ্ডেই কুরুকুল বিনাশ করিয়া দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা ও অপমানের প্রতিশোধ লইতে পারিতেন! চারি পাণ্ডব, জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের অনুমতির জন্য রোষকষায়িত নেত্রে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন—জ্যেষ্ঠ অনুমতি দিলেন না! জ্যেষ্ঠের আদেশ পাইলেন না বলিয়া—ক্ষমতা সত্ত্বেও পাঞ্চালীর অপমান স্বচক্ষে দেখিতে লাগিলেন! প্রতিকারবিধানের জন্য তাঁহারা হস্ত উত্তোলিত করিতে পারিলেন না! কেবল বজ্রমুষ্টিতে গদা ধারণ

করিয়া জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে কুরুসভার দিকে চাহিয়া রহিলেন। চারি পাণ্ডবের প্রতিজ্ঞা ছিল, জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের একবিন্দু রক্ত যে ভূমিতে ফেলিবে, তাহার বংশে বাতি দিতে কাহাকেও রাখিবে না! কি অপূর্ব্ব ভ্রাতৃভক্তি! যে আর্য্যগণ জ্যেষ্ঠের সম্মানার্থ এতদূর ত্যাগ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, সেই আর্য্যের বংশধর হইয়া জ্যেষ্ঠের প্রাণে বেদনা দিব? জননী মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিলেন, "ভ্রাতার শক্তি সংসারে অজেয়! ভ্রাতার স্নেহাশ্রয়ের এমনই মধুরত্ব আছে যে, সংসারের সহস্র বিপদ, দুঃখ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না!" আজ আমি মাতার সেই অন্তিম বাক্যকেও উপেক্ষা করিয়াছি! আমার মত পাপী জগতে আর কে আছে?

আমরাও ত সেই আর্য্য-বংশধর! আমরাও ত সেই হিন্দু! আমরাও ত সেই পবিত্র ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি! যদি তাঁহাদের পদানুসরণ না করি, যদি হিন্দুর শাস্ত্রবাক্য পালন না করি, তবে যে আমরা হিন্দুনামের অযোগ্য! যদি আমরা হিন্দু নহি, তবে আমরা কি? আমরা কি তবে নরকের কীট?

অগ্রজ! আপনি মাতৃগর্ভ অগ্রে অধিকার করিয়াছিলেন,—মাতৃস্তন্যের আপনিই অগ্রে অধিকারী হইয়াছিলেন! আমি আপনার প্রসাদভোজী মাত্র! পিতৃত্যক্ত সম্পত্তির আপনিই ন্যায়তঃ অধিকারী! আমি আপনার দাস,—ভৃত্য মাত্র! আপনি আজ

করিবেন, সেই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আপনার আদেশ পালন করিব, ইহাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু আমি পাপী—মহাপাপী, সে সৌভাগ্য আমার অদৃষ্টে নাই! আমি অনশনে আপনার চরণ স্মরণ করিয়া, অদ্য বৃক্ষতলে জীবন ত্যাগ করিয়া আমার কৃত কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করিব, আমাকে ক্ষমা করুন। রামপ্রসাদ হৃদয়ের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া রোদন করিতে লাগিল। তাহার চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে একবার ইচ্ছা হইল; কিন্তু সে শক্তি তখন তাহার ছিল না।

ক্ষুৎপিপাসায় অধীর হইয়া রামপ্রসাদ সেই বৃক্ষতলে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল।

একজন ব্রাহ্মণ সেই পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন—মৃতপ্রায় একটি যুবক অশ্বত্থ বৃক্ষতলে পড়িয়া আছে। নিকটে গিয়া বারংবার চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর পাইলেন না। নাসিকায় হস্তার্পণ করিয়া দেখিলেন যে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস অতি মৃদুভাবে প্রবাহিত হইতেছে। যুবককে ভদ্রবংশ-সম্ভূত দেখিয়া তাঁহার মনে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি তাহার চৈতন্য-সম্পাদনে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন, যুবক ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দুমাত্রেই ব্রাহ্মণের বাহ্য লক্ষণ দেখিলেই তিনি ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব কি না, তাহা অনায়াসে চিনিতে পারেন। অনেক চেষ্টা করিয়া যখন চেতনা হইল না, তখন ব্রাহ্মণ বক্ষে

করিয়া রামপ্রসাদকে গৃহে লইয়া গিয়া বহু সেবা-শুশ্রূষায় তাহার চৈতন্য-সম্পাদন করিলেন।

বিষ্ণুপুরের সন্নিকটস্থ একখানি ক্ষুদ্র গ্রামের প্রান্তসীমায় ব্রাহ্মণের পর্ণকুটীর অবস্থিত। একটি দুই বৎসরের কন্যা ও একজন বৃদ্ধা ব্যতীত গৃহে আর কেহই ছিল না। কন্যাটি যখন ছয় মাসের, তখন তাহার জননী ইহধাম ত্যাগ করেন। আজ দেড় বৎসর হইল ব্রাহ্মণ গৃহশূন্য!

ব্রাহ্মণের কয়েক বিঘা নিষ্কর জমি আছে। তাহা অপরে ভাগে চাষ করিয়া অর্দ্ধেক ধান্য এবং বিচালী পৌষ মাঘ মাসে ব্রাহ্মণের গৃহে তুলিয়া দিয়া যায়। ব্রাহ্মণের যজমান, শিষ্য নাই, নিজেও চাষবাস করেন না। এ সব করিবার তাঁহার সময় হইয়া উঠে না! ব্রাহ্মণ পরের কাজ লইয়াই ব্যস্ত—নিজের কাজ করিবার তাঁহার সময় নাই। তাঁহার স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতেও তিনি পরোপকার লইয়াই থাকিতেন, গৃহকার্য্যে আদৌ মনোযোগ করিতেন না। তবে গৃহিণীর ভয়ে মাঝে মাঝে তাঁহাকে সাংসারিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইত। গৃহিণীর মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণ স্বাধীন হইয়াছেন, কেবল কন্যাটির জন্য এক একবার গৃহে আসিতে হয়। বৃদ্ধাই কন্যাটির রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এই বৃদ্ধার পরিচয় এ পর্য্যন্ত কেহ পায় নাই; ব্রাহ্মণ তাঁহার অনুমতি ব্যতীত এক পদও কোথাও অগ্রসর হইত না! বৃদ্ধাকে সেই নির্জ্জন কুটীরখানি

ব্যতীত কেহ কখন কোথাও যাইতে দেখে নাই! ব্রাহ্মণ যখন "মা! মা!" বলিয়া বৃদ্ধার চরণ-যুগলের দিকে চাহিয়া চীৎকার করিত, তখন তাহার হৃদয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সপ্তসিন্ধু উথলিয়া উঠিত! বৃদ্ধা দেবী না মানবী! বৃদ্ধার অন্য পরিচয় আমরা এ পর্য্যন্ত পাই নাই, সুতরাং পাঠকও তাহা পাইবেন না! মেয়েটিকে বৃদ্ধা প্রাণের অধিক ভালবাসে। ব্রাহ্মণের নাম গঙ্গাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি "গাঙ্গুলী ঠাকুর" বলিয়াই সে দেশে পরিচিত! বিষ্ণুপুরের আবালবৃদ্ধবণিতা গাঙ্গুলী ঠাকুরকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকে। কেহ কেহ গাঙ্গুলী ঠাকুরকে পাগল ঠাকুর বলিত। তাঁহার বাহিক ধরণ-ধারণ ক্রিয়াকার্য্য কতকটা পাগলেরই মত ছিল! নিজের স্বার্থের দিকে না চাহিয়া, নিজ সাংসারিক কার্য্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, নিজ সুখ স্বচ্ছন্দের জন্য অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা না করিয়া—যে পরের কার্য্য লইয়াই থাকে, তাহাকে লোকে "পাগল ঠাকুর" না বলিয়া আর কি বলিবে? ব্রাহ্মণ সেই বৃদ্ধার আদেশেই পাগলের মত জগতের হিতকল্পে ঘুরিয়া বেড়াইত! ব্রাহ্মণ সেই বৃদ্ধার আদেশেই পরিচালিত—তাহারই পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত। পাঠক! পার্থিব দৃষ্টিত্যাগ করিয়া, একবার চাহিয়া দেখুন, এ বৃদ্ধা কে? আমরা বহু চেষ্টাতেও বৃদ্ধার পরিচয় পাইলাম না।

কেহ বলিল, "গাঙ্গুলী ঠাকুর! আমাদের পুরোহিতের অসুখ!

আজ তোমাকে আমাদের লক্ষ্মীপূজাটা করিয়া দিতে হইবে।” গাঙ্গুলী ঠাকুর স্নান করিয়া লক্ষ্মীপূজা করিতে চলিল। পূজাদি করিয়া আতপ চাউল, রম্ভা গামছায় বাঁধিয়া ভাবিতে লাগিল—আজ কাহার গৃহে অন্নের অভাব, তাহা দেখিতে হইবে। সংবাদ পাইল, গ্রামের শশী পরামাণিক পীড়ায় শয্যাগত—তাহার ছেলেগুলি অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে। গাঙ্গুলী ঠাকুর নাপিতের গৃহে গিয়া, নাপিত-বৌয়ের অঞ্চলে চাল কলাগুলি ঢালিয়া দিয়া বলিল, “ছেলেগুলিকে সকাল করিয়া দুটি রাঁধিয়া দে।”

কেহ আসিয়া বলিল, “অমুকের মা মরিয়াছে, লোকাভাবে দাহ হইতেছে না।” গাঙ্গুলী ঠাকুর মাথায় গামছা বাঁধিয়া ছুটিল। অন্য লোক জুটিল ভালই, নচেৎ একাই মৃতদেহ বুকে করিয়া লইয়া গিয়া শ্মশানে দাহ করিয়া ফেলিল। ব্রাহ্মণের শরীরে বলও অসাধারণ ছিল।

কাহার পীড়া হইয়াছে, লোকাভাবে সেবাশুশ্রূষা হইতেছে না; গাঙ্গুলী ঠাকুর আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রোগীর শিয়রে বসিয়া সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিল। দিনের পর রাত্র, রাত্রের পর দিন এইরূপ কত দিবা রজনী অতীত হইয়া গেল, গাঙ্গুলী ঠাকুরের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই।

এই সব সংবাদ আনিবার জন্য গাঙ্গুলী ঠাকুরের অনেক চর ছিল। গ্রামের নিষ্কর্ম্মা ছেলেরা এই চরের কাজ করিত। গাঙ্গুলী

ঠাকুর তাহাদিগকে মাঝে মাঝে ভোজ দিতেন। যদি তুই একদিন এইরূপ কোন সংবাদ ব্রাহ্মণ না পাইত, তবে তাহার দারুণ মনঃকষ্টে দিন কাটিত। ব্রাহ্মণ বেকার বসিয়া থাকিতে পারিত না। শ্মশানে, বনে, জঙ্গলে, গ্রামের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। পরের জন্য প্রাণপাত করা রোগ, ব্রাহ্মণের পূর্ব্বেও ছিল; তবে সহধর্ম্মিণীর মৃত্যুর পর হইতে ব্যাধিটা খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল কার্য্যে তাহাকে সেই বৃদ্ধা উৎসাহিত করিত। মাঝে মাঝে গাঙ্গুলী ঠাকুর বৃদ্ধাকে বলিত, "মা! তুই আমার এই রোগটা আরও বাড়াইয়া দে।" যদি কোনদিন ব্রাহ্মণের হাতে কোন কাজ না থাকিত, তবে তাহার দুঃখের সীমা থাকিত না; আপনা আপনি মনে মনে বলিত, "ভগবান আমাকে কাজের বাহির করিয়া সৃজন করিয়াছেন! তাঁর সৃজিত এই বিশাল জগতে একটা কাজেও আসি লাগিলাম না! ভগবান কেন যে আমাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাও বুঝিতে পারি না! দেখা হইলে জিজ্ঞাসা করিতাম, এত লোক জগতে রহিয়াছে, আবার আমার মত একটা নিষ্কর্ম্মা লোককে এখানে পাঠাইবার তাঁহার কি প্রয়োজন ছিল?" যে সব লোকে এই প্রকার উদ্ভট চিন্তা করে, তাহাকে সভ্যসমাজ "পাগলা ঠাকুর" বলিবে না কেন?

আজ গাঙ্গুলী ঠাকুর চারিদিন গৃহ হইতে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিল। কয়দিন হাতে কোন কাজ না থাকায়, তৈলাক্ত কৃষ্ণবর্ণ

গামছাখানি মস্তকে বাঁধিয়া গাঙ্গুলী ঠাকুর গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে বৃন্দার আদেশে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কাহারও কোন কাজ না পাওয়ায় মনটায় সুখ নাই। ভ্রমণকালে দেখিল, চিনিবাস জানা বিরসবদনে সেই পথ দিয়া আসিতেছে। ক্রোধ, অভিমান ও ঘৃণায় চিনিবাসের মুখমণ্ডল বিকৃতভাব ধারণ করিয়াছে। জহুরীর রত্ন-পরীক্ষা করিতে যেমন অধিকক্ষণ সময় লাগে না, ঠাকুরেরও তদ্রূপ লোক চিনিতে বিলম্ব হয় না। গাঙ্গুলী ঠাকুর চিনিবাসের হস্তধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন রে বাবা! চিনিবাস! তোর মুখ আজ শুষ্ক দেখ্‌ছি কেন?"

চিনিবাস জানা জাতিতে কৈবর্ত্ত! স্ত্রী ও একটী বিধবা কন্যা লইয়া চিনিবাসের ক্ষুদ্র সংসারটি সুখে-দুঃখে একপ্রকার চলিয়া যাইতেছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ যুবতী বিধবা কন্যার রূপই তাহার কাল হইয়াছে! গ্রামের জমীদার দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ রঘুবর সামন্তের অত্যাচারে সে আজ দেশত্যাগ করিয়া যাইবে। সাত পুরুষের ভদ্রাসন তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, তাই সে আজ পাগলের মত হইয়া বৃন্দার ও গাঙ্গুলী ঠাকুরের চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় লইতে যাইতেছিল।

গাঙ্গুলী ঠাকুরকে দেখিয়া সে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল। পরে বলিল, "খুড়োঠাকুর! আমি তোমাদের চরণেই বিদায় লইতে যাইতেছিলাম।"

স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া গাঙ্গুলী ঠাকুর স্নেহভরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবি রে বাবা ?"

"দেশ ত্যাগ ক'রে আমার পিসীর বাড়ী চলিলাম খুড়োঠাকুর।"

চিনিবাস এই কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

চিনিবাসের হস্ত ধারণ করিয়া গাঙ্গুলী ঠাকুর একটা গাছের ছাওয়ায় যাইয়া বসিল। কয়েক মুহূর্ত্ত চিনিবাসের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দেশ ত্যাগ করবি কি রে? এই গ্রামে তোর সাত পুরুষের ভিটা, সে কি পরিত্যাগ করা যায়! তোর কি সংসারে বড়ই কষ্ট হচ্চে? এ বৎসর তোর ক্ষেতে ফসল অল্পই হইয়াছিল বটে! তা আমাকে এতদিন বলিস্ নাই কেন বাবা! তোরা তিনটে প্রাণী কি না খেতে পেয়ে মারা যাবি? আমার ত অজস্র ধান আছে বাবা! আমার অত ধানের দরকার কি বল্? আমি থাক্‌তে তোর স্ত্রী ও রাজলক্ষ্মী অন্নাভাবে ক্লেশ পাইবে, তাও কি কখন হয়? তোর ভাবনা কি বাবা?" বলা বাহুল্য চিনিবাসের বিধবা কন্যাটির নাম রাজলক্ষ্মী।

গাঙ্গুলী ঠাকুরের স্নেহসিক্ত ও সহানুভূতিপূর্ণ বাক্যে চিনিবাসের বিষাদক্লিষ্ট হৃদয় উথলিয়া উঠিল, দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া চিনিবাস বলিল, "না খুড়োঠাকুর! আমি পেটের জন্য আমার সাত পুরুষের বাস ত্যাগ করিয়া যাইতেছি না! দুর্ব্বাঘাস খাইয়াও বাপের ভিটায় মরিতে

পারিলে সুখে মরিতাম। আমি দেশ ত্যাগ করিতেছি—মানের জন্য, আমার অকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক আরোপিত হইবে—সেই ভয়ে; অর্থ থাকিলেই কি গরীবের উপর অত্যাচার করিতে হয় খুড়ো ঠাকুর!" চিনিবাস চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা গাঙ্গুলী ঠাকুরকে বলিয়া শেষে বলিল—

"কাল রজনী দ্বিপ্রহরের সময় আমাকে কাছারি ঘরে জমিদারের পাইক ধরিয়া লইয়া গিয়া কত প্রলোভন দেখাইল! ক্রোধে, ঘৃণায়, ও লজ্জায় আমার সর্ব্ব-শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। একবার ভাবিলাম, যে মুখে আমার কন্যার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতেছে, সেই পাপ মুখে সজোরে দুই লাথি বসাইয়া দি! পরিণামে মৃত্যু—তাহা না হয় জমিদারের হাতেই হইবে; কিন্তু ঠাকুর, কেবল তোমার বৌয়ের মায়ায়, আর মেয়েটার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া প্রতিশোধ লইতে সাহসী হইলাম না। ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলাম, "আমি গরীব বলিয়া তুমি আমায় অপমান করিতে সাহসী হইলে; কিন্তু বেশ জানিও, গরীবের উপর এত অত্যাচার তোমার সহিবে না! উপরে ভগবান আছেন, তিনিই ইহার বিচার করিবেন। রাজলক্ষ্মী আমার সতী! সতীকে ভগবানই রক্ষা করিবেন। এই বলিয়া চলিয়া আসিয়াছি।"

চিনিবাস ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

গাঙ্গুলী ঠাকুর ধীরভাবে সকল কথা শুনিয়া, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল! মুখ গম্ভীর, চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। বহুক্ষণ সে নির্ব্বাক রহিল।

গাঙ্গুলী ঠাকুর একবার উঠিয়া দাঁড়াইল। আবার বসিয়া পড়িয়া গভীর চিন্তামগ্ন হইল! এরূপ বিষম সমস্যায় সে বুঝি আর কখনও পড়ে নাই! অনেকক্ষণ চিন্তার পর তাহার মুখে হাসি দেখা দিল; এই বিপদের কথাতেও হাসি! এই জন্যই বুঝি গাঙ্গুলী ঠাকুরকে লোকে "পাগলা ঠাকুর" বলে।

গাঙ্গুলী ঠাকুর বলিল, "চিনিবাস! গাঙ্গুলী ঠাকুর বাঁচিয়া থাকিতে, কাহার সাধ্য সতী রাণী রাজলক্ষ্মীর অঙ্গস্পর্শ করে? তুই নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে যা।"

গাঙ্গুলী ঠাকুরকে সকলেই চিনিত। চিনিবাসও তাঁহার স্বভাব ভালরূপ অবগত ছিল; কিন্তু দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার রঘুবর সামন্তের গ্রাস হইতে ক্ষুদ্র দরিদ্র ব্রাহ্মণ কি করিয়া রাজলক্ষ্মীকে উদ্ধার করিবে, ইহা সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

গাঙ্গুলী ঠাকুর কৃত্রিম ক্রোধ ও বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিল, "আবার তুই ভাবছিস? আমার কথা তোর বিশ্বাস হ'ল না?"

চিনিবাস ভয়ে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেল।

গাঙ্গুলী ঠাকুর সেই বৃক্ষতল হইতেই নিরুদ্দেশ হইল। কেহ আর তাহাকে দেখিতে পাইল না। তবে একদিন একটা লোক

গভীর রজনীতে তাহাকে জমিদার রঘুবর সামন্তের অন্তঃপুর হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়াছিল।

দুইদিন পরেই জমিদারের লোকজন আসিয়া, গভীর রজনীতে চিনিবাসের বাটী আক্রমণ করিল। তাহারা তাহার বিধবা কন্যার গৃহে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে বলপূর্ব্বক ধৃত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মী তখন প্রকৃত উন্মাদিনী। সে বজ্রস্বরে বলিল "সাবধান! আমার কেহ অঙ্গস্পর্শ করিস্ না! কোথায় যাইতে হইবে বল্, আমি স্বেচ্ছায় যাইতেছি।"

অদূরে বেহারারা পাল্কী লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। বিধবা যাইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে পাল্কীতে উঠিল। বেহারারা প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল। গ্রামবাসী এই অত্যাচারে কোনও প্রকার বাধা দিল না। অসীম শক্তিশালী ভূস্বামীর সহিত প্রতিকুলাচরণ করিবে —এমন ক্ষমতা কাহারও নাই। কাজেই বিনা বাধায় এই অত্যাচার হইয়া গেল। চিনিবাস একবারমাত্র বলিল, "ভগবন্! তোমার অভিষ্ট পূর্ণ হউক।" তারপর তাহার রোরুদ্যমান স্ত্রীকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিল।

পাঠক! পল্লীগ্রামে এই সকল ঘটনা তখন প্রায়ই ঘটিত। প্রবলের অত্যাচারে গ্রাম ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইত। শত সহস্র যুবতী, স্বামীর বক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব হারাইত। পশুবলের নিকট কাহারও সাধ্য থাকিত না—যে ইহার প্রতিকার

করে। এখনও গ্রাম অন্বেষণ করিলে এই প্রকার জমিদার অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রায় এক ক্রোশ দূরে একটি উদ্যানে আসিয়া সেই পাল্কী থামিল। উদ্যানের মধ্যে একটি পুষ্করিণী ও তাহার চারিদিকে ফল-ফুলের গাছ ছিল। উদ্যানে কোনও প্রকার গৃহ ছিল না—কেবল-মাত্র একখানি উদ্যান-রক্ষকের ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর ছিল। জমিদারের দুইজন পাইক বিধবাকে সেই ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে বলিল। বিধবা বিনা আপত্তিতে গৃহের মধ্যে গিয়া উপবেশন করিল। তাহারা চাবি বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে, জমিদার রঘুবর সামন্ত চাবি খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। গৃহ অন্ধকার! পাষণ্ড স্বহস্তে দীপ জ্বালিল!

রমণী বস্ত্রাঞ্চল চক্ষে দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আপনি কে? যদি আপনার স্ত্রী-কন্যা থাকে, আমার সতীত্ব রক্ষা করুন। যদি আপনার সতীর গর্ভে জন্ম হইয়া থাকে, তবে আমায় উদ্ধার করুন। সতীর সতীত্ব নাশ করিলে গৃহ জ্বলিয়া যাইবে—বংশে বাতি দিতে কেহই থাকিবে না। এখনও চন্দ্র-সূর্য্যের উদয় হই-তেছে, সাবধান আমার সতীধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিও না—এত পাপ পৃথিবী কখনই সহ্য করিবেন না।"

জমিদার রঘুবর এই কণ্ঠস্বর শুনিয়া, সহসা বিস্ময়ে চীৎকার

করিয়া উঠিল! তাহার চক্ষু ভয়ে বিস্ফারিত হইল এবং মস্তকের কেশ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। বিস্ময়ে আবেগে সে চক্ষে অন্ধকার দেখিল। মনে মনে ভাবিল, সে জাগ্রত না স্বপ্ন দেখিতেছে; বিকট চীৎকার করিয়া সে বলিল—"একি? বিনোদ! তুমি এখানে? কে তোমাকে এখানে আনিল?"

"আপনারই নিয়োজিত বেহারা, পাইক?"

"কেন! তোমাকে আনিল কেন?"

"রাজলক্ষ্মী আমার কন্যা, সে আমাকে মা বলিয়াছে। সেইজন্য আমি পথিমধ্যে তাহাকে মুক্ত করিয়া রক্ষা করিয়াছি। তোমার বেহারারা অর্থলোভে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে লইয়া আসিয়াছে।"

"যথেষ্ট হইয়াছে! আর বলিতে হইবে না, আমার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে! এতদিনে আমার জ্ঞান-চক্ষু ফুটিয়াছে; আর এই জঘন্য পথে আমি কখনও যাইব না! রাজলক্ষ্মী কেবল তোমার কন্যা নয়, আজ হইতে সে আমারও গর্ভধারিণী।"

জমিদার রঘুবর সামন্ত সহধর্ম্মিণী বিনোদবালাকে লইয়া গৃহে ফিরিল। সেইদিন হইতে তাহার যথার্থই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। পত্নীর মধুর আকর্ষণে তস্করও সাধু হয়—নরহত্যাকারীও পাপ-মুক্ত হয়। ভারতে সতীর মহিমা এই প্রকার—সতী মনে করিলে অসাধ্য সাধন করিতে পারে।

পাঠক বুঝিতে পারিলেন কি, কে এই সতী-লক্ষ্মীকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিল? কাহার উপদেশে এই সতী-শিরোমণি আদর্শ জমিদার-পত্নী আর এক রমণীর সতীত্বরত্ন রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন? এ সকলই সেই গাঙ্গুলী ঠাকুরের চক্রান্ত। তিনিই রাত্রিযোগে জমীদার-ভবনে প্রবেশ করিয়া, সতীকে সতীর সহায়তা করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন। গাঙ্গুলী ঠাকুরের নিকট সকল বাটীর দ্বারই উন্মুক্ত ছিল। সামান্য গৃহস্থ হইতে জমিদার পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার মহানুভবতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অবাধে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দিত। এই রাজলক্ষ্মীর সতীত্ব রক্ষা করিয়া গাঙ্গুলী ঠাকুর আজ চারিদিনের পর গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে রামপ্রসাদকে এই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া তিনিই তাহাকে বহন করিয়া নিজ গৃহে লইয়া আসেন।

এই ঘটনার পর জমিদার রঘুবর সামন্ত ও তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী গাঙ্গুলী ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং পরে তাঁহারই উপদেশানুসারে চলিয়া একজন আদর্শ ধার্ম্মিক জমিদার হইয়াছিলেন। তাঁহার দানশীলতার কথা এখনও বিক্রমপুর অঞ্চলে বংশপরম্পরায় কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে এই পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত যে সমস্ত কথা বর্ণিত হইল, তাহার সহিত এই পুস্তকের সম্পর্ক অতি অল্প। ভবরাম বৃদ্ধার কুটীর হইতে যে সমস্ত কাগজপত্র প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন, ইহা তাহারই সার মর্ম্ম। এই কয়টি পরিচ্ছেদের সহিত ঝালেরিয়ার যথেষ্ট সংস্রব আছে। পাঠক তাহা ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"মা! তুই এই তিন বৎসরের মধ্যে কি করিয়া গীতা পাতঞ্জল কণ্ঠস্থ করলি! আমি এ পর্য্যন্ত উহার একটা শ্লোকও ভাল বুঝিতে পারিলাম না।"

"আমিই কি সমস্ত শ্লোকের গভীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি মা! শ্লোকের মধ্যে কি গভীর অর্থ নিহিত আছে, তাহা মহাপুরুষ ব্যতীত অন্যে কে বুঝিবে?"

"তুই ত গীতা পড়িবার সময় তন্ময় হইয়া যাস্! সেই অবস্থায় আমি তোর মুখের দিকে অনিমেষ-নয়নে চাহিয়া থাকি। মনে হয়, তুই তখন যেন মহামায়া! কি এক দিব্য জ্যোতিতে তোর মুখখানি যেন উদ্ভাসিত হইতে থাকে।"

"মা! সংসার-ত্যাগী আদর্শ সন্ন্যাসীর চরণতলে বসিয়া গীতা পাঠ না করিলে, শ্লোকের গূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। যদি সেই মহাপুরুষ—আমাদের গুরুদেব কখন দয়া করিয়া দর্শন দেন, তবে গীতা পাঠ করিয়া মনের সাধ পূর্ণ করিব। ভগবান জানেন, আর গুরুদেবই জানেন, সে সাধ ইহজীবনে পূর্ণ হইবে কি না?

মা! গীতা হিন্দু শাস্ত্রের সার রত্ন। শ্রীভগবানের মুখ-নিঃসৃত

বলিয়া ইহা যোগী-ঋষির হৃদয়সর্ব্বস্ব ধন! যোগী ব্যতীত গীতার অর্থ কেহই জ্ঞাত হইতে পারেন না। গীতার অর্থ বুঝিতে পারিলে ষড়্‌দর্শন, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেরই তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়। জ্ঞান, ধর্ম্ম, পুণ্য, যোগ মাহাত্ম্য সকলই গীতা পাঠে হৃদয়ঙ্গম হয়। যাঁহারা সিদ্ধ পুরুষ, তাঁহারাই গীতার অর্থ বুঝিতে পারেন। পণ্ডিতগণ যাহা গীতার অর্থ করেন, তাহা অনেকটা চিনি না খাইয়া, চিনির আস্বাদ-বর্ণনার মত অলীক! বেদ-বেদাঙ্গ প্রভৃতি কণ্ঠস্থ করিয়া যাঁহারা পণ্ডিত উপাধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা চিনি কি বস্তু শুনিয়াছেন বটে; কিন্তু তাহার আস্বাদ কখনও গ্রহণ করেন নাই! সুতরাং অন্ধ হইয়া অন্ধকে কি করিয়া পথ দেখাইবেন মা! যোগীরাই চিনির আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং গীতার অর্থ যোগী ব্যতীত অন্যের বুঝাইবার সাধ্য নাই। সেদিন একখানি সংস্কৃত গ্রন্থে এক রাজার উপাখ্যান পাঠ করিতেছিলাম। তিনি তপ, ধ্যান, দান, যজ্ঞ করিয়া কিছুতেই শান্তি পান নাই। গীতার শ্লোকগুলি তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, তত্রাচ তিনি সুখ শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে এক সন্ন্যাসীর কাছে গীতা পাঠ করিয়া তিনি হৃদয়ে শান্তি লাভ করেন। মা! নিজে বন্ধন-মুক্ত না হইলে কেহ কি গীতার প্রকৃত অর্থ কাহাকেও বুঝাইতে পারে? আমি ক্ষুদ্রমনা নারী হইয়া গীতার অর্থ কি বুঝিব মা?"

নারিকেলডাঙ্গার একটী ত্রিতল অট্টালিকায় বসিয়া উভয়ের

কথোপকথন হইতেছে। উভয়েই স্ত্রীলোক। একজন দুই সন্তানের জননী। অপরা কুমারী! গৃহদ্বারে একটী মর্ম্মর-প্রস্তরে লেখা আছে "রামময় আশ্রম।" অট্টালিকার অধিকারিগণ তাঁহাদের স্বর্গীয় পিতৃদেবের পবিত্র স্মৃতিরক্ষার জন্য এই অট্টালিকা উৎসর্গ করিয়াছেন।

অট্টালিকার ভিতরে প্রবেশ করিলেই মনে হয়, ভারতের প্রাচীন রীতি-নীতি বুঝি এই অট্টালিকার মধ্যে চারিদিকে পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিতেছে। প্রাঙ্গণে একটী তুলসীমঞ্চ স্থাপিত রহিয়াছে, সুগন্ধি ধূপ ধূনার পবিত্র গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত। প্রতি গৃহেই দেব-দেবীর ছবি। দেখিলেই হৃদয়ে সাত্ত্বিক ভাব ও ভক্তিরসের উদ্রেক হয়। কুমারী এক প্রহর রাত্রি থাকিতে শয্যাত্যাগ করিয়া দেব-দেবীর পূজার্চ্চনার আয়োজন করেন। ত্রিতলের একখানি গৃহ পূজার উপকরণেই পূর্ণ! ফুল, চন্দন, তুলসী, ধূপ, ধূনা, গুগ্গুল, তাম্রকুণ্ড, কোশা ও কুশী, পুষ্পপাত্র, পঞ্চপ্রদীপ, শঙ্খ, ঘণ্টা, ঘৃতপ্রদীপ, কুশাসন, মৃগচর্ম্ম, শ্বেত ও রক্তচন্দন কাষ্ঠ, চন্দনপীড়ি, হোম কাষ্ঠ, ঘৃত, মধু, কুশ, দূর্ব্বা, চণ্ডী, গীতা, ভাগবৎ, আতপ তণ্ডুল, ফলমূল, মিষ্টান্ন কত নাম করিব! হিন্দু-দেবদেবীর পূজার্চ্চনার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, সমস্তই এই গৃহে সুসজ্জিত রহিয়াছে। গৃহে চর্ম্ম-পাদুকার ব্যবহার নাই। গৃহবাসীর বিজাতীয়

বেশভূষা নাই। সকলেরই পরিধানে গৈরিক বসন। পাদুক লইয়া কেহ কখন এই ভবনে প্রবেশ করিতে পায় না। মৎস্য, মাংস, পলাণ্ডু প্রভৃতি হিন্দুর অখাদ্য অস্পৃশ্য কখনও এ গৃহে প্রবেশ করে না। একবেলা নিরামিষ আতপ অন্ন দেবদেবীর ভোগ হইয়া থাকে! ক্ষুন্নিবৃত্তি ও দেহ রক্ষার জন্য একবার মাত্র সেই প্রসাদ, গৃহবাসী সকলেই ভক্তিভরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। রাত্রে দেবদেবীর প্রসাদ দুগ্ধ ও ফলাদি এই গৃহে স্ত্রী, পুরুষ, বালক মাত্রেই গ্রহণ করেন। সাত্ত্বিক ভাবে সকলেই জীবন যাপন করিতেছেন! পোষাক, পরিচ্ছদ, বিলাস, ও অনা বশ্যক-খাদ্যাদির ব্যয় না থাকায়—ভারতের চিরপ্রসিদ্ধ অভাব রাক্ষসী এ গৃহে প্রবেশ করিতে পায় নাই। ব্যাধি, পীড়া, অম্বল, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, বহুমূত্র, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি কলিকাতার ব্যাধিগুলি এ গৃহে কখনও প্রবেশ করে নাই। সকলেরই শরীর সুস্থ, সবল ও কর্ম্মঠ। সকলেই এই প্রকারে কঠোর নিয়ম সকল প্রতিপালন করিয়া একান্তচিত্তে ভগবদ্ আরাধনা করিয়া থাকেন। তাহাদের মুখশ্রী কি যেন এক অপরূপ সুষমায় সর্ব্বদা দীপ্তি পাইতে থাকে। জগৎ হইতে তাহারা যেন স্বতন্ত্র। তাহাদের আচার-ব্যবহার, চাল চলন, শিক্ষা-দীক্ষা, সকলই বিভিন্ন। পল্লীর প্রত্যেক লোকই এই বাটীর অধিবাসীদিগকে এক প্রকার শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

প্রাতে ও সন্ধ্যায় এই গৃহের সকলেই করযোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, "হে ভগবন্! ভারতের প্রাচীন রীতি-নীতি ঘরে ঘরে প্রচলিত হউক, ভারতের গৃহ আবার ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ হউক, বিলাস-ব্যাধি দূর হইয়া যাক্, হিন্দু আবার নগ্নদেহে, নগ্ন-পদে, নগ্ন-মস্তকে বিচরণ করুক, হিন্দু শাস্ত্র গৃহে গৃহে পঠিত হউক, গৃহে গৃহে হোমের পবিত্র অগ্নিশিখা উত্থিত হউক। দেশ আবার দ্বেষ, হিংসা বর্জ্জিত হউক, হিন্দু মিথ্যা, কপটতা বিস্মৃত হউক, সত্য ও ধর্ম্মের জ্যোতিঃ ঘরে ঘরে প্রজ্বলিত হউক, হিন্দুর আলয় পুণ্যময় ও পবিত্র হউক, পূর্ব্বের সমাজ বন্ধন আবার দৃঢ় হউক, হিন্দুর গুরু পুরোহিত পূর্ব্বের ন্যায় শক্তিবান ও নির্লোভ হউক, বিদেশী রীতি-নীতি হিন্দুর গৃহ হইতে দূর হইয়া যাউক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আবার যথার্থই শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ হউক।

পাঠক এই স্ত্রীলোকদ্বয়কে চিনিতে পারেন কি? ইহার ভিতর যিনি সন্তানদ্বয়ের জননী, তিনিই আপনাদের পূর্ব্ব পরিচিতা সাগরবালা। কুমারী—ঝামেরিয়া। অট্টালিকা—ভবরামের সংসারাশ্রম। বিদ্রোহীর বৃদ্ধার কুটীরে যেদিন আপনারা ভবরাম ও ঝামেরিয়াকে দেখিয়াছিলেন, তাহার পর সুদীর্ঘ তিন বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। ভবরাম শ্মশান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কাগজ পত্র সহ ঝামেরিয়াকে সেইদিনেই স্বগৃহে লইয়া আসিয়াছেন। ঝামেরিয়া এখন আর সেই পূর্ব্বের ন্যায়

পার্ব্বতীয় বালিকা নাই। সে সাগরবালার সংস্পর্শে এবং ভবরামের যত্নে এখন আদর্শ বঙ্গবালা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঝামেরিয়া এখন ভবরামের সংসারাশ্রমে বাস করিতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় সে সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞাই আছে, তবে লোকালয়ে বাস করিয়া এখন জগতের অনেক বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে। ঝামেরিয়ার অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মভাব দেখিয়া শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠের জন্য ভবরাম একজন ধার্ম্মিক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ঝামেরিয়ার জ্ঞান, বুদ্ধি, ভগবদ্‌ভক্তি ও বিচার বিশ্লেষণ শক্তি দেখিয়া, ভবরাম আশ্চর্য্য হইয়াছেন। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ও ব্রহ্মতেজসম্পন্ন মহাত্মার কন্যা বলিয়াই ঝামেরিয়া বুঝি সাধারণ স্ত্রীলোক হইতে এই প্রকার উচ্চাসনে অবস্থিত। সে যাহা কখনও শিক্ষা করে নাই, যে কথা কেহ তাহাকে কখন বুঝাইয়া দেয় নাই,—যে সব শাস্ত্রগ্রন্থ কখন পাঠ করে নাই, সে সকলের তাৎপর্য্য সে সুন্দররূপে বুঝাইতে পারে। ভবরাম কখন মনে করেন, ঝামেরিয়া দৈবশক্তিসম্পন্না অদ্ভুত বালিকা। কখন ভাবেন, ঝামেরিয়া মানবী নহে—বাস্তবিকই দেবী। ঝামেরিয়াকে গৃহে আনয়ন করা অবধি তাঁহার সংসারাশ্রম আরও পবিত্র ও উজ্জ্বলভাব ধারণ করিয়াছে! বুঝি কুমারী গৌরী স্বয়ং বালিকামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া হিমালয় হইতে নামিয়া আসিয়া, ভবরামের সংসারকে হিন্দুর আদর্শ-সংসারে পরিণত

করিয়াছেন। ভবরাম উপযুক্ত পাত্রের হস্তে ঝামেরিয়াকে অর্পণ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছেন—ঝামেরিয়াকে কত প্রকারে বুঝাইয়াছেন, সাগরবালা ঝামেরিয়াকে কত অনুনয়-বিনয় করিয়াছে; কিন্তু সে বিবাহ করিতে কিছুতেই স্বীকৃত হয় নাই। বিবাহের নামেই ঝামেরিয়ার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হয়। সে বলে—"কেন আপনারা আমাকে সংসার-বন্ধনে বাঁধিয়া অযথা দুঃখ দিবেন! বিবাহের নামে আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে। কে যেন আমার কাণে কাণে বলে—বিবাহ করিলে তোমার ব্রত উদ্‌যাপন হইবে না, সংসারে সাধারণ স্ত্রীলোক যাহা করে, তোমাকে তাহা করিতে হইবে না। সন্তান গর্ভে ধারণ করিবার জন্য ভারতে রমণীর অভাব নাই! তুমি একা বিবাহ না করিলে ভগবানের সৃষ্টির কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না। তবে কেন তুমি তোমার জীবনের ব্রত পণ্ড করিবে?"

বিবাহ কি, বিবাহ কাহাকে বলে, বিবাহের ফলাফল কি—পূর্ব্বে এ সব ঝামেরিয়া কিছুই বুঝিত না! এখন সে বিবাহের উদ্দেশ্য কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছে।

বিবাহে ঝামেরিয়াকে বীতরাগ দেখিয়া এখন ভবরাম বা সাগরবালা কেহই আর সে কথা উত্থাপন করে না। বিবাহ না করিয়া যদি ঝামেরিয়া বিমল সুখশান্তির অধিকারিণী হয়, তাহাই হউক, ভগবানের যদি ইহাই অভিপ্রেত হয়, তবে তাঁহারই

মঙ্গল-ইচ্ছা পূর্ণ হউক। ঝামেরিয়ার বিবাহের কল্পনা এখন আর ভবরাম বা সাগরবালার হৃদয়ে মুহূর্ত্তের জন্য উদিত হয় না।

সাগরবালার সহিত ঝামেরিয়ার ভগবদ্ গীতা লইয়া আলোচনা হইতেছিল। দিবা অবসানপ্রায়, রবি অস্তগমনোন্মুখ। ঝামেরিয়া বলিল, "চল মা! সন্ধ্যা-আহ্নিক ও আরতির আয়োজন করি বাবা এখনই সন্ধ্যাবন্দনাদির জন্য গৃহে আসিবেন।"

ঝামেরিয়াকে ভবরাম ও তাহার কনিষ্ঠ করুণাময় "মা" বলেন। সেও ভবরামকে বাবা ও করুণাময়কে কাকা বলে। ঝামেরিয়া সাগরবালাকে মা বলিয়া সম্বোধন করে। সাগরবালা ঝামেরিয়াকে কখন মা-লক্ষ্মী, কখন বা আদর করিয়া ঝামেরি বলিয়া ডাকেন। তিনি তাহাকে নিজের কন্যা অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করেন। ঝামেরিয়াও সাগরবালাকে নিজ গর্ভধারিণী অপেক্ষা অধিক ভক্তি সম্মান করে। ভবরামের সন্তান দুইটি ঝামেরিয়ার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। ভবরামের বর্ত্তমান জ্যেষ্ঠ পুত্র ফকু ঝামেরিয়াকে না দেখিলে মুহূর্ত্তের জন্য কোথাও স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। ঝামেরিয়া যেন স্নেহ-ভালবাসার কঠিন নিগড়ে ফকুকে হৃদয়ের সহিত বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, তাহাকে এরূপভাবে বাঁধিতে বুঝি তাহার জননী সাগরবালাও পারে নাই।

ঝামেরিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিক ও আরতির আয়োজন করিবার জন্য

উঠিয়া গেল। সাগরবালাও তাহার সঙ্গে যাইতেছিল; কিন্তু স্বামীকে আসিতে দেখিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল।

ভবরামের আর পূর্ব্বের মত বেশভূষা নাই। নগ্নপদ, নগ্নদেহ, রুক্ষ কেশ, গৈরিক বসন---তাহাও আবার জানুর উপরে অবস্থিত।

ভবরাম আসিয়াই সাগরবালাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা কোথায়?"

সাগরবালা বলিল, "মা-লক্ষ্মী সন্ধ্যারতির উদ্যোগ করিতে গিয়াছে।"

"তুমি যাও নাই কেন?"

"আমিও যাইতেছিলাম, আপনি আসিতেছেন দেখিয়া দাঁড়াইয়া আছি।"

সাগরবালা তাড়াতাড়ি একখানি কুশাসন আনিয়া স্বামীকে বসিতে দিল।

স্বামী উপবেশন করিলে, সাগরবালা ভবরামের পদপ্রান্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "আপনি কি আজ শ্রান্ত হইয়াছেন? আমি দুই একটি কথা আজ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব।"

ভবরাম নতমুখী সাগরবালার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কি কথা বল! আমি ক্লান্ত হইলেও সাধ্যমত তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব।"

সাগরবালা বলিতে লাগিল—

"আমি ক্যামেরিয়ার আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি।

তিন বৎসরের মধ্যে মা আমার কি করিয়া দুরূহ শাস্ত্রগ্রন্থগুলি কণ্ঠস্থ করিল? কেবল কণ্ঠস্থ নয়, শাস্ত্রগ্রন্থের যথার্থ তাৎপর্য্য গুলি যাহা মা আমার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে, তাহা আমি এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। আজ ঝামেরিয়া আমাকে কত যোগের কথা বুঝাইতেছিল। সে বলিতেছিল যে, প্রাণায়াম ব্যতীত মন ও ইন্দ্রিয়গণ স্থির হয় না। প্রথমে প্রাণায়াম অভ্যাস করা উচিত। প্রাণায়ামের দ্বারা প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, এমন কি সমাধি পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। প্রাণায়ামাদি যোগ-ক্রিয়ার অভাবেই ভারত আজ শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছে। পুঁথি গত শাস্ত্রালোচনায় ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় না। এক যোগবলেই জীব সে জ্ঞানলাভ করিতে পারে। যোগিগণ যোগবলে শত যোজন দূরের কথা এক নিমেষে জানিতে পারেন। এই প্রকার কত যোগের কথা আজ আমাকে বুঝাইতেছিল। আমি সে সব কথার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারি নাই। ঝামেরিয়া কিরূপে এই বয়সে এ সমস্ত আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে? আমি দুই বৎসর প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, ঝামেরিয়াও আমার মনের উন্নতির জন্য কত চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলাম না। আমার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে কেন? আর মা-লক্ষ্মী আমার অতি সহজেই ভগবদ্ আরাধনার পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে কিরূপে? ইহার ভিতর কি কোন গূঢ় কারণ আছে?"

ভবরাম বলিলেন, "এই কথাটা কি তুমি বুঝিতে পার নাই ?"

সাগরবালা সাগ্রহে স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল, "বুঝিবার জন্যই আজ আপনার আশ্রয় লইয়াছি।"

ভবরাম বলিলেন, "আচ্ছা! তবে আমি বুঝাইতেছি। তোমার মন বেশ স্থির আছে ত ?"

সাগরবালা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন। ভবরাম বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"শুন সাগরবালা! তুমি বলিলে অনেক চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু কার্য্যে অগ্রসর হইতে পার নাই ; কিন্তু মা আমার বিনা চেষ্টায় বা স্বল্পায়াসেই প্রাণায়াম বা শাস্ত্রাদির মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলেই এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিতে। আমরা গতজীবনে যেরূপ কার্য্য করিয়া আসিয়াছি, ইহজীবনে তদ্রূপ ফলভোগ করিতেছি। আবার ইহজীবনে যেরূপ কার্য্য করিব, পরজীবনে সেইরূপ ফলভোগ করিতে হইবে।"

সাগরবালা বলিল, "আমরা গতজীবনে কি করিয়াছি না করিয়াছি, তাহার প্রমাণ কি ? কি করিয়া আমরা গতজীবনের কথা বুঝিব ?"

ভবরাম গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "বহু প্রমাণ আছে ; কিন্তু প্রমাণ দিয়া কি হইবে সাগরবালা ? হিন্দুশাস্ত্রে মহা মহা ঋষিগণ

যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা কি মিথ্যা কথা? তাঁহাদের তুলনায় আমরা যে কত নগণ্য ক্রিমিকীট—তাহা কি আবার বলিতে হইবে? যোগী-ঋষিরা কখন মিথ্যাবাদী ছিলেন না, ইহা যদি বিশ্বাস করিতে পার, তবে তাঁহাদের বাক্যের একটি বর্ণও যে মিথ্যা নহে, ইহা কেন বিশ্বাস করিবে না? সেদিন ত ঝামেরিয়া—মা-লক্ষ্মী তোমাকে মহাভারত পড়িয়া বুঝাইতেছিল—

"মৎস্যোহ যথা স্রোত ইবাভি পাতী,
তথা কৃতং পূর্ব্বমুপৈতি কর্ম্ম।
শুভে ত্বসৌ তুষ্যতি দুষ্কৃতে তু,
ন তুষ্যতে বৈ পরমঃ শরীরী॥

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব।

মৎস্য যেমন স্রোতের দিকে ছুটিয়া যায়, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মগুলিও সেইরূপ মনুষ্যের পশ্চাতে ছুটিতে থাকে। গীতা হইতেও এই সব কথা মা তোমাকে প্রত্যহই ত বুঝাইয়া থাকে। তুমি কি সব ভুলিয়া গেলে সাগরবালা?

"পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে যে সৌভাগ্য সঞ্চিত হয়, সেই সৌভাগ্যই তাহাকে ইহজন্মে শুভফল প্রদান করিয়া থাকে। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, "পূর্ব্বজন্ম ধৃতং বিদ্যা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং ফলম।" চৈতন্যদেব ষড়বিংশ বৎসর বয়সে সমগ্র ব্যাকরণ, ন্যায়, সাংখ্য, কাব্য প্রভৃতি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকটে বড় বড়

পণ্ডিত তর্কে পরাস্ত হইয়াছিল। বেশী দিনের কথা ছাড়িয়া দাও—ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব কখনও শিক্ষা-মন্দিরের দ্বারে গমন করেন নাই, অথচ তাঁহার নিকট কোনও শাস্ত্র কি অবিদিত ছিল? তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি এবং অমৃতউৎসরূপী বাক্যসুধা সকলেই পান করিয়া বিমোহিত হইত। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অতি অল্প বয়সেই সমগ্র শাস্ত্রগ্রন্থ আয়ত্ত করিয়া গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। তাঁহার যুক্তি-তর্কে কত বড় বড় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতগণ পরাজিত হইয়াছিলেন। তাই বলিতেছি, বিদ্যালাভ পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি না থাকিলে হয় না। মায়ের আমার পূর্ব্বজন্মের সৌভাগ্য সঞ্চিত ছিল, তাই সে ধর্ম্মের পথে—যোগের পথে—ভগবদ্ আরাধনার পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। তোমার পূর্ব্বজন্মের সৌভাগ্য নাই, তাই চেষ্টা করিয়াও অগ্রসর হইতে পারিতেছ না। মায়ের আমার সুকৃতি ছিল বলিয়াই সে ভগবৎভক্ত তেজস্বী একনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তুমি বলিলে—কি করিয়া গতজীবনের কথা বুঝিবে?

"কেন বুঝিবে না! চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পার। হয় নিজে উপযুক্ত হও, স্বচক্ষে গতজীবনের ঘটনা দেখিতে পাইবে। না হয় যোগীঋষির কথা বিশ্বাস কর। নিজেও দেখিবে না, শাস্ত্রের কথাও শুনিবে না? তবে তুমি কি করিবে? আমি যদি তোমায় বলি, "আজ গঙ্গায় একখানা বড় জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে।"

যদি আমার উপর তোমার বিশ্বাস থাকে, তবে তুমি তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে। আর সে বিশ্বাস যদি না থাকে, তাহা হইলে হয় ত পরীক্ষা করিবার জন্য নিজে যাইয়া দেখিয়া আসিবে। দুটির একটিও করিবে না, কেবল মুখে বলিবে —হিন্দুশাস্ত্র মিথ্যা, পূর্ব্বজন্ম নাই, দেব-দেবী নাই, পাপ-পুণ্য নাই; যোগ-ধ্যান নাই, হিন্দুধর্ম্মে কিছুই নাই। ইহা কেবল তোমার দোষ নয় সাগরবালা! এই দোষেই ভারত রসাতলে যাইতেছে। বেদ-বিধি যদি মিথ্যা হয়, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম যদি মিথ্যা হয়, পাপ-পুণ্য যদি মিথ্যা হয়, ইহজন্ম, পরজন্ম, কর্ম্মফল এ সমস্ত যদি মিথ্যা হয়, তবে সত্য কি? সত্য কি কেবল আহার-বিহার অর্থোপার্জ্জন রোগ-শোকের দাহন আর মৃত্যু! তাহা হইলে ভগবান যিনি আপনার আদর্শ লইয়া মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই মানবে ও পশুতে কি প্রভেদ রহিল। পশুরা এই সকল করিয়া থাকে বলিয়া তাহারা হেয়—আর মানব পশু-প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্ররূপে কার্য্য করে বলিয়া তাহারা শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মফলে মানব সুখ ও দুঃখ লাভ করিয়া থাকে। এ কথা তোমায় বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি, মনযোগ সহকারে শুন।

"পণ্ডিতগণ বলেন, মানবগণ কৃত কর্ম্মের দ্বারা ফলভোগ করিয়া থাকে। সকলেই কর্ম্মাধীন। কেহই ইহার উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারে না। কর্ম্মফলে দেখিবে এক

জন অন্ধ, খঞ্জ, বিগলিতাঙ্গ ভিক্ষুক রাস্তায় বসিয়া কাতরস্বরে ভিক্ষা করিতেছে, আর একজন দিব্য আরামে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে সিগারেটের ধূম উদ্গীরণ করিয়া, মোটর হাঁকাইয়া সুখে গমন করিতেছে। গতজন্মে মানব যে প্রকার কর্ম্ম করে, পরবর্ত্তী জন্মে তাহাকে সেই প্রকার ফলভোগ করিতেই হইবে। কর্ম্মের স্তূপরাশি ভেদ করিয়া যদি শৈশবের কথা বাৰ্দ্ধক্যে মনে পড়ে, তবে গতজন্মের কথা ইহজীবনে মনে পড়িবে না কেন? হৃদয়ের মলিনতা দূর কর, স্বচ্ছ হৃদয় হইতে গতজীবনের কর্ম্মরাশির প্রতিবিম্ব আপনি আসিয়া পড়িবে। যোগীরা বহু জীবনের কথা জানিতে পারেন। গতজীবনে আমরা যে যেরূপ কার্য্য করিয়াছি, ইহজীবনের কর্ম্মের আদর্শ দেখিয়া স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে পূর্ব্বজীবনের কর্ম্মের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। ইহজীবনে কেহ বাল্যকাল হইতেই চোর, কেহ ধার্ম্মিক, কেহ সাধু, কেহ লম্পট, কেহ মিথ্যাবাদী, আবার কেহ ধর্ম্মভীরু বা অধার্ম্মিক হয়। ইহার কারণ কি? কেন এরূপ ঘটে? মানব মাত্রেই ভগবানের সৃষ্ট জীব। তবে এ তারতম্য কেন—তবে এ সৃষ্টিবৈচিত্র্য কেন?

"যে কারণে এই সব হয়, সেই কারণেই আমাদের মা ম্যালেরিয়া আমাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়া যাইতেছে। তিন বৎসরের মধ্যে মা আমার যে এত

উচ্চে উঠিয়াছে, ইহা বর্ত্তমানকালের হিন্দুরা বিশ্বাস করিবে না, বা বিশ্বাস করিতে পারে না। পূর্ব্বজীবনে যে যতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, ইহজীবনে সে সেই কর্ম্মস্তূপের উপর আসিয়া দণ্ডায়মান হয়। সুকর্ম্মের ফলেই নর-নারী, যোগী-ঋষি বা মহাত্মগণের গৃহে জন্মগ্রহণ করে। কেহ বা রাজার গৃহে রাজপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, কেহ বা ভিখারী গৃহে জন্মলাভ করিতেছে। কেন এরূপ হয়? পূর্ব্বের কর্ম্ম সঞ্চিত না থাকিলে কখন কি এরূপ হইতে পারে? মা ঝামেরিয়া পূর্ব্বে এসব করিয়াছিল, তাই ইহজীবনে সেগুলি স্বল্পায়াসে আয়ত্ত করিয়াছে! তোমার করা ছিল না, তাই অগ্রসর হইতে পারিতেছ না। একথা বুঝিবার ত বিশেষ কোন গোল নাই। তুমিও কর্ম্মবীজ রোপন কর, জন্ম-জন্মান্তরে কোনদিন না কোনদিন এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষে পরিণত হইবে এবং কালে সেই বৃক্ষ ফলে ও ফুলে সুশোভিত হইয়া বিশাল বনস্পতির আকার ধারণ করিবে।

"সাগরবালা! সুকর্ম্ম বা কুকর্ম্মের ফল কখন বৃথা যায় না! কর্ম্মফল যাহারা স্বীকার করে না, তাহারা যে কেবল হিন্দু নয় তাহা নহে। তাহারা পশু অপেক্ষাও অধম। আমি ব্রহ্মহত্যা করিলাম, পরস্ব অপহরণ করিলাম, পরদার গমন করিলাম, গায়ের জোরে পরের ধন কাড়িয়া লইলাম। আমায় কেহ কিছু করিতে পারিল না। মিথ্যা কপটতার জয়ডঙ্কা বাজাইয়া দিন দিন আমি

পার্থিব উন্নতি-শিখরে উঠিতে লাগিলাম। লোকে ভাবিল, পাপ পুণ্য নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই; কিন্তু ইহাদের পূর্ব্ব কর্ম্মের জোর আছে বলিয়া এত অধর্ম্মের উপরেও সুখভোগ করিতেছে! সময় না হইলে কোন কার্য্যই হয় না। জন্ম-জন্মান্তরের পর যখন সময় আসিবে, কর্ম্মফল ভোগ হইবে। এই হিন্দুশাস্ত্রের কথা কখনই মিথ্যা হইবার নয়। আমাদের শাস্ত্র বলিতেছে—

যস্মিন বয়সি যৎকালে যা দিবা যচ্চ বা নিশি।
যন্মুহূর্ত্তে ক্ষণে বাপি তত্তথান চদন্যথা।

যে বয়সের সময়, যে দিন বা রাত্রে, যে মুহূর্ত্তে যে কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, ঠিক সেই দিনে বা মুহূর্ত্তে সেই কর্ম্ম অবশ্য ঘটিবে। আমাদের কর্ম্মফল বরাবর সঞ্চিত হইয়াই আসিতেছে। সেই কর্ম্মফলগুলি পরে পরে আমরা জীবনে ভোগ করিয়া আসিতেছি মাত্র। এই জন্যই যোগিগণ যোগবলে কু ও সুকর্ম্মের ফলাফল অবগত হইয়া মানবের কল্যাণের জন্য বহু শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। কোন্‌টি সুকর্ম্ম, কোনটিই বা কুকর্ম্ম, শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভারতের রীতি-নীতির যে প্রচলন ছিল, তাহা এই শাস্ত্র হইতেই গৃহীত। তাঁহারা যে সব বিধি-নিষেধ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা মানবের কল্যাণের জন্য। সে সব আমরা ত্যাগ করিতেছি বলিয়াই আমাদের এই অধঃপতন। নতুবা হিন্দু আমরা,—ব্রাহ্মণ আমরা, আমাদের আবার অভাব দুঃখ কি?

হিন্দুশাস্ত্রের আদেশ ব্যতীত হিন্দুকে কোন কার্য্য করিতে নাই ; কিন্তু আমরা শাস্ত্রোপদেশ না মানিয়া মনগড়া ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া লইতেছি। পাছে হিন্দুকে কুকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়, এই জন্য ঋষিগণ আমাদিগকে সংযত রাখিবার জন্য বেদ-বিধির সৃজন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিশ্বপ্রেমিক ও জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন বলিয়াই শত সহস্র বর্ষের তপস্যার অভিজ্ঞতার ফল মানবকে দান করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু হিন্দুর এখন এমনই দুরাদৃষ্ট যে, সেই উপকারী ঋষিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দূরে থাকুক,—তাঁহাদের বেদবিধি না মানিয়া সব মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেয়! ভাবে না যে কাহার মঙ্গলের জন্য তাঁহারা এই জীবনব্যাপী যোগ-তপস্যার ফলস্বরূপ এই অমূল্য গ্রন্থরাজি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

"সাগরবালা! কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্যই আমাদিগকে বার বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যদি কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে না হইত, তাহা হইলে আমাদিগকে জন্মগ্রহণ করিতে হইত না।

> দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ।
> দেহান্তর মনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ॥
> ব্রজং তিষ্ঠন্পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি।
> যথাতৃণ জলৌকৈবং দেহী কর্ম্ম গতিং গতঃ॥
>
> (ভাগবত—১০ স্কন্ধ।)

ইহার মর্ম্মানুবাদ এই যে,—যাহার যেরূপ কর্ম্ম, সেই কর্ম্মানুসারে

দেহী, সেইরূপ একটা দেহকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করে; অর্থাৎ যাহার যেরূপ কর্ম্মফল, সে সেই প্রকারে জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকে। কেহ চণ্ডালের গৃহে, কেহ ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিতেছে, কেহ জন্মাবধি বাল্যকাল হইতে চোর হয়, কেহ বা যৌবনে উপনীত হইতে না হইতেই লম্পট বা কামুক হয়, কেহ বা বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মপথের পথিক হয়। কেহ বা শিশুকাল হইতেই পূজা অর্চ্চনা করিতে ভালবাসে। কেহ বা শিশুকাল হইতেই প্রতিবাসীর লাউ-কুমড়া চুরি করিতে অভ্যস্ত হয়। গীতাতে স্বয়ং ভগবান্ নিজ মুখে বলিয়া গিয়াছেন, "যে যেরূপ মনভাব লইয়া দেহ-ত্যাগ করে, দেহান্তে সে সেইরূপ দেহই প্রাপ্ত হয়।" ইহার উপরেও কি "পূর্ব্বজন্ম" বা "কর্ম্মফল" মিথ্যা বলিবে সাগরবালা? ঋামেরিয়া কেন যে আমাদিগকে দূরে রাখিয়া যোগের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, তাহা কি এখন বুঝিতে পারিলে? ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়,
নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরানী বিহায় জীর্ণা—
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

(গীতা, ২য় অধ্যায়।)

জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া মানুষ যেরূপ নূতন বস্ত্র পরিধান করে, দেহীও তদ্রূপ জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করে। অর্থাৎ যাহার যেরূপ কর্ম্মফল, সে তদ্রূপ দেহই ধারণ করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তুমি যদি স্থিরচিত্তে অর্থাৎ প্রাণায়ামাদির দ্বারা চিত্তচাঞ্চল্য দূর করিতে পার, তবে গত জীবনের ও পূর্ব্ব কর্ম্মের প্রতিবিম্ব তোমার স্বচ্ছহৃদয়ে চাক্ষুষ দেখিতে পাইবে। তখন আর তোমাকে সন্দেহ-দোলায় দুলিতে হইবে না। তাহা যদি না পার, তবে যাঁহারা চাক্ষুষ দেখিয়াছেন, সেই ঋষিদের কথার উপর—তোমার প্রণম্যদিগের উপর, সর্ব্বশেষে হিন্দুশাস্ত্রের উপর অটল বিশ্বাস স্থাপন কর। চন্দ্র, সূর্য্য, দিবারাত্র, পাপ ও পুণ্য যেরূপ সত্য, জন্মান্তর কর্ম্মফলও তদ্রূপ সত্য।

"সাগরবালা! তুমি মহাতপা বশিষ্ঠদেবের কথা বিশ্বাস করিবে না, আজকালকার ভোগসর্ব্বস্বদেহ, আচারভ্রষ্ট, হিন্দুশাস্ত্রানভিজ্ঞ, অহংভাবাপন্ন হিন্দুর কথা বিশ্বাস করিবে? কুকর্ম্মের ফলে—মানুষ, পশু, পক্ষী এমন কি ক্রিমিকীট হইয়া জন্মগ্রহণ করে! বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিতেছেন:—

"দেবত্ব মথমানুষ্যং পশুত্বং পক্ষিতাং তথা।
ক্রমিত্বং স্থাবরত্বঞ্চ যায়ন্তে চ স্বকর্ম্মভিঃ॥"

অর্থাৎ মনুষ্য স্ব স্ব কর্ম্মফলানুসারে—স্থাবর, পশু, পক্ষী, দেব, মনুষ্য, ক্রিমিকীটরূপে জন্মগ্রহণ করে। কর্ম্মফলের কি শক্তি বুঝিলে?

"ভাগ্যানি পূর্ব্ব তপসা কিল সঞ্চিতানি।
কালে ফলন্তি পুরুষস্য যথৈব বৃক্ষাঃ॥"

অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মের তপস্যার ফলে যে সৌভাগ্য সঞ্চিত হয়, তাহা যথা সময়ে বিনা চেষ্টায় বা স্বল্পায়াসে বৃক্ষ সমূহের ন্যায় ফল প্রসব করে। আমাদের ঝামেরিয়া পূর্ব্বে কার্য্য করিয়া রাখিয়াছিল, তাই ইহজন্মে সুফল প্রাপ্ত হইতেছে—ইহা বুঝা ত কঠিন নহে সাগরবালা? হিন্দুশাস্ত্রে অগাধ শ্রদ্ধা বিশ্বাস রাখিতে পারিলে এরূপ সন্দেহ তোমার মনে আর কখনও আসিতে পারিবে না।"

"বাবা! আপনি এখনও বসিয়া আছেন? সন্ধ্যা যে উত্তীর্ণ হইয়া গেল।"

ঝামেরিয়া দেবগৃহে সন্ধ্যা-আহ্নিকের সমস্ত আয়োজন করিয়া ভবরামের অপেক্ষা করিতেছিল, বিলম্ব দেখিয়া ডাকিতে আসিয়া দেখিল, ভবরাম সাগরবালার সহিত ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেছে।

ঝামেরিয়ার আহ্বানে ভবরাম তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, "যাই মা! এতক্ষণ আমাকে সাগরবালা আটক করিয়া বসাইয়া রাখিয়াছিল।"

সাগরবালা অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "আমিই দোষী বটে মা! আমি শাস্ত্রালোচনা শুনিতে বড়ই ভালবাসি। যখনই শুনি, তখন সেন দিবা কি রাত্রি আমার জ্ঞান থাকে না। স্বামীর অমৃতময় উপদেশ শুনিলে আমার মন উদ্বেলিত হইয়া উঠে। আমি তন্ময়

হইয়া যাই। তখন আর আমার সন্তান ও সংসারের কথা মনে থাকে না—এক্ষণে চল যাইতেছি।”

এই বলিয়া ঝামেরিয়া অগ্রে, মধ্যে সাগরবালা, তৎপশ্চাতে ভবরাম ত্রিতলস্থ দেবারাধনার নির্দ্দিষ্ট গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ভবরাম বলিল, “সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে চলিল, করুণাময় এখনও আসিতেছে না কেন?”

ঝামেরিয়া বলিল, “কাকা বহুক্ষণ আসিয়াছেন—তিনি আপনার জন্য দেবগৃহে অপেক্ষা করিতেছেন। আমার ফকুও কাকার কাছে একটি ছোট কুশাসনের উপর যোড়হাত করিয়া বসিয়া আছে।”

ঝামেরিয়ার কথা শুনিয়া ভবরামের হৃদয় আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। অনুজ করুণাময় পূর্ব্বে বড়ই অনাচারী ছিল। ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া বিদেশীভাবাপন্ন দুর্নীতিপরায়ণ বন্ধু-বান্ধবের সাহচর্য্যে উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিল। ভ্রাতার অবস্থা দেখিয়া ও পরিণাম ভাবিয়া ভবরাম মধ্যে মধ্যে শিহরিয়া উঠিতেন। এমন দিন যাইত না—যেদিন ভবরাম এইজন্য ভগবানের নিকট নীরবে অশ্রুপাত না করিত। এতদিনে ভবরামের প্রতি দেবতা সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। প্রাণের অনুজ করুণাময় স্বগৃহে ও স্ব-ধর্ম্মে ফিরিয়াছে। তাহার মোহ ঘুচিয়াছে—সে বন্ধুদের পরিত্যাগ করিয়াছে। করুণাময় এখন যোগের পথে, ধর্ম্মের পথে

অগ্রসর হইতেছে। বিলাসিতার হৃঙ্কারজনক পীড়া করুণাময়কে আর স্পর্শ করিতে পারে না, সুপথ একবার যে দেখিতে পাইয়াছে, সে কি আর জন্ম-জন্মান্তরে উহা পরিত্যাগ করিতে পারে? করুণাময় পূর্ব্বেই গিয়া আসনে বসিয়াছে—ম্যামেরিয়ার নিকট এই কথা শুনিয়া, বিমল আনন্দে ভবরামে আনন্দপূর্ণ হইল। তাহার মুখমণ্ডল কি যেন এক স্বর্গীয় ভাবে পরিপূর্ণ হইল।

তিনজনে গৃহে প্রবেশ করিয়া করুণাময়ের পার্শ্বে স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন। সেই গৃহ ধূপধূনার গন্ধে আমোদিত। গৃহে প্রবেশ করিলেই মন যেন কি একপ্রকার পবিত্র ভাবে পূর্ণ হয়। ভবরাম আচমনাদি করিয়া প্রথমতঃ বেদমাতা গায়ত্রীর ধ্যান করিতে লাগিল। গায়ত্রীর ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতেই সে বাহ্যজ্ঞান হারাইল!

হায়! ব্রাহ্মণ হইয়া বেদমাতা গায়ত্রীর নামোচ্চারণ বুঝি এখন আর কেহ করে না! এ কথা মনে হইলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়—চক্ষের জল সংবরণ করা যায় না! লিখিতে হস্ত অবশ হইয়া যাইতেছে। গায়ত্রীই যে ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্বধন! গায়ত্রীই যে ব্রাহ্মণের প্রাণায়াম। ওঁ ভূঃ (মূলাধার), ওঁ ভুবঃ (স্বাধিষ্ঠান—লিঙ্গমূল), ওঁ স্বঃ (মণিপুর—নাভিদেশ)! এইরূপ ব্রাহ্মণের গায়ত্রীতেই মূলাধারস্থ অপান বায়ুকে ক্রমান্বয়ে ষট্চক্র ভেদ করিয়া সহস্রাধারে বিনা অবরোধে স্থির করিয়া রাখা যায়। ইহাতেই ব্রাহ্মণের

কোটী সূর্য্যের ন্যায় তেজোবিশিষ্ট বিমল জ্যোতিঃ পরমব্রহ্মের দর্শনলাভ হয়।

ইহা কিরূপ বুঝাইবার উপায় নাই। সাধক যিনি, তিনিই ইহা জানেন। জিহ্বায় আস্বাদ না করিলে মিষ্টতা যে কি, তাহা বুঝান যায় না। বড়ই দুঃখের বিষয়, ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ আজকাল বিদেশীভাবে বা বিদেশী শিক্ষায় এতই অধঃপতিত হইয়াছেন যে, বেদমাতা গায়ত্রী পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তৈলাক্ত, মলিন ছিন্ন যজ্ঞপবীত স্কন্ধ হইতে কটীদেশে নামাইয়া আনিয়াছেন। আজকাল—"আমি ব্রাহ্মণ" এ কথা বলিয়া কেহ কাহাকেও পরিচয় দেয় না! হিন্দুর শিরোভূষণ ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব কুলাঙ্গারগণ এখন "বোনার্জ্জি", "চেটার্জ্জি", "মুখার্জ্জি" নামে অভিহিত হইয়া পুণ্যাত্মা পিতৃপুরুষগণের উজ্জ্বল মুখে দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিতেছে! আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অভিসম্পাতেই বুঝি ভারতের আজ এই দুর্দ্দশা!

বহুদিনের একটি গল্প মনে পড়িল। একজন শিক্ষিত ভদ্র মাতালকে একজন শিক্ষিত ব্রাহ্মণ উপদেশ দিতেছেন, "বাপু! সুরা পান করিও না! সুরাপানকারীদের নরকে বাস হয়।" মাতাল বলিল, "অমুক রাজা, অমুক মহারাজা, অমুক জমিদার ইহারা আমার চেয়ে বেশী মদ খায়। আমার বেশী পয়সা জোটে না, প্রায়ই খাটি খাই! [illegible] ইহাদের অগাধ পয়সা, ইহারা

বিলাতি খান, তবে সখ করিয়া মাঝে মাঝে খাঁটী খান। তা' ভট্টাচার্য্য মহাশয়! ইহারা সবাই নরকে যাবে ত?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ধর্ম্মের কাছে কি পয়সাওলা আর গরীব আছেরে বাবা! শাস্ত্রে বলে সুরাপান করিলেই নরকগামী হইতে হইবে; তা বড় লোকই হউক, আর গরীবই হউক।" মাতাল স্ফূর্ত্তিভরে বলিল, "তবে আর ভাবনা কি? নরক ত গুলজার হবে।"

যাহারা যোগী-ঋষির বংশধর হইয়া—ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া, হিন্দুর আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিতেছে—গায়ত্রী, ইষ্টমন্ত্র, পূজার্চ্চনা প্রভৃতি হিন্দুর কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, বিদেশীর অনুকরণে পিতৃপুরুষের উপাধী ত্যাগ করিয়া, আপন নাম নিজ হইতে ঘোষিত করিতেছে, তাহারাও হয় ত ভাবে "আমাদের নরক ত গুলজার! ভয় কিসের?" ইহারা পৈত্রিকধর্ম্ম, পিতৃদত্ত নাম, পৈত্রিক আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি কিছুই জানে না! স্বর্গ নরক মানে না! পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করে না! আবার মরিতে হইবে, ইহাও বুঝি ভাবে না! ভাবে যে কি তাহা বুঝান কঠিন!

"আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ,
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মোহিতেষামধিকো বিশেষো,
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"

আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন মানবেরও আছে, পশুরও আছে; কেবল ধর্ম্মকার্য্যের গুণেই মানব পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহাদের শেষোক্ত কার্যটিরই একবারে অভাব হইয়াছে। বিকৃত শিক্ষায় হিন্দু আজ জাতিত্ব হারাইয়াছে। ব্রাহ্মণ দিনান্তেও বোধ হয় একবার ভগবানের নাম স্মরণ করে না। শিশ্লোদর—লোভপরায়ণ—স্বার্থপর—সংকীর্ণমনা—নীচ প্রভৃতি যাবতীয় বিশেষণ এই কলির ব্রাহ্মণের অঙ্গের ভূষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেহবিলাসী—ভোগবিলাসী—হিন্দুর সন্তান হইয়া পাশ্চাত্যের দুষ্ট অনুকরণে—আমাদের দেহ ও মন পুষ্ট হইতেছে—আমাদের আদর্শ নাই—উদ্দেশ্য নাই—লক্ষ্য নাই—সীমাহীন—অন্তহীন—দুর্নীতির মহার্ণবে আমরা ভাসিয়া চলিয়াছি। আমাদের কলঙ্ক—আমাদের অধঃপতন-কাহিনী কি কাহারও জানিতে বাকী আছে? আমরা হিন্দুসন্তান হইয়া, ঋষির বংশধর হইয়া, পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, বিবির নিকট বেদের ব্যাখ্যা শুনিতেছি। আমরা এখন গৈরিকধারী সন্ন্যাসীর নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা করি না। এখন ঘাঘরা-সুশোভিত বিবির মুখকমল হইতে বাগবিন্যাস শুনিতে আমরা সদাই অভিলাষী। আমাদের বেদের বিলাতী অনুবাদ না পড়িলে জ্ঞানলাভ হয় না—আমরা উহা বুঝিতে পারি না। গীতাপাঠে এখন অধিকার ও অনধিকারের ভেদবোধ কমিয়া গিয়াছে। এখন পাশ্চাত্য শিক্ষা

প্রভাবে বহু হিন্দুসন্তান হিন্দুর অধিকার ও অনধিকার সম্বন্ধে নিগূঢ় তত্ত্ব ভুলিয়া যাইতেছে। গীতাপাঠের অধিকারী না হইলে যে, গীতাপাঠকের অপকার হয়, একথা অধুনা বহু হিন্দু সন্তান স্বীকার করে না। অধিকারভেদ হিন্দুধর্ম্মের একটা মূল কথা। অধিকারভেদ মানিয়াই হিন্দুর ধর্ম্ম একই সঙ্গে এমন উদার ও বিচিত্র হইয়াছে। পৃথিবীর কোনও ধর্ম্মে অধিকার ভেদের কথা নাই। হিন্দু যেদিন অধিকারভেদ ভুলিবে, সেইদিন ইহার পতন হইবে। মর্ত্ত্যের মানব ছাড়িয়া দাও—স্বর্গের দেবতা পর্য্যন্ত এই অধিকারভেদ মানিয়া থাকেন। ইন্দ্র ইন্দ্রত্ব পাইয়া ব্রহ্মার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহাতে চতুরানন বলিয়াছিলেন, এখনও তুমি উচ্চ বিদ্যালাভ করিবার অধিকারী হও নাই। অগ্রে দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর, পরে উহা প্রাপ্ত হইবে। ইন্দ্রদেব তাহাই করিলেন—পরে আবার অন্য বিদ্যা প্রার্থনা করাতে এই প্রকার ব্যবস্থা হইল—আবার কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া তিনি অন্য বিদ্যালাভ করিলেন। এই প্রকারে দীর্ঘকাল কঠোর আরাধনার ও ব্রহ্মচর্য্যের পর ইন্দ্রদেব আত্ম-তত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

তাই বলিতেছিলাম, অধিকারী পদ লাভ করিয়াও আজ আমরা দীনহীন কাঙ্গালের ন্যায় পরের কাছে ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকি। আমাদের শাস্ত্রজ্ঞান নাই—গুরুকরণ নাই—দুই চারিখানি অনুবাদ পড়িয়া আমরা হিন্দুধর্ম্মের ভেদ

মানিতে ইচ্ছা করি। হায়! ইহা অপেক্ষা আর অধিক ধৃষ্টতা কি হইতে পারে? ম্যাক্সমুলার এখন অনেকেরই গুরু স্থানীয়। সেই প্রতীচ্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, মনু, কপিল, গৌতম, পাতঞ্জলি, বেদব্যাস, জৈমিনি, নারদ, মরীচি, বশিষ্ঠ ও অন্যান্য ঋষিগণ যে জাতির গুরু—সে জাতি জ্ঞানোন্নতির জন্য কোন্ পাশ্চাত্য শিক্ষকের নিকট যাইবে? এই কথা কি কেহ মানিয়া চলিবেন? আমাদের শাস্ত্রে কি আছে, যদি তাহা জানিবার যথার্থ অভিলাষ থাকে—সদ্‌গুরু অন্বেষণ কর—দেখিবে তিনিই তোমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিয়া দিবেন। গুরুর নিকট উপদেশ পাইলে অধিকার তত্ত্ব তোমার আয়ত্ত্ব হইবে। তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে তুমি দিব্যজ্ঞান লাভ করিবে; কিন্তু এ অন্বেষণ করিবার প্রবৃত্তি কাহারও নাই। আমরা যদি বাস্তবিকই ব্যগ্রচিত্তে তাহাই অন্বেষণ করিতাম, তাহা হইলে আজ আমাদের এ দুরবস্থা হইত না। আমরা অল্পবুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞানহীন—তাই বেদমাতা গায়ত্রীর অবমাননা করিতেছি—হিন্দুর দেবদেবীকে—হিন্দুর আচার ব্যবহারকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেছি। ধর্ম্মের ভাণ করিয়া বিষম অনর্থ ঘটাইতেছি। অধুনা তীর্থস্থান, দেবমন্দির, মসজিদ, গির্জ্জা প্রভৃতি সকল স্থানই নিকুঞ্জবনরূপে ব্যবহৃত হয়। কেহ একবার চিন্তা করে না যে, এই দেহ অনিত্য—এই বিরাট্ সংসার অসত্য—এক ফুৎকারে জীবন দীপ নিবিয়া যাইবে। আজকাল সে শিক্ষা নাই, সে দীক্ষা

নাই, প্রবৃত্তি-দমনের চেষ্টা নাই, সংযমাভিলাষ নাই, মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি নাই। নব্যসম্প্রদায় একেবারে বিলাতী বিলাসী বাঙ্গালী! কি ভীষণ পরিবর্ত্তন! এক শতাব্দীতে বাঙ্গালীর এই অবস্থা হইয়াছে। আর অর্দ্ধ শতাব্দী পরে বাঙ্গালী জাতি বলিয়া কিছু থাকিবে কি?

* * * *

বহুক্ষণ পরে ভবরামের গায়ত্রী জপ শেষ হইল। তাহার পর সকলে আবার ভগবদ্ ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। সকলেরই চক্ষু নিমীলিত। দেহ নিশ্চল, অসাড়, ঠিক যেন সমাধিপ্রাপ্ত এবং বাহ্যজ্ঞান বিরহিত। পাঠক! এ অবস্থা লিখিয়া বুঝাইবার নয়। চিত্ত-চাঞ্চল্য ও পার্থিব চিন্তা মন হইতে দূর করিয়া নির্জ্জনে ভগবৎ ধ্যানে রত হও, তুমিও এই অবস্থার বিমলানন্দ উপভোগ করিতে পারিবে। ভবরাম, করুণাময়, ঝামেরিয়া ও সাগরবালার বহুক্ষণ এই অবস্থায় অতীত হইয়া গেল। ভবরামের আত্মজ শিশু ফকু সকলের দেখাদেখি এইরূপে চক্ষু মুদিয়া থাকিতে থাকিতে অবশ অঙ্গে ক্রমে নিদ্রাদেবীর শান্তিময় ক্রোড়ে ঢুলিয়া পড়িল।

রজনী এক প্রহরের পর সকলের ধ্যান ভঙ্গ হইল। দুগ্ধ ও ফলাদি নৈবেদ্যগুলি ভবরাম ভক্তিসহকারে ভগবানকে উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে করুণাময়, ঝামেরিয়া ও সাগরবালা করযোড়ে স্তব করিতে লাগিলেন। ভক্তি-অশ্রুতে তাঁহাদের

বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। নৈবেদ্যাদি উৎসর্গ করিতে রজনী দেড় প্রহর অতীত হইয়া গেল। এইবার তাঁহারা ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতে লাগিলেন, পাঠাদি সমাপ্ত হইতে রজনীর দ্বিতীয় যাম অতীত হইল।

সাগরবালা স্বামীর অনুমতি লইয়া আহারের আয়োজন করিতে গেলেন। কুশাসনের সম্মুখে একখানি করিয়া কদলী-পত্র। তাহার উপর দেবতার প্রসাদ দুই চারিখানি শশা, রম্ভা, চারিটি মুগের ডাইল, কাঁচা গুড় ও মৃৎভাণ্ডে দুগ্ধ। ভবরাম ও করুণাময়ের আহারের পর সাগরবালা ও ঝামেরিয়া আহার করিল।

আহারাদির পর সকলে আবার একস্থানে উপবেশন করিলেন। করুণাময় এই সময়ে সাংসারিক ও কারবারাদির কথা অগ্রজকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ভবরাম যথোপযুক্ত উত্তর দিয়া শেষে বলিলেন, "ভাই করুণাময়! সংসারে যাহাই কর না কেন

"প্রাতঃপ্রভৃতি সায়ান্তং সায়াদিপ্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগত্যর্থে তদস্তু তব পূজনং॥"

প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত জগতের জন্য যাহা কিছু করিতেছি, সমস্তই যেন তোমার পূজা বলিয়া গণ্য হয়, এই কথাটি ভাই কখনও বিস্মৃত হইও না। আমাদের গ্রামের সেই রাখাল ছুতরের মা এক হাতে ধান ভানিত, এক হাতে ঢেঁকির গড়ের ধান্যগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দিত, শিশু

পুত্রটিকে বক্ষে চাপিয়া স্তন দান করিত, মুখে ছেলেটিকে কতই আদরের ছড়া বলিত, কিন্তু লক্ষ্য থাকিত, হাতের দিকে—পাছে ঢেঁকি পড়িয়া তাহার হাতটি চূর্ণ হইয়া যায়। সংসারে সবই করিও ভাই, কিন্তু লক্ষ্য রাখিও উপরের দিকে। কিছু করিব না বলিলেও চলিবে না। পূর্ব্বের কর্ম্মরাশি ক্রমে ক্রমে পুঞ্জীভূত হইয়া জোর করিয়া আমাদিগকে কর্ম্মে নিয়োজিত রাখিবে। এখন রাত্রি গভীর হইয়াছে—তোমরা বিশ্রাম করিতে যাও।"

"মা আমায় ঘুরাবি কত,
যেন চোক-ঢাকা বলদের মত।"

সাধক রামপ্রসাদের এই গানটী গাহিতে গাহিতে ভবরামও শয্যা-গ্রহণ করিতে গেলেন। করুণাময়, ঝামেরিয়া ও সাগরবালা ভবরামের পশ্চাতে পশ্চাতে আপন আপন কক্ষে গমন করিলেন।

প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া ভবরাম, করুণাময়, ঝামেরিয়া ও সাগর-বালা গঙ্গাস্নানে গমন করিতেন। ইঁহারা প্রত্যহই পদব্রজে পাঁচ-দণ্ড রজনী থাকিতে পুণ্যতোয়া জাহ্নবী সলিলে অবগাহন করিয়া গৃহ প্রত্যাগমন করেন। স্নানান্তে পূজার্চ্চনায় রত হ'ন। ভবরাম আজকাল আর কারবারাদি দেখেন না। ধর্ম্মগ্রন্থ ও পূজাদি লইয়াই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। কনিষ্ঠ করুণাময় বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীবর্গকে লইয়া কারবারাদি পরিচালনা করিতেছেন। ভরত যেরূপ শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা মস্তকে রাখিয়া রাজ্য পালন

করিয়াছিলেন, অনুজ করুণাময়ও তদ্রূপ—জ্যেষ্ঠের অনুমতি ব্যতীত এক পদ অগ্রসর হয় না। জ্যেষ্ঠের আদেশ করুণাময় বেদবাক্য অপেক্ষাও অধিক ভক্তি ও আগ্রহের সহিত প্রতিপালিত করে। ইঁহারা ঘোর সংসারী বটে, কিন্তু মন ইঁহাদের সংসারে লিপ্ত নাই। বাহ্যজ্ঞানে করুণাময়কে ঘোর সংসারী, পাকা ব্যবসায়ী বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু করুণাময়ের অন্তঃকরণ প্রকৃতই সন্ন্যাসীর অন্তঃকরণ। "সঞ্চয়" বলিয়া যে কথা আছে, ইহা করুণাময় জানে না। করুণাময় দাদা ব্যতীত সংসারে আর কাহাকেও জানে না! এ শিক্ষা করুণাময় জ্যেষ্ঠ ভবরাম ও বৌদিদি সাগরবালার নিকট পাইয়াছে। সাগরবালার চরিত্রের আভাষ পাঠক পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদেই কতকটা পাইয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ভবরামও বাল্যকাল হইতে "সঞ্চয়" বলিয়া যে অভিধানে কোন শব্দ আছে, তাহা জানেন না। ইঁহাদের কারবারগুলি ধর্ম্মের ভিত্তির উপর স্থাপিত। অধর্ম্মের লেশ মাত্রও ইঁহাদের কারবারগুলিকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না। কারবারে সহস্র সহস্র মুদ্রা লভ্য হইতেছে, কিন্তু সঞ্চয় কাহাকে বলে, ইঁহারা শিক্ষা করেন নাই। হাতে কিছু টাকা জমিয়াছে, জ্যেষ্ঠ ভবরাম বলিলেন, "করুণাময়! জন্মভূমিতে গিয়া স্বর্গীয়া জননীর নামে একটা কিছু করিগে চল।" করুণাময় বলিলেন, "যথাজ্ঞা"। গাড়ি গাড়ি জিনিষ পত্র বোঝাই হইয়া দেশে যাইতে লাগিল। মহাসমারোহে দেব-দেবীর পূজা ও সহস্র সহস্র কাঙ্গালী-ভোজন হইতে

লাগিল। কাঙ্গালিদের রুক্ষ কেশ তৈল-নিষিক্ত হইয়া তৈল ধারায় মৃত্তিকাসিক্ত হইল! সঞ্চিত অর্থগুলি যতক্ষণ না ব্যয় হইল, ততক্ষণ তাঁহাদের মনে শান্তি আসিল না। আজকালের শিক্ষিত সমাজ ইঁহাদিগকে হয় ত পাগল ভাবিবে, আমরাও বলি, ইঁহারা সত্য সত্যই পাগল। পাগল না হইলে কি প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়?

আজকাল ভবরামের নেশা হইয়াছে, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে হিন্দু চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতে হইবে। বিদেশী শিক্ষায় দেশের ভাবী বংশধরদের ধর্ম্ম ও সংযম শিক্ষা হইতেছে না। তাহারা লেখাপড়া শিখিয়া যেন অর্থোপার্জ্জনের যন্ত্র বিশেষ হইতেছে। এখন পিতা মাতা বা অভিভাবকগণ পুত্রদিগকে স্কুলে প্রেরণ করেন, তাহাকে মানুষ করিবার জন্য নয়—নানা রোগের আকর, ধর্ম্ম-বর্জ্জিত হইয়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া বিলাস ভোগ করিবে বলিয়াই যেন বালকেরা আজকাল শিক্ষা-মন্দির সমূহে প্রেরিত হয়। বালকগণকে ইংরাজি স্কুলে পাঠাইয়া জনক-জননী যেন বলিয়া দেন, "বাবা! তোমাকে অল্পায়ু হইতে হইবে, অম্বল, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগে জর জর হইয়া অকালে শমন সদনে যাইতে হইবে, তোমাদের সন্তান-সন্ততি ভূমিষ্ঠ হইলেই যকৃতাদি দুষ্ট হইয়া নানা রোগ দেখা দিবে। এসব এড়াইয়া যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে তোমাদের অপেক্ষাও উহারা অল্পায়ু হইবে। তা' হউক তোমরা বিদ্যাশিক্ষা কর, অর্থোপার্জ্জন কর, ব্রুহাম হাঁকাও, উকিল, ব্যারিষ্টার, ডেপুটি হও—দেখিয়া

আমরা নয়ন সার্থক করি! আর পাশ্চাত্য জাতির মত তোমার স্ত্রী হউক, সেমিজ গাউন পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াক—আমরা আর ক'দিন বাঁচিব, তবু দেখিয়া মরি।”

ভবরাম একদিন কনিষ্ঠ করুণাময়কে ডাকিয়া উপরোক্ত কথাগুলি বলিয়া অবশেষে বলিলেন, “ভাই! দেশের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে ত দেখিতেছ। এখনও চেষ্টা করিলে ভগবানের ইচ্ছায় স্রোত ফিরিতে পারে। দেশে এখন উপযুক্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নাই। যাঁহারা আছেন, তাঁহারা গণনায় মুষ্টিমেয়। অধিকাংশ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতই অর্থোপার্জ্জনের জন্য হা হা করিয়া বেড়াইতেছেন। প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিরল। ন্যায়ালঙ্কার, তর্কালঙ্কার এখন সন্তানদিগকে অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা দিতেছেন। সুতরাং আর্য্যভূমি শ্মশানভূমিতে পরিণত হইতে বসিয়াছে। ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র ডেপুটী হইবে, তর্কালঙ্কারের সন্তান বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবে, সুতরাং তাহাদের হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি মমতা কতটুকু, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? আকাশ ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের এখন আর ঘৃণা লজ্জা নাই, আছে কেবল অর্থ-লালসা। যদি কেহ দেখেন বা না জানেন, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, সকল কার্য্যই ইঁহারা করিতে পারেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, শাস্ত্রে তাহাদের গুণ-ব্যাখ্যা আছে—

"শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥"—গীতা।

এবং পণ্ডিতের লক্ষণ—

"শুনিচৈব শ্বপাকেচ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ"—ইতি গীতা।

যাঁহারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, তাঁহাদের এই গুণাবলী থাকিবে; কিন্তু কৈ? শম, দম, জ্ঞান, আস্তিকতা এসব কোথায়? আস্তিক হইলে কি অর্থ-লালসায় পুত্র-পৌত্রকে বিদেশী ভাবে শিক্ষা দিবার প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে? ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের এখন ব্রাহ্মণত্ব ও পাণ্ডিত্য উভয়েরই অভাব হইয়া পড়িয়াছে—

"যোগস্তপোদমোদানং ব্রতং শৌচং দয়া ঘৃণা।
বিদ্যা বিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতদ্ ব্রাহ্মণলক্ষণম্॥"

যোগ, তপ, দম, দান, ব্রত, শৌচ, দয়া, এ সব এখন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের আছে কি? যদি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের যোগবল থাকিত, তাহা হইলে আবার আমরা বশিষ্ঠের মত গুরু পাইতাম! যোগের অভাবে এখন সকল বিষয়েই অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। যে যোগপ্রভাবে ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানের চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, সে যোগবল ব্রাহ্মণের দেহে আর দেখা যায় না। পূর্ব্বের ব্রাহ্মণগণ সংসার-কীট ছিলেন না, তাঁহারা প্রাণায়াম ও যোগের পথে বিচরণ করিতেন। এই জন্য তাঁহারা অর্থকে ধূলিমুষ্টিবৎ জ্ঞান করিতেন। এই জন্য শক্তিবান দেশপালক তাঁহাদের চরণে ভয়ে লুটাইয়া পড়িত।

তাঁহারা লোভশূন্য, সুস্থ ও দীর্ঘায়ু ছিলেন। সংসার কি করিয়া করিতে হয়, কেন সংসারে আসিয়াছি, পূর্ব্বের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। প্রাণায়ামের ফলাফল জ্ঞাত হইয়া, তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন —

"প্রাণায়ামো মহাধর্ম্মো বেদানামপ্য গোচরঃ।
সর্ব্বপুণ্যস্ত সারোহি পাপরাশিতুলানলঃ॥
মহাপাতক কোটীনাং তৎকোটীনাঞ্চ দুষ্কৃতম্'
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং পাপং নানা দুষ্কর্ম্মপাতকম্।
নশ্যত্যেব মহাদেব ধন্যঃ মোহভ্যাসযোগতঃ॥"

ইহার মর্ম্মার্থ, প্রাণায়াম মহাধর্ম্ম, বেদের অগোচর, পাপরাশি বিনাশক, সকল পুণ্যের সার। প্রাণায়াম দ্বারা কোটি কোটি দুষ্কর্ম্ম, কোটি কোটি মহাপাতক, পূর্ব্ব জন্মের পাপ সকল, নানাবিধ দুষ্কর্ম্ম-জনিত পাতক ধ্বংস হয়। যিনি প্রাণায়াম অভ্যাস করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ ও ধন্য।

"প্রাণায়ামাৎ খেচরত্বং প্রাণায়ামাদ্রোগনাশনম্।
প্রাণায়ামাদ্বোধয়েচ্ছক্তিং প্রাণায়ামান্মনোন্মনী।
আনন্দো জায়তে চিত্তে প্রাণায়ামী সুখীভবেৎ॥"

—ইতি যোগশাস্ত্র।

প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে মন শূন্যমার্গে বিচরণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, প্রাণায়ামের দ্বারা নানা রোগ বিনাশ হয়,

পরমাত্ম-শক্তি উদ্বোধিত হয় এবং দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়া হৃদয় অপার আনন্দে ভরিয়া উঠে।

ভাই! এখন যদিও কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোককে দেখাইবার জন্য সকাল-সন্ধ্যায় চক্ষু মুদিয়া বসেন; কিন্তু তাঁহাদের সম্পূর্ণ মন থাকে অর্থের দিকে। এই জন্য নিজেরাও শান্তি পান না শিষ্য যজমানকেও শান্তির পথ দেখাইতে পারেন না।

আজ তোমাকে পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বের একটি সত্য ঘটনা বলিতেছি। পূর্ব্ববঙ্গে একজন সমৃদ্ধিশালী ধার্ম্মিক জমিদার ছিলেন। তাঁহার বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারী ছিল। জমিদার কিছুতেই শান্তি পান না। তিনি নীরবে সততই চিন্তা করিতেন, দু'দিন পরে চলিয়া যাইতে হইবে; কিন্তু সংসারে আসিয়া করিলাম কি? জমিদার বড়ই গুরুভক্ত ছিলেন। তিনি গুরুকে নিজের অশান্তির কথা জানাইলেন। গুরু বলিলেন, দান-ধ্যান কর, পূজা-অর্চ্চনা কর, মনে শান্তি পাইবে। গুরুদেব বেদ-পাঠ, পুরাণ, শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ফর্দ্দ করিয়া দিলেন। ছয় মাস ধরিয়া ক্রিয়া-কলাপ চলিল। গুরুদেব বড়লোক হইয়া গেলেন। তিনি কার্য্যান্তে গৃহে গিয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণি! তোমার অলঙ্কার পরিবার সাধ ছিল, এইবার তোমায় গা ভরিয়া গহনা দিব।" ব্রাহ্মণীর আহ্লাদের সীমা নাই। এদিকে শিষ্য কিন্তু "যে তিমিরে, সেই তিমিরে।" তিনি ব্যাকুল হইয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন,

"প্রভু! আমায় শান্তির পথ দেখাইয়া দাও।" ভগবানের বুঝি দয়া হইল। যথার্থ ব্যাকুল হইয়া ডাকিলে, তিনি কি স্থির থাকিতে পারেন? একদিন প্রভাতে প্রাণের জ্বালায় জমিদার উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় এক সন্ন্যাসী আসিয়া দর্শন দিলেন। সন্ন্যাসী সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "বাবা! তোমার গুরুদেব নিজেই অন্ধ! তোমাকে পথ দেখাইবে কি করিয়া?" এই বলিয়া সন্ন্যাসী জমিদারকে শান্তির পথ দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। জমিদার সহস্র চেষ্টাতেও আর সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন না। আধুনিক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ স্ত্রীকে গা ভরিয়া গহনা দিবার জন্য ব্যাকুল, সুতরাং শিষ্য যজমানকে শান্তির পথ দেখাইবে কে?

তাই আমি মনে করিয়াছি—পূর্ব্বের ন্যায় উপযুক্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দেশে যাহাতে আবার হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আমি একখানি নিয়মপত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছি শ্রবণ কর। এই বলিয়া ভবরাম পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। শুনিতে শুনিতে আনন্দে করুণাময়ের মুখখানি রক্তিমাভ হইয়া উঠিল।

১। দেশের নানাস্থানে আপাততঃ একশত আদর্শ চতুষ্পাঠী স্থাপিত করিব।

২। একশতজন ধার্ম্মিক ও সংসার-আসক্তি-হীন উপযুক্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত থাকিবেন। ইঁহারা যোগজ্ঞানসম্পন্ন হইবেন।

৩। ইঁহাদের স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণের জন্য ভূমি ও উপযুক্ত বৃত্তির ব্যবস্থা থাকিবে।

৪। ব্রাহ্মণসন্তানগণ যজ্ঞোপবীতের পরেই ব্রহ্মচারী বেশে আসিয়া এই চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইবে।

৫। ছাত্রগণ ষড়্‌বিংশতি বর্ষের পূর্ব্বে সংসারে প্রবেশ করিতে পাইবে না।

৬। ছাত্রগণকে হিন্দুশাস্ত্র ও প্রাণায়ামাদি শিক্ষা দেওয়া হইবে।

৭। ছাত্রগণকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে যে, তাহারা কখন বিনামা বা বিলাসদ্রব্য অঙ্গে ধারণ করিবে না। শীত, গ্রীষ্ম নিবারণার্থ হিন্দুর যাহা আবশ্যক, তাহাই চিরজীবন ব্যবহার করিবে।

৮। ছাত্রগণ শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ সমাপ্ত করিয়া ও প্রাণায়ামাদি যোগমার্গ অবগত হইয়া, চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিবে। এজন্য তাহারা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বৃত্তি প্রাপ্ত হইবে।

৯। ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে ষড়্‌বিংশতি বর্ষের পর হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান্ পবিত্র-কুলোদ্ভব জনক-জননীর সুলক্ষণা কুমারী কন্যাকে সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে।

১০। ছাত্রগণকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে যে, তাহারা এই চতুষ্পাঠীতে তাহাদের নিজ নিজ সন্তানগণকে অধ্যয়ন করাইবে এবং তাহাদিগকে যোগমার্গের পথ অবলম্বন করাইবে।

১১। যাঁহাদের একমাত্র সন্তান, তাঁহারা যদি পুত্রকে চতুষ্পাঠীতে পড়াইতে দেন এবং এই পুত্রের অভাবে তাঁহাদের যদি ভরণপোষণের কষ্ট হয়, তাহা হইলে যতদিন না তাঁহাদের সন্তান উপযুক্ত হইয়া অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে, ততদিন তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য উপযুক্ত বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইবে।

ভবরাম কনিষ্ঠ করুণাময়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"ভাই! এই পর্য্যন্ত লেখা হইয়াছে। আরও অনেকগুলি নিয়ম ইহাতে সন্নিবেশিত করিতে হইবে। কয়েকজন যোগরত সন্ন্যাসীর চরণ-প্রান্তে নিবেদন জানাইয়া যাহাতে তাঁহারা এই কার্য্যের সহায় হ'ন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি ভারতের সুদিন সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে—তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা নিভৃত স্থান হইতে আসিয়া এই কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।"

কনিষ্ঠ করুণাময়ের মুখখানি চিন্তাক্লিষ্ট হইল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "দাদা! ইহা বর্ত্তমানকালে বড়ই ব্যয়সাপেক্ষ।"

ভবরাম হাসিয়া বলিলেন, "ভগবানের ইচ্ছা হইলে কিসের অভাব হইবে ভাই? তাঁহার ইচ্ছা হইলে এখনই ভারতে লক্ষ লক্ষ চতুষ্পাঠীর সৃষ্টি হইতে পারে! দেশের কত রাজা, মহারাজা, কত ক্রোড়পতি বিলাসস্রোতে কত অর্থ ভাসাইয়া দিতেছে! ভগবানের যদি ইচ্ছা হয়, তবে হয় ত কালে তাহাদেরও

সুবুদ্ধির উদয় হইতে পারে! আমাদের সঙ্কল্প তাহারা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবে।”

সাগরবালা ও ঝামেরিয়া একাগ্রচিত্তে এই সমস্ত শুনিতেছিলেন। সাগরবালা সহসা স্বামীর সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—“আমার দেহের সমস্ত অলঙ্কার ও যাহা কিছু সঞ্চিত আছে, সে সমস্তই আমি এই সৎকার্য্যে দান করিব।”

ঝামেরিয়া বলিল, “বাবা! আপনি একদিন বলিয়াছিলেন, যিনি আমাকে সহোদরার স্নেহে প্রতিপালিত করিয়াছেন, তিনি আমায় কিছু দান করিয়া গিয়াছেন। তাহা যদি আমার প্রাপ্য হয়, তাহা হইলে আমি আজই সেগুলি আপনার এই মহৎ কার্য্যে অর্পণ করিলাম।”

সাগরবালা ঝামেরিয়ার কথা শুনিয়া স্বামীকে অভিমানভরে বলিলেন, “কৈ! আপনি ত ঝামেরির অবশিষ্ট কাগজগুলি আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন না? মহাত্মা রামপ্রসাদের জীবনের বাকী অংশটুকু যে কাগজখানিতে লেখা আছে, সেখানি আপনি গোপন রাখিয়াছেন কেন?”

ভবরাম হো হো করিয়া হাসিয়া কনিষ্ঠের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “করুণাময়! শুনিলে তোমার বৌদিদির অভিমানের কথা! হিন্দুর স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গিনী, সহোদর এক পিতামাতার সন্তান—এক আত্মা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তোমাদের কাছে কি আমার

কিছু গোপনীয় আছে? তোমাদের কাছে কোন কথা গোপন রাখিলে আত্ম-প্রবঞ্চনা করা হয়। তবে কি জান, সেই কাগজ-খানিতে ঝামেরিয়াকে কিছু দানের কথা আছে। টাকা-কড়ি লইয়া হাঙ্গামা করা আমার আর ভাল লাগে না। বিশেষতঃ, মা ঝামেরি যে পথে যাইতেছে, তাহাতে তাহার টাকার কোনই প্রয়োজন নাই। যদি ঝামেরির গর্ভে আমার পৌত্র-পৌত্রীর আশা থাকিত, তাহা হইলে না হয় আবার একটা ঝঞ্ঝাট বাড়াইতাম। মা ঝামেরি যাহা লাভ করিতেছে, তাহার নিকট পার্থিব ধনসম্পদ অতি তুচ্ছ! মহাত্মা রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের কথা নিজ হস্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহা যখন তোমরা শুনিতে ইচ্ছুক, তখন আজই শুনাইতেছি।”

এই বলিয়া ভবরাম করুণাময়কে ঝামেরিয়া-সংক্রান্ত কাগজপত্রগুলি লৌহ-সিন্দুক হইতে বাহির করিতে আদেশ করিলেন। করুণাময় তৎক্ষণাৎ উহা বাহির করিয়া আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মহাত্মা রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় গৃহত্যাগ করিবার পরে অবশিষ্ট জীবনের কথা যে কাগজখানিতে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেইখানি কাগজের স্তূপ হইতে বাছিয়া লইয়া ভবরাম পাঠ করিতে লাগিলেন :—

"অশ্বত্থ বৃক্ষতল হইতে আমার সংজ্ঞাশূন্য দেহ উঠাইয়া লইয়া গিয়া মহাত্মা গঙ্গাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় সেবা-শুশ্রূষায় আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ যথার্থই সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। আত্মগোপন করিয়া, জানি না কি উদ্দেশ্যে তিনি সংসারে বাস করিতেন। তাঁহার সংসারে এক বৃদ্ধা ছিলেন। বৃদ্ধা অজ্ঞেয় শক্তিসম্পন্ন, আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম না। ইঁহাদের আশ্রয়ে আসিয়া মানুষ কি করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করে, ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কি ইত্যাদি বিষয় বুঝিতে পারিলাম। বৃদ্ধার আদেশে ব্রাহ্মণের নিকট আমি দীক্ষিত হইলাম। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি-ফলে সেই মহাপুরুষকে আমি গুরুরূপে পাইয়াছিলাম। নচেৎ আমাকে সংসারাবদ্ধ কীটরূপে থাকিতে হইত। আমার গুরুদেবের একটি শিশুকন্যা ছিল। সে আমার জীবনের স্নেহের

সামগ্রী হইল। তাহাকে আমি আদর করিতাম, দিবারাত্র বুকে করিয়া রাখিতাম, ক্ষুধার সময়ে দুধ খাওয়াইতাম। আমি গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তখনও আমার সংসারের মোহ কাটে নাই, সংসারের মায়া আসিয়া এক একবার আমার মনটাকে চঞ্চল করিত। গুরুদেবের ছোট কন্যাটিও আধআধ কথায়—চুমু দিয়া আমাকে ভুলাইয়া রাখিত। সে একটু বড় হইয়াই আমাকে "দাদা" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। তাহার সে স্বর এখনও আমার কর্ণে প্রতি-ধ্বনিত হইতেছে। ছেলেবেলায় তাহার মস্তকে বড় বড় ঝাঁক্ড়া চুল ছিল। আমি তাহাকে "ঝামেরি", আবার কখন আদর করিয়া "ঝামেরিয়া" বলিয়া ডাকিতাম।

ঝামেরি যখন "পা" "পা" করিয়া চলিতে শিখিল, তখন হইতেই সে আমাদের কাছে ভগবানের গল্প শুনিতে ভালবাসিত। "ভগবান কোথা আছে দাদা? তিনি কি করেন? ঐ আকাশের উপর কি তাঁ'র ঘর? আমরা কি তাঁকে একদিনও দেখ্‌তে পাব না?" এই প্রকার নানা শিশুসুলভ কথা জিজ্ঞাসা করিত। কোন দিন বলিত "ভগবানের একটা গল্প বল না দাদা!" এই সব কথা শুনিয়া বৃদ্ধা বলিতেন, "তোর ভবিষ্যতের সম্বন্ধে ভাবনা ছিল, এখন আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম।" আমি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিতাম, "এ কথার অর্থ কি? ভবিষ্যতের কি ভাবনা ছিল? কিসে আপনি নিশ্চিন্ত

হইলেন?” আমার কথায় বৃদ্ধা কোন উত্তর না দিয়া সরিয়া যাইতেন। আমিও আর তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিতাম না।

একদিন রজনী দ্বিপ্রহরের সময় গুরুদেব আসিয়া বলিলেন—“আমি চলিলাম রামপ্রসাদ! গুরুদেব আহ্বান করিয়াছেন। তুমি অধৈর্য্য হইও না, সময় হইলে তুমিও যাইবে।”

এই বলিয়া গুরুদেব বৃদ্ধাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। একটি কথাও বলিবার আমি অবসর পাইলাম না। গুরুদেবের অদর্শনজনিত শোকে আমি অধীর হইয়া পড়িলাম। কিন্তু বৃদ্ধার ইহাতে সুখ দুঃখ কিছুই নাই।

দুঃখেষু দ্বিগ্ন মনা!
সুখেষু বিগত স্পৃহা,
বীত রাগ ভয় ক্রোধ
স্থির ধীর মনিরুচ্চতে!

ইত্যাদি লক্ষণ যেন বৃদ্ধার দেহে জাগ্রত হইয়া রহিয়াছে। তাই বলিয়াছি বৃদ্ধা যে কে, সে পরিচয়ও পাইলাম না, এ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া চিনিতেও পারিলাম না। কেবল গুরুদেবের নির্দ্দিষ্ট পথে এবং মাঝে মাঝে ঝামেরির সঙ্গে খেলাধূলা করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলাম।

কিছুদিন এইরূপে অতীত হইবার পর গুরুদেবের জন্য আমার অত্যন্ত ব্যাকুলতা আসিল। যেন মনে হইতে লাগিল, পূর্ব্বের মত তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন—যেন তিনি আমাকে "আয়" "আয়" বলিয়া সঙ্গে যাইবার জন্য ডাকিতেছেন। আমি পাগলের মত হইয়া গেলাম। ঝামেরিয়ার প্রতিও তখন আর আমার স্নেহ মমতা রহিল না। আমার যখন মনের এইরূপ অবস্থা, তখন একদিন বৃদ্ধা বলিলেন, "আমি আর লোকালয়ে থাকিব না।" আমিও ইহার আকুল প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আমরা এক দিবস দুইজনে ঝামেরিয়াকে লইয়া গভীর রজনীতে কুটীর ত্যাগ করিলাম।

কতদিন চলিয়া আসিলাম, মনে নাই। বহুদিন পরে একটী পর্ব্বতের নিম্নে বিজন অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই অরণ্যের মাঝে গুরুদেবকে হঠাৎ এক স্থানে দেখিতে পাইলাম। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল, তিনি যেন আমাদেরই অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমি গুরুদেবের সঙ্গে চলিয়া গেলাম। বৃদ্ধা ঝামেরিয়াকে লইয়া সেই অরণ্যে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।"

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই ঝামেরিয়ার চক্ষু দিয়া অবিশ্রান্ত জলধারা পড়িতে লাগিল। প্রস্ফুটিত কমলের উপর শিশিরবিন্দুর ন্যায় সেই শোভা দেখিয়া, ভবরাম বলিলেন, "ছিঃ! মা! এখনও কি

তোমার মন স্থির হয় নাই? পাছে তোমার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, এই ভয়ে এতদিন এসব কথা শুনাই নাই। শোক দুঃখে বিচলিত হইবার মত মনের অবস্থা ত এখন তোমার নাই! তাহা হইলে তোমার সাধনা যে বৃথা হইতেছে মা!"

ঝামেরিয়া বলিল, "না! বাবা! মুহূর্ত্তের জন্য আমার হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল মাত্র। আর কখন এরূপ হইবে না। আমি এখন প্রকৃতিস্থ হইয়াছি। আপনি পড়িয়া যান।"

যে পত্রখানিতে ঝামেরিয়ার দানের কথা ছিল, ভবরাম সেই পত্রখানির উপসংহার ভাগ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেম। গুরুদেবের কুটীর ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই রামপ্রসাদ জ্যেষ্ঠ হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে এই পত্রখানি লিখিয়া বৃদ্ধার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন।

পরমারাধ্য পরম পূজনীয়—

শ্রীল শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—

অগ্রজ মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু—

শত সহস্র প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন—

দাদা! কনিষ্ঠের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমাদের পিতামাতা নাই; জনকজননীর সেবা করা আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই! আপনি আমার পিতৃতুল্য, পূজনীয় ও শ্রদ্ধার পাত্র।

আপনার সেবাও আমার অদৃষ্টে ঘটিল না। জানি না, আমি এই পাপ হইতে উদ্ধার পাইব কি না? গৃহত্যাগকালে আপনাকে নিজের অজ্ঞাতে দুই একটি কঠোর কথা যদি বলিয়া থাকি, তবে তাহার জন্য চিরদিন অনুতপ্ত হৃদয়ে প্রায়শ্চিত্ত করিব; কিন্তু আমার কথায় আপনার যদি মর্ম্মযাতনা হইয়া থাকে, সে মর্ম্মযাতনা আমি যে দূর করিতে পারিলাম না—এ দুঃখ আমার কেবল ইহজীবনে নয়, জন্মজন্মান্তরেও থাকিবে। যদি আপনার চরণ স্পর্শ করিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিতে পারিতাম, তাহা হইলেও আমার কতকটা দুঃখ দূর হইত; কিন্তু তাহাও আমার অদৃষ্টে ঘটিল না। দাদা! আমাকে বিশ্বাস করুন—আপনাকে মর্ম্মপীড়া দিব বলিয়া আমি কখনও কোন কথা বলি নাই! ইহা যদি আপনি বিশ্বাস করেন, তাহা হইলেও আমি ভবিষ্যৎ জীবনে সুখ ও তৃপ্তি পাইব, নচেৎ আমি যে পথে যাইতেছি, তাহাও বুঝি বৃথা হইবে। গুরুজন—বিশেষতঃ পিতৃতুল্য অগ্রজের যদি মর্ম্মবেদনার কারণ হইয়া থাকি, তাহা হইলে স্বর্গে গেলেও আমাকে ভীষণ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। দাদা! আমি করযোড়ে আপনার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। আপনাকে যখন আমার ভক্তির নিদর্শন দেখাইবার সুযোগ ঘটিল না, তখন ভক্তি-শ্রদ্ধার কথা আর তুলিব না! কেবল বলিতেছি, অপরাধী, অকৃতজ্ঞ, অজ্ঞান, ভক্তিহীন অধম অনুজকে আপনি ক্ষমা করুন।”

"দাদা! আমি এখন মানবের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যের পথে গমন করিতেছি। সাধনের পথেও গুরুজনের অনুমতি ব্যতীত গমন করিতে নাই। আপনি অনুমতি দিন ও সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি অভীষ্ট লাভ করিতে পারি। আর একটি অনুরোধ, আমার গুরুকন্যা ঝামেরিকে আমি সহোদরা অপেক্ষাও স্নেহ করি। দাদা! আমাদের ভগিনী নাই! ঝামেরিয়াই আমাদের ভগিনী! ইহার জন্য আমি আপনার কৃপাকণা ভিক্ষা করিতেছি! আমার ন্যায় অধম ভ্রাতাকেও ত আপনাকে প্রতিপালন করিতে হইত। আমাকে যাহা দিতেন—আমার ভরণপোষণের জন্য আপনার যাহা ব্যয় হইত, আমাদের ভগিনী ঝামেরিয়ার জন্য আপনার শ্রীচরণে তাহাই প্রার্থনা করিতেছি। আমি এখন নিরুদ্বেগে গুরুদেবের সহিত অমৃতের সন্ধানে চলিলাম। যদি বাঁচিয়া থাকি, যথাসময়ে আবার আপনার চরণ দর্শন করিব।"

একান্ত আজ্ঞাধীন—

শ্রীরামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

পত্রপাঠ শেষ হইলে করুণাময় বলিলেন, "দাদা! মহাত্মা রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ত প্রকারান্তরে আমার ঝামেরি মাকে তাঁহার প্রাপ্য অংশ দিবার জন্য অগ্রজকে অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। "আমাকে যাহা দিতেন" এ কথার অর্থই ত তাই। ধার্ম্মিক রামপ্রসাদ জ্যেষ্ঠকে ইহার বেশী আর কি বলিতে পারেন?"

ভবরাম বলিলেন, "ভাই করুণাময়! হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় যদি আজকালকার ভাই হ'ন, তাহা হইলে রাজদ্বারে আইনের শরণাপন্ন হইতে হইবে। বিষয়-লোভে কেন সেটা করিবে ভাই! ইহাতে অধর্ম্ম হইবে।"

করুণাময় একটু উত্তেজিতস্বরে বলিল, "রামপ্রসাদ অর্দ্ধেক বিষয়ের প্রকৃত অধিকারী। তিনি সেই অর্দ্ধেক সম্পত্তি নিজে না লইয়া ঝামেরিয়াকে দান করিয়া গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ যদি এরূপ ভ্রাতৃভক্ত কনিষ্ঠকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিতে প্রয়াসী হ'ন, তবে তাহাতে আইনের আশ্রয় লওয়া কি পাপ? বরং এরূপ অধর্ম্মের প্রশ্রয় দেওয়াই পাপ!"

ভবরাম হাসিয়া বলিলেন, "ভাই! করুণাময়! তুমি ভুল বুঝিতেছ। শাস্ত্রমতে গুরুজনের বিরুদ্ধাচরণ করাই মহাপাতক। হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্ম বেশ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা কর। দশরথের আজ্ঞায় রামচন্দ্র বনগমন করিলেন কেন? লক্ষ্মণই বা কেন তাঁহার সঙ্গী হইলেন। "অন্যায় আদেশ" বলিয়া ত রামচন্দ্র পিতার আদেশ অমান্য করিতে পারিতেন। এখন ভাবিয়া দেখ, পিতৃসদৃশ অগ্রজের সহিত পার্থিব বিষয়ের জন্য বিরুদ্ধাচারী হওয়া কি পাপ নহে? অগ্রজের ন্যায় গুরুজনকে সর্ব্বতোভাবে চিরজীবন সন্তুষ্ট রাখাই ধর্ম্ম! তিনি যদি কনিষ্ঠের প্রাপ্য লইয়া সন্তুষ্ট হ'ন, তাহা হইলে কনিষ্ঠের তাহাতে

আনন্দ উপভোগ করা কর্ত্তব্য। রামচন্দ্র বনবাস যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও "পিতাকে সন্তুষ্ট করিলাম" বলিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ পার্থিব-বিষয়ের মোহ ত্যাগ করিয়া জ্বলন্ত ত্যাগ-স্বীকারের দৃষ্টান্ত জগতকে দেখাইবেন—ইহাতেই তাঁহার তপস্যার ফল লাভ হইবে। সন্ন্যাসীরা বনে যাইয়া যাহা করেন, কনিষ্ঠ গৃহে বসিয়াই তাহা করিবেন। যাহারা স্ত্রী-পুত্রের প্ররোচনায় হৃদয়ের সর্ব্বস্ব স্নেহময় সোদরকে বঞ্চনা করে, সেই তাহারা ইহজন্মেই তাহাদের দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। বঞ্চিত হইয়া কনিষ্ঠের কোন ক্ষতি হয় না, ইহা নিশ্চয় জানিবে। ইহাতে কনিষ্ঠ আত্মপ্রসাদ লাভ করে, ত্যাগী সন্ন্যাসীর মত জ্যেষ্ঠের সন্তোষের জন্য একটা ত্যাগ করিতে পারিয়াছি বলিয়া বিমল আনন্দ পায়, কিন্তু জ্যেষ্ঠ তুষের আগুনে চিরজীবন পুড়িয়া মরে! সমগ্র জীবনে সে আর শান্তির মুখ দেখিতে পায় না। সংসার কয়দিনের জন্য ভাই! যাহাকে একদিন না একদিন ত্যাগ করিতেই হইবে, তাহাকে না হয় মানুষ আজই ত্যাগ করিল। ইহাতে আর কষ্ট কি? মানুষ যদি এইটা ভাবিত, তাহা হইলে কি সংসারে হিংসা, দ্বেষ, বিবাদ থাকিত! তাহা হইলে কি মানুষ অশান্তির দাহনে "আমার" "আমার" করিয়া চিরদিন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিত।

"এই পার্থিব বিষয় লইয়া কিছুদিন পূর্ব্বে এক পরিবারের

ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ ঘটিয়াছিল। আমি তোমাকে এই ঘটনাটি যথাযথ বলিতেছি। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রাণধন বন্দ্যোপাধ্যায় দুই সহোদর। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণধন বিদেশে অর্থোপার্জ্জন করেন এবং কনিষ্ঠ প্রাণধন চাষবাস ও বিষয় কার্য্য দেখেন। ক্রমশঃ জ্যেষ্ঠের অবস্থা ভাল হইল, গতজন্মের সুকৃতিফলে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠের উপার্জ্জিত অর্থে কনিষ্ঠ দেশে জমি, পুষ্করিণী, বাগান ইত্যাদি করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠের দুইটি সন্তান হইল। ক্রমশঃ সন্তান দুইটি বড় হইল। জ্যেষ্ঠ ভাবিলেন, আমি উপার্জ্জন করিয়া এত বিষয়-সম্পত্তি করিলাম, আমার ছেলেরা ত নিষ্কণ্টকে ভোগ করিতে পাইবে না। এখন হইতেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। জ্যেষ্ঠের হৃদয়ে হঠাৎ পাপ-পিশাচ আসিয়া আধিপত্য স্থাপন করিল—জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার আয়োজন করিলেন। কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের কু-অভিসন্ধি বুঝিয়া অনেক কাকুতি-মিনতি করিল; কিন্তু কিছুতেই জ্যেষ্ঠের মন টলিল না। সংসারে নিত্য যাহা ঘটিতেছে, এক্ষেত্রেও তাহাই হইল—অর্থলোভে প্রবলের দিকে গ্রামের সকলেই যোগদান করিল। রাজদ্বারে আইনের কূটতর্কে অর্থবলে জ্যেষ্ঠ জয়লাভ করিলেন। কনিষ্ঠ কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইয়া বাস করিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে জ্যেষ্ঠের মৃত্যু হইল। তাঁহার সন্তান দুইটিও পিতার পথানুসরণ

করিল। জ্যেষ্ঠের সেই বিষয়-সম্পত্তি এখন অপরে ভোগ করিতেছে। তাঁহার স্ত্রী এখন স্বামীর নবনির্ম্মিত অট্টালিকায় বসিয়া চক্ষের জলে স্বামীর কৃতকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। এদিকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগবানের আশীর্ব্বাদে স্ত্রী-পুত্র লইয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসারধর্ম্ম পালন করিতেছেন। ইহা ত আমাদের একজন আত্মীয়ের সংসারের ঘটনা! চাক্ষুষও দেখিতে পাইতেছ ভাই!

"ভাই! ক্ষতি হইল কার? জ্যেষ্ঠের এই কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া পিতৃপুরুষগণ অভিসম্পাত করিলেন যে, তোমার বংশের জলগণ্ডুষ আমরা গ্রহণ করিব না। সহোদরকে বঞ্চিত করিয়া তুমি যে সম্পত্তি রাখিয়া যাইতেছ, সেই সম্পত্তি ভোগ করিয়া যাহারা পুষ্ট হইবে, তাহাদের হস্তের জল ও পিণ্ড পুণ্যাত্মা পিতৃপুরুষগণ গ্রহণ করিবেন কেন? ধর্ম্ম যে তাহা হইলে মিথ্যা হইয়া যাইবে। এখন বুঝিলে ভাই! ত্যাগ-স্বীকারে পিতৃপুরুষগণ ও ভগবান কিরূপ সন্তুষ্ট হ'ন, আর প্রবঞ্চনায় তাঁহারা কিরূপ রুষ্ট হ'ন?

"রামপ্রসাদ তাঁহার জ্যেষ্ঠের নিকট ঝামেরিয়ার জন্য কিছু ভিক্ষা চাহিয়াছেন। তিনি অংশীদার হিসাবে জোর করিয়া কিছু চাহেন নাই। আমরা এই পত্রখানিকে দলিলরূপে গণ্য করিয়া যদি রাজদ্বারে বিচারপ্রার্থী হই, তাহা হইলে মহাত্মা রামপ্রসাদের উদ্দেশ্যের বিপরীত কার্য্য করা হইবে। সুতরাং তাহাতে

আমাদের অধর্ম্ম হইবে। তুমি বলিলে—"আমাকে যাহা দিতেন" এই কথায় "তাঁহার প্রাপ্য অর্দ্ধেক অংশ" দিবার কথা বুঝাইতেছে। রামপ্রসাদের মনের ভাব তাহা নহে। তিনি জ্যেষ্ঠের নিকট ঝামেরিয়ার জন্য করুণা ভিক্ষা করিয়াছেন মাত্র।"

করুণাময় রামপ্রসাদের পত্রখানি আরও একবার পড়িয়া জ্যেষ্ঠকে বলিলেন, "হাঁ দাদা! আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম। আপনি যেরূপ রামপ্রসাদের মনের ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই ঠিক! সংকীর্ণ মনে আমি রামপ্রসাদকে অপরাধী ভাবিয়াছিলাম।"

সন্ধ্যা সমাগত—কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া গেল। সকলেই ভগবৎ আরাধনার জন্য ত্রিতলের নির্দ্দিষ্ট গৃহে গমন করিলেন। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া, করুণাময় জ্যেষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দাদা! হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের একবার সন্ধান লইলে হয় না! তিনি একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি; অল্প চেষ্টাতেই বোধ হয় তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা যাইতে পারে।"

ভবরাম অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "সংবাদ লইতে কোন দোষ নাই।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চৌরঙ্গীর বড় রাস্তার উপর পাশাপাশি দুইখানি ত্রিতল অট্টালিকা। ঘর দুইখানি সাহেবী ধরণে সুসজ্জিত। ড্রয়িং-রুমে সুবৃহৎ তৈলচিত্র, বৈদ্যুতিক আলোক ও পাখা, নানাবিধ টেবিল, চেয়ার, কৌচ প্রভৃতি সাহেবী উপকরণের কিছুই অভাব নাই। বাটীর সম্মুখে আবার একটী সুরম্য উদ্যান। উদ্যানে দেশী ও বিলাতি নানাবিধ ফল ও ফুলের গাছ। মধ্যে একটী মর্ম্মর-নির্ম্মিত কৃত্রিম প্রস্রবণ। ইহা কিছুদিন পূর্ব্বের কথা—বর্ত্তমান সময়ে ইহার কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কিনা সে সংবাদ আমরা রাখি নাই। ফটকের সম্মুখে একজন ভীমকায় শিখ দ্বারবান বন্দুক ঘাড়ে করিয়া পাহারা দিতেছে। যে ত্রিতল বাটীখানিতে বাবু ও তাঁহার পরিজনবর্গ বাস করেন; সেখানি ইন্দ্র-ভুবনের ন্যায় সুসজ্জিত। পথিক সে বাটীখানির দিকে একবার না চাহিয়া অগ্রসর হইতে পারে না। বাটীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ মূল্যবান্ শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তর-মণ্ডিত। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে মর্ম্মর-নির্ম্মিত অপ্সরীরা কেহ হাত বাঁকাইয়া, কেহ কটীদেশে হস্তার্পণ করিয়া, কেহ বা ফুলের তোড়া হস্তে লইয়া নানা

মূর্ত্তিতে ত্রিভঙ্গ ঠামে দাঁড়াইয়া আছে। অপর অট্টালিকায় বাবুর কাছারি-বাড়ী। সেখানে কার্য্যাধ্যক্ষ, খাজাঞ্চি, নায়েব, কার্কুন, গোমস্তা, বাজার-সরকার প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ সর্ব্বক্ষণ অবস্থিতি করিতেছেন। বাবুর মফঃস্বলের জমিদারীর নায়েব-গোমস্তাগণ হিসাব-নিকাশ দিবার জন্য এইখানে আসিয়া বাস করেন। জমিদারী তাদৃশ বড় না হইলেও, ইহার মুনাফা বাৎসরিক প্রায় চারি লক্ষ টাকা হইবে।

দিবা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। বাবু নিজ খাসকামরায় মূল্যবান মখ্‌মল্ মণ্ডিত একখানি আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশায়িত। তাঁহার গাত্রে বহুমূল্য হীরার বোতামযুক্ত শিল্কের পাঞ্জাবী, হস্তে তিনটি হীরকাঙ্গুরী, চক্ষে স্বর্ণমণ্ডিত চসমা। মস্তকের কেশগুলি ছোটবড় করিয়া কাটা। মধ্যস্থলে একটি সূক্ষ্ম রেখা চুলগুলিকে দশ আনা ছয় আনা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে। বাবুর মস্তক ও গাত্র হইতে নানাবিধ বিলাতি এসেন্সের গন্ধ, বৈদ্যুতিক বাতাসে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া ঘরখানিকে আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। পরিধানে একখানি ফরেসডাঙ্গার কাল্লাপাড় ধুতি। সেখানি অতি সযত্নে কোঁচান বাবুটি যুবা পুরুষ। বয়স অনুমান অষ্টবিংশতি বর্ষের অধিক হইবে না। তিনি বি, এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। সুসজ্জিত গৃহে একপার্শ্বে দুইটি সুদৃশ্য মেহগিনির আলমারিতে নানাবিধ ইংরাজ

নভেল শোভা পাইতেছে। বাবুর দক্ষিণ পার্শ্বে একটী সুন্দর টেবিল। তদুপরি একটী কাচের গ্লাসে বরফজল রক্ষিত, অন্যদিকে লেমনেড, জিঞ্জার ইত্যাদির বোতল।

বাবুটিকে দেখিতে গৌরবর্ণ! মুখখানি জ্যোতিঃহীন। চক্ষুর্দ্বয় বসিয়া গিয়াছে। দেহ অবসাদগ্রস্ত, মুহুর্মুহু হাই উঠিতেছে। দেখিলেই বোধ হয় যেন রাত্রে বাবুর সুনিদ্রা হয় নাই।

বাবু একখানি ইংরাজী দৈনিক পত্র টেবিল হইতে উঠাইয়া দুই চারি লাইন পড়িলেন। সেখানি রাখিয়া আবার একখানি লইয়া দুই লাইন পড়িলেন, আবার রাখিয়া দিলেন। আরাম-শয়ন হইতে উঠিয়া বৈদ্যুতিক পাখাটা জোর করিয়া চালাইয়া দিলেন। বোঁ বোঁ করিয়া পাখা অনবরত ঘুরিতে লাগিল। একটু বরফজল পান করিয়া একখানি ইংরাজী ম্যাগাজিন লইয়া আবার পড়িতে বসিলেন। দুই মিনিট পরে তাহাও রাখিয়া দিলেন। আলমারি হইতে একখানি ইংরাজী নভেল লইয়া পড়িতে বসিলেন, তাহাও ভাল লাগিল না। উঠিয়া গিয়া গৃহ মধ্যস্থিত টেলিফোনে কাহার সহিত কি কথা কহিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই তিনটি নব্য যুবক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবার বাবুর মুখখানি প্রফুল্লভাব ধারণ করিল। তিনজনের মধ্যে একজন বিজাতীয় পোষাকে তাঁহার বরবপু শোভিত করিয়াছেন। অপর দুইজনের বাঙ্গালীর মত পোষাক। চক্ষে চসমা,

হাতে ছড়ি, ফুরফুরে শিল্কের পাঞ্জাবী, শিল্কের রুমাল, মাথায় টেরি। ইঁহারা বাবুর মোসাহেব, বন্ধু, ইয়ার বা যাহা হয়, এই রকমের কিছু একটা হইবেন।

একজন বলিলেন—“বা! তুমি ত বেশ হে! দু’টো বাজে, এখনও বসিয়া আছ? আড়াইটার সময় এন্‌গেজমেণ্টের কথাটা বুঝি মনে নাই?”

একজন বলিলেন, “সাধে বাঙ্গালী অধঃপাতে গিয়াছে! যা’রা কথার সঙ্গে সময়ের মিল রাখ্‌তে পারে না, তা’রা আবার দেশোদ্ধার কর্‌বে!”

তৃতীয় বাবুটি একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, “নাও ভাই! আর বক্তৃতায় প্রয়োজন নাই। সুরেন বাঁড়ুজ্যের চিরজীবনটা বক্তৃতা করেই কাটলো। কাজ কিছুই হ’ল না। তোমাদেরও সেই রোগে ধরেছে দেখ্‌ছি! এখন উঠে পড়। সেখানে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল!”

বাবুটি এতক্ষণ মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া বন্ধুবর্গের বক্তব্য শ্রবণ করিতেছিলেন। সকলে নিস্তব্ধ হইলে, তিনি লাফ দিয়া উঠিয়া, বাম হস্তের তালুর উপর দক্ষিণ হস্তের তালু সজোরে ঠুকিয়া বলিলেন, “ব্রেভো! ব্রেভো! তোমরা তিনজনে তিনটি নেপোলিয়ান্ বোনাপার্ট হইয়া উঠিয়াছ! কেবল কাজ চাও,—কথা চাও না! বেশ বাবা! শুনে সুখী হ’লাম।” বাবুর এই কথায় তিন-

জনই বিকট হাস্য করিয়া উঠিল, সেই হাস্যধ্বনিতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই গৃহ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

বাবু ডাকিলেন, "মেহের সিং!" একটা লম্বা শিখ দ্বারবান আসিয়া সেলাম করিল।

"সাদা জুড়ি বোলাও।"

দ্বারবান "যো হুকুম খোদাবন্দ" বলিয়া চলিয়া গেল।

আবার হাস্য-কৌতুক চলিতে লাগিল। সাহেব-বেশধারী বাবুটি বলিল, "য়িহুদীর খাতির-যত্ন বেশ ভাই।" একজন বাধা দিয়া বলিল, "মেম ছুঁড়িটার আরও বেশি।"

এমন সময় বৃদ্ধ রামধন দত্ত কার্কুন আসিয়া বাবুকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। কার্কুনের গলায় তুলসীর মালা, মস্তকের মধ্যস্থলে পক্ক কেশের মধ্যে কয়েকগাছি লম্বা চুল, পরিধানে মোটা থান ধুতি, কপালে চন্দনের ফোঁটা, হস্তে একতাড়া কাগজ। কার্কুন দক্ষিণ ধারের দেওয়াল ঠেসিয়া জড়সড় হইয়া দণ্ডায়মান হইল।

একজন বাবুর কাণে কাণে বলিল, "এইবার সব মাটি হ'ল বাবা! বুড়ো এমন সময় কোথা থেকে এসে জুটলো হে?"

বাবু সে কথা শুনিয়া একটু মুচকি হাসিলেন। পরে বিরক্তি-পূর্ণ স্বরে বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—

"কি গো, দত্তজা! কিছু কাজ আছে না কি?"

দত্তজা আবার যোড়হস্তে নমস্কার করিয়া, একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন—

"হাঁ হুজুর! কয়টা জরুরী কাজ আছে। আপনার আদেশ ভিন্ন হুকুমনামা পাঠাইতে পারিতেছি না। আজ দু'দিন বাহিরে ছিলেন, হুজুরের সাক্ষাৎ পাই নাই।"

"এখন কাজটা কি তাই বল! দিবারাত্রই কি সাক্ষাতের জন্য আমাকে বসে থাকতে হবে?"

"আজ্ঞে না হুজুর! সে কথা হুজুর কে—

হঠাৎ গৃহমধ্যে কে উপস্থিত হইয়া বলিল, "এই কি হরপ্রসাদ [illegible]য়ের গৃহ?" এই প্রশ্নে সহসা গৃহখানি নিস্তব্ধ হইল। [illegible]ীর স্বরের প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল—

[illegible]সাদ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহ?"

[illegible]ন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের নগ্নপদ, নগ্নদেহ, শুভ্র যজ্ঞোপবী[illegible] উপর স্থাপিত। গৈরিক বসন, স্কন্ধদেশে একখানি গৈরিক উত্তরীয়! দেহ নাতি-দীর্ঘ—নাতি-স্থূল! প্রশান্ত মুখখানি অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ-মণ্ডিত।

ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সাহেব-বেশধারী বয়স্কটি বাবুর কাণের কাছে মুখ লইয়া বলিল, "আজ কি কু-যাত্রা ভাই! তোমার বাড়িখানি চিড়িয়াখানা বাবা! রকম-বেরকমের জানো[illegible] যাতায়াত করে!"

বাবু ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাও তুমি ?"

ব্রাহ্মণ মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"কিছুই না! হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কেবল সংবাদ জানিতে আসিয়াছি।"

বাবু। তিনি ত মারা গেছেন।

ব্রাহ্মণ। মারা গেছেন? কত দিন?

বাবু। অনেক দিন মারা গেছেন।

ব্রাহ্মণ। আপনার নাম?

এই স্পৰ্দ্ধাসূচক প্রশ্নে বন্ধুগণ হো হো করিয়া উপেক্ষার হাসি হাসিলেন। অসভ্য ব্রাহ্মণের স্পৰ্দ্ধা দেখ! এক পা ধূলা, রুক্ষ কেশ। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিতেছে—"আপনার নাম?"

মোসাহেবদের হাস্যে বাবু বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"কি চাও ঠাকুর তুমি?"

দত্তজা বলিলেন—"হুজুরের নিকট আপনার [illegible] ...থনা আছে ঠাকুর?"

ব্রাহ্মণ। আমার প্রার্থনার কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি—হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের—

বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "সে কথার উত্তর ত দেওয়া হইয়াছে। আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?"

বাবুর একজন বন্ধু চসমাটি কপালের উপর তুলিয়া বলিল—"লোকটা পাগল বুঝতে পারছ না।"

ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিলেন—"পাগল কি না জানি না! তবে তোমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার দেখিয়া মনটা পাগলেরই মত হইয়াছে।"

ক্রোধকম্পিত স্বরে বাবু ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি আচার-ব্যবহার দেখ্‌লে ঠাকুর?"

ব্রাহ্মণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আচার-ব্যবহার দেখিবার আর বাকী কি আছে বাবা? তোমরা কোথায় যাইতেছ? হিন্দুর সন্তান, ব্রাহ্মণের সন্তান তোমরা! তোমাদের পরিণাম দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছি। অর্থ থাকিলেই কি দিক্‌ বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হইতে হয়? আচার, সংযম, বিনয় সকলই কি ইংরাজী লেখাপড়া শিখিলে ত্যাগ করিতে হয়? তোমরা ব্রাহ্মণকে সম্মান করিতে জান না,—বয়োজ্যেষ্ঠকে মান্য করিতে শিক্ষা কর নাই,—উচ্ছৃঙ্খলতার দমন নাই। ছি! ছি! ধিক্‌ তোমাদের শিক্ষায়! তোমাদের সতীলক্ষ্মী জননী কি এই জন্যই তোমাদিগকে কষ্ট করিয়া দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন? তোমাদের পিতৃ-পিতামহগণ ও অভিভাবকবর্গকে ধিক্‌ যে, তাঁহারা তোমাদিগকে হিন্দুর সভ্যতা ও ভদ্রতা শিক্ষা না দিয়া, ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির পুণ্য হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন।"

ব্রাহ্মণের তীব্র তিরস্কারে বাবুর সম্মান ও আভিজাত্যে বুঝি আঘাত লাগিল। চারি লক্ষ টাকার আয়ের জমিদারীর যিনি

মালিক, যাঁহার শত শত শিখ দ্বারবান, পাইক—বন্দুক ও তরবারি হস্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যাঁহার সহস্র সহস্র লাঠিয়াল মফঃস্বলের জমিদারিতে বাবুর আদেশের অপেক্ষায় উৎকর্ণ হইয়া আছে—তাঁহার রাজপ্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় বসিয়া—তাঁহারই সম্মুখে এক নগণ্য ব্রাহ্মণ এই প্রকার কটূক্তি করিতে সাহসী হইল! বাবু একটি মুখের কথা বাহির করিলে এখনই ব্রাহ্মণের মস্তক তরবারির আঘাতে দেহচ্যুত হইতে পারে! ব্রাহ্মণের সাহস ত কম নহে!

ক্রোধে অধীর হইয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে বাবু ডাকিলেন—"কোন্ হ্যায়?" দুইজন ভীমকায় শিখ আসিয়া সমস্বরে বলিল, "হুজুর।"

"এই বাওরাকো কাহে ঘুস্‌নে দিয়া শুয়ার কি বাচ্ছা—অভি বাহার কর দেও।"

সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন—"সাবধান যুবক! ধনমদে মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণের অপমান করিও না।"

বিরক্তি ও ক্রোধের ছায়া মাত্র সে স্বরে ছিল না! এই কথা বলিয়াই চকিতের ন্যায় ব্রাহ্মণ জমিদারের ফটক পার হইয়া চলিয়া গেলেন। শিখ দুইজন শীকার মিলিয়াছে ভাবিয়া ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় ব্রাহ্মণের পশ্চাতে ছুটিয়া আসিয়াছিল। শীকার হাতছাড়া হইল দেখিয়া—"ভাগ চোট্টা শালা" বলিয়া ব্রাহ্মণকে গালাগালি দিতে লাগিল। কয়েক মিনিট পরেই বাবু, মোসাহেব ও বন্ধুবর্গ

পরিবেষ্টিত হইয়া গাড়িতে উঠিলেন। শ্বেত জুড়িদ্বয় কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। রামধন দত্ত কাকুনের হাতের কাগজ হাতেই থাকিয়া গেল। বেচারা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে বলিল, "দেব! কি পাপে এই সংসারকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছ! এই বংশের অন্নে আমার শরীর পুষ্ট হইয়াছে, বৃদ্ধ বয়সে কেমন করিয়া এই বিপদ স্বচক্ষে দেখিব! যাই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই। আমার ত সময় ফুরাইয়া আসিয়াছে, পরকালের কার্য করি। কেন পরের ঝঞ্ঝাটে দেহপাত করি, দূরে থাকিলে ইহা আমাকে দেখিতে হইবে না; কিন্তু কি করিয়াই বা যাই শত বন্ধনে আমি আবদ্ধ—কি করিয়া ইহার মায়া ত্যাগ করিব?" নানাপ্রকার কথা ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধ কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিল

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ-বর্ণিত ঘটনার পর—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ঘটনা দুই বৎসর পরে ঘটিল। করুণাময় দুই বৎসর পূর্ব্বে ভবরামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "দাদা! হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের একবার সন্ধান লইলে হয় না?" ভবরাম বলিয়াছিলেন—"সংবাদ লইতে কোন দোষ নাই।" করুণাময় জ্যেষ্ঠের অনুমতি পাইয়া হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সন্ধানার্থ লোক নিযুক্ত করে। করুণাময় হরপ্রসাদের বাটীর সন্ধান পাইয়া জ্যেষ্ঠকে বলে—"দাদা! আপনি অনুমতি করিলে আমি যাইয়া সাক্ষাৎ করিতে পারি।" ইহাতে ভবরাম বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—"ভাই! করুণাময়! সংসার সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা অল্প। ইহা একটি জটিল ব্যাপার। তোমার যাইবার প্রয়োজন নাই। আমিই সুবিধা মত একদিন যাইয়া সংবাদ লইব।" ইহা এক বৎসর পূর্ব্বের কথা।

এই এক বৎসরের মধ্যে অনেকবার করুণাময় ও সাগরবালা ভবরামকে কথাটা স্মরণ করিয়া দিয়াছে; কিন্তু ভবরামের যাইবার সুবিধা ঘটে নাই। ভবরাম চতুষ্পাঠীর চিন্তা লইয়া ব্যস্ত—বিশেষতঃ

এ সব গোলযোগের ভিতর যাইবার তাঁহার আদৌ প্রবৃত্তি ছিল না। বারবার করুণাময় ও সাগরবালা যখন কথাটা পুনরালোচনা করিতে লাগিল, তখন ভবরাম, সাগরবালা ও করুণাময়ের আগ্রহাতিশয্যে যাইতে স্বীকৃত হইলেন। হরপ্রসাদের গৃহে গিয়া ভবরাম কিরূপ অপমানিত হইয়া আসিয়াছেন, তাহা পাঠক পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে জানিতে পারিয়াছেন।

ভবরাম গৃহে আসিয়া কাহাকেও কিছু বলিলেন না। সন্ধ্যার সময় সকলেই দেবারাধনায় গৃহে প্রবেশ করিলেন। কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের বা জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের মর্ম্মযাতনা সর্ব্বাগ্রেই বুঝিতে পারে। করুণাময় দাদাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না বটে, কিন্তু জ্যেষ্ঠের মুখের দিকে চাহিয়া কনিষ্ঠের প্রাণের ভিতর দাবানল জ্বলিতে লাগিল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "তবে দাদা পাষণ্ড হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট অপমানিত হইয়াছেন! দাদার মনের ভাব আজ এরূপ হইল কেন? যদি কেহ আমার দাদার অপমান করিয়া থাকে, তবে সে যেই হউক, যতক্ষণ করুণাময়ের দেহে রক্তবিন্দু থাকিবে, তাহাকে প্রতিফল পাইতে হইবে। কনিষ্ঠ করুণাময় জীবিত থাকিতে জ্যেষ্ঠের অপমান স্বচক্ষে দর্শন করিবে না! জীবনের বিনিময়েও কি দাদাকে তাহা ফিরাইয়া দিতে পারিব না! দাদা কর্ত্তব্যবোধে ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্যই গিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্ম বর্জ্জিত কার্য্য

করিতে যান নাই! ধর্ম্মের জন্য, ন্যায়ের জন্য, কার্য্য করিতে গিয়া তিনি যদি অপমানিত হইয়া থাকেন—ন্যায়, ধর্ম্ম কি তাহার বিচার করিবে না?" এই প্রকার চিন্তা করুণাময়ের মনোমধ্যে উদিত হইয়া তাহাকে যন্ত্রণা দিতে লাগিল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া জলধারা গড়াইতে লাগিল।

ভবরাম গম্ভীরভাবে আজ ভগবৎ উপাসনায় বসিলেন। সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ করিয়া আদ্যাশক্তির স্তবপাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মধুর কণ্ঠে সেই স্তবগুলি উচ্চারিত হইয়া, সেই গৃহ যেন মধুময় করিয়া তুলিল। ভবরাম করযোড়ে বলিতে লাগিলেন:—

সতী সাধ্বী ভব প্রীতা ভবানী ভবমোচনী।
আর্য্যা দুর্গা জয়া আদ্যা ত্রিনেত্রা শূলধারিণী॥
পিনাকধারিণী চিত্রা চণ্ড ঘণ্টা মহাতপাঃ।
মনো বুদ্ধিরহঙ্কারা চিত্তরূপা চিতা চিতিঃ॥
সর্ব্বমন্ত্রময়ী সত্যা সত্যানন্দস্বরূপিণী।
অনন্তা ভাবিনী ভব্যা ভব্যাভব্যা সদাগতিঃ॥
শাকম্ভরী দেবমাতা চিন্তা রত্নপ্রিয়া সদা।
সর্ব্ব বিদ্যা দক্ষকন্যা দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী॥
অপর্ণা নৈক বর্ণা চ পাটলা পাটলাবতী।
পট্টাম্বরপরিধানা কলমঞ্জীররঞ্জিনী॥

অমেয়বিক্রমাক্রুরা সুন্দরী সুরসুন্দরী ।
বনদুর্গা চ মাতঙ্গী মতঙ্গ মুনিপূজিতা ॥
ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈন্দ্রী কৌমারী বৈষ্ণবী তথা ।
চামুণ্ডা চৈব বারাহী লক্ষ্মীশ্চ পুরুষাকৃতেঃ ॥
বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া সত্যা চ বুদ্ধিদা ।
বহুলা বহুলপ্রেমা সর্ব্ববাহন বাহিনী ॥
নিশুম্ভ শুম্ভ হননী মহিষাসুর মর্দ্দিনী ।
মধুকৈটভ হন্ত্রী চ চণ্ড মুণ্ড বিনাশিনী ॥
সর্ব্বাসুর বিনাশা চ সর্ব্বদানব ঘাতিনী ।
সর্ব্বশাস্ত্রময়ী সত্যা সর্ব্বাস্ত্রধারিণী তথা ॥
অনেকশস্ত্রহস্তা চ অনেকাস্ত্রস্ত ধারিণী ।
কৌমারী চৈব কন্যা চ কৈশরী যুবতী রতিঃ ॥
অপ্রৌঢ়া চৈব প্রৌঢ়া চ বৃদ্ধা মাতা বলপ্রদা ॥

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন দাতা ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্ত্তা
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী ॥
ভবাব্ধাবপারে মহাদুঃখভীরৌ পপাত প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ ॥
কুসংসারপাশপ্রবদ্ধঃ সদাহং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী ॥
ন জানামি দানং ন চ ধ্যান যোগং ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রং ।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাস যোগং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী ॥

জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং ন জানামি মুক্তিং লয়ম্বা কদাচিৎ।
। জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাতর্গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥
ুকর্ম্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ।
ুদৃষ্টিঃ কুবাক্যপ্রবন্ধঃ সদাহং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥
প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ
। জানামি চান্যং সদাহং শরণ্যে গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥
িবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে জলে চানলে পর্ব্বতে শক্রমধ্যে।
মরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী।
মনাথো দরিদ্রো জরারোগযুক্তো মহাক্ষীণদীনঃ সদা জাড্যবক্ত্রঃ
িপত্তিং প্রবিষ্টঃ প্রবুদ্ধঃ সদাহং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥
ওঁ নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে, নমস্তে জগদ্ব্যাপিনী বিশ্বরূপে
নমস্তে জগদ্বন্দ্য-পদারবিন্দে নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে॥
নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমানস্বরূপে, নমস্তে মহাযোগিনী জ্ঞানরূপে।
নমস্তে নমস্তে সদানন্দরূপে, নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে॥
অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য, ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারকর্ত্রী, নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে॥
অরণ্যে রণে দারুণে শক্রমধ্যেঽনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে,
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারহেতুর্নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে॥
অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্ত ঘোরে, বিপৎ-সাগরে মজ্জতাং দেহভাজাং।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারনৌকা, নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে॥

নমো দেবি দুর্গে শিবে ভীমনাদে সরস্বত্যরুন্ধত্যামোঘস্বরূপে।
বিভূতিঃ শচী ত্বং সতী কালরাত্রি র্নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে।
নমশ্চণ্ডিকে চণ্ড দোর্দ্দণ্ড লীলালসৎখণ্ডিতাখণ্ডনাশেষ শত্রোঃ।
ত্বমেকা গতির্বিঘ্ন সন্দোহ হর্ত্রী! নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে।
ত্বমেকাজিতারাধিতা সত্যবাদিন্যমেয়াজিতারাধিতা ক্রোধনিষ্ঠা।
ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুসুম্না চ নাড়ী নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে।
শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধ-বিদ্যাধরাণাং মুনিদনুজনরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং
নৃপতিগৃহ-গতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবী দুর্গে প্রসীদ

স্তবপাঠ শেষ হইলে ভবরাম ধ্যানে বসিলেন। রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গেল, তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল না। সেই পাষণ্ডদিগের মতিগতি ধর্ম্মের পথে ফিরাইবার জন্য ভবরাম আজ ব্যাকুলভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। সকলেই সুষুপ্তির ক্রোড়ে শায়িত। এমন সময় কে একজন দ্বারে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "বাটীতে কে আছেন, দ্বার খুলিয়া দিন্, আমার বিশেষ প্রয়োজন।"

সাগরবালার তন্দ্রা ভাঙ্গিল, তিনি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া

করুণাময়ের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া ডাকিলেন—"ঠাকুর-পো! একটা লোক বাহিরে ডাকিতেছে।"

করুণাময় আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন, আগন্তুকটি কম্পিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?"

"আমার নাম করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায়।" লোকটি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল ও পদধূলি গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি ভবরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ।"

করুণা। হাঁ। আমি তাঁহার কনিষ্ঠ।

আগন্তুক। আমি একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আমার বিশেষ প্রয়োজন।

লোকটির কণ্ঠস্বর অতিশয় জড়িত। কথাগুলি ব্যাকুলতা-পূর্ণ। করুণাময় তাঁহাকে বৈঠকখানার ঘরে সযত্নে বসাইয়া কহিলেন, "আপনি একটু অপেক্ষা করিতে পারিবেন কি? দাদার আসিতে একটু বিলম্ব হইবে। তিনি এখন পূজা করিতেছেন।"

লোকটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"তাঁহার সহিত যে সাক্ষাৎ হইবে, ইহাতেই আমি আশ্বস্ত হইয়াছি। যতক্ষণ না তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, ততক্ষণ আমি বসিয়া রহিলাম। আমার আগমন-সংবাদ প্রদান করিয়া তাঁহার পূজার ব্যাঘাত করিবেন না।" করুণাময় তাঁহাকে বসাইয়া উপরে চলিয়া গেলেন।

লোকটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট এবং দীর্ঘাকার, মস্তকের অধিকাংশ কেশই

শুভ্র। বয়স পঁয়তাল্লিশের কম হইবে না। দেখিলেই তাঁহাকে বেশ বুদ্ধিমান্ ও ধনবান্ বলিয়া মনে হয়। অঙ্গে একটী সামান্য কামিজ। পরিধানে একখানি দেশী ধুতি। শিল্কের রুমালে জড়ান কি একটা জিনিষ তাঁহার দক্ষিণ হস্তে রহিয়াছে। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হয় যে, তিনি অতি সাবধানী এবং সর্ব্বক্ষণ মস্তিষ্ক চালনায় অভ্যস্ত!

বহুক্ষণ পরে ভবরামের ভগবৎ আরাধনা শেষ হইল। করুণাময় ভদ্রলোকটির কথা জ্যেষ্ঠকে নিবেদন করিলেন। পরে উভয় ভ্রাতাই নীচে নামিয়া আসিলেন।

ভবরামের কটীদেশ হইতে জানুর উপর পর্য্যন্ত একখানি ক্ষুদ্র গৈরিক বসন জড়িত। হস্ত দুইখানিতে এখনও ফুল, তুলসী ও চন্দনের গন্ধ রহিয়াছে। এইমাত্র ভগবৎ আরাধনা শেষ করিয়া আসিতেছেন, মুখের সে সদানন্দ ভাব এখনও তিরোহিত হয় নাই। ভদ্রলোকটি অবনত মস্তকে অনিমিষ নয়নে ভবরামের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কলুষিত হৃদয় লইয়া বুঝি মুখের দিকে চাহিবার সাহস হইল না।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে ভদ্রলোকটির জ্ঞান হইল। তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ভবরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? আমার নিকট আপনার কি প্রয়োজন?"

ভদ্রলোকটি ক্রন্দন-মিশ্রিত স্বরে করযোড়ে ভবরামকে বলিল—"আমি মহাপাপী! আমার পরিচয় আপনাকে কি দিব? আজ আমি আপনার চরণে শরণ লইতে আসিয়াছি! ব্রাহ্মণ চির-দিনই ক্ষমাশীল! আপনি আমাকে মহাপাপী বলিয়া কি ক্ষমা করিবেন না?

ভবরাম কি বলিতে যাইতেছিলেন। ভদ্রলোকটি অজস্র জলধারায় বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া করযোড়ে বলিলেন, "আপনি কোন কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না। অগ্রে আমাকে হৃদয়ের ভার নামাইতে দিন্! আমার প্রাণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, পাপরূপ বিষধর সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া আমার হৃদয়ে তীব্র দংশন করিতেছে! বিষের জ্বালায় আমার জীবন দুর্ব্বহ হইয়াছে। অনুতাপানলে আমার হৃদয় ভস্মীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছে। উঃ কি তীব্র যাতনা! তার কি ভীষণ মূর্ত্তি! মনে পড়িয়া আবার আমার অন্তরাত্মা দুর্ দুর্ করিতেছে। ঐ ঐ সেই ভীষণ ভ্রূকুটি, আমায় রক্ষা করুন—রক্ষা করুন।" লোকটা এই বলিয়া ছিন্ন কদলী-বৃক্ষের ন্যায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূমিতে পতিত হইল।

করুণাময় তাড়াতাড়ি জল ও ব্যজন লইয়া আসিলেন। ভবরাম মস্তক ও চক্ষে জল সেচন করিতে লাগিলেন। ভদ্রলোকটি উভয় ভ্রাতার শুশ্রূষায় শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইলেন। একটু সুস্থ হইয়াই তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "আপনি আমায় কোন কথা

জিজ্ঞাসা করিবেন না! আপনার চরণে অগ্রে আমার প্রাণের যাতনা নামাইতে দিন্! বিষের জ্বালায় আমি জ্বলিয়া যাইতেছি। এ বোঝা আমি আর বহিতে পারি না! অতি কষ্টে বোঝা লইয়া আপনার চরণ সমীপে আসিয়াছি! যতক্ষণ পথে আসিয়াছি, দুই হস্তে বুক চাপিয়া ধরিয়া আসিয়াছি! উঃ কি যাতনা! সহস্র সূচী বিদ্ধ হইলেও বোধ হয় এত যন্ত্রণা হয় না।

"এতদিন এই পাপের বোঝা বহিতেছিলাম। কোনই কষ্ট ছিল না। কেবল এক একবার বুকের ভিতর ধিকি ধিকি করিয়া আগুনের শিখা জ্বলিয়া উঠিত! কার্য্যান্তরে মন নিয়োজিত করিলেই পরক্ষণে তাহা নিবিয়া যাইত।

"কিন্তু আজ—উঃ! সে কথা আর বলিতে পারিব না! জানি না—কে সেই মহাপুরুষ!!! প্রতিদিনের ঘটনা, প্রতি পলের ঘটনা, যাহা আমি ব্যতীত কস্মিন্‌কালে কখন কাহারও জানিবার উপায় ছিল না, সেই সমস্ত গুপ্ত কথা, গুপ্ত অভিসন্ধি—গুপ্ত ঘটনা—গুপ্ত রহস্য তিনি কি করিয়া জানিলেন?

"আপনাকে কিছুই গোপন করিব না। প্রাণের অন্তঃস্তলে যে কথা লুকান আছে, অদ্য তাহা আপনাকে বলিব! উঃ আবার সেই মহাপুরুষের ভ্রুকুটি মূর্ত্তি আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে!

"আমি অনাচারী,—ধর্ম্মভ্রষ্ট, স্বধর্ম্মানুমোদিত কোন কর্ম্ম কখনও করি নাই। জাতিভেদ মানি নাই। ব্রাহ্মণ চণ্ডালে

কখনও প্রভেদ মানি নাই? সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান। ব্রাহ্মণকে ভক্তি করিতে হয়, প্রণাম করিতে হয়, একথা যে বলিত, তাহাকে ভণ্ড—প্রতারক বলিয়া অনথা কটূক্তি করিয়াছি। শালগ্রাম শিলাকে পাথরের নুড়ি বলিয়া ঘৃণা করিয়াছি। কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রতিমাকে খড় ও মাটীর দেবতা বলিয়া মনে মনে উপহাস করিয়াছি। ভাবিতাম, হিন্দু ব্রাহ্মণগুলার সকলই দুষ্টামি। সন্ন্যাসী যোগীর কথা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতাম। মনে হইত কোন যুগে হয় ত যোগী-সন্ন্যাসী ছিল, কিন্তু এখন কেবল ভণ্ডামিতে পরিণত হইয়াছে। বেদ-বেদাঙ্গাদি হিন্দুর পবিত্র শাস্ত্র কোন দিন স্পর্শ করি নাই, চিরদিনই ঘৃণা করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু আজ মুহূর্ত্তের ঘটনায় যে শক্তির পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, হিন্দুর যাহা কিছু সবই সত্য— সকলই জাগ্রৎ! একবিন্দুও মিথ্যা নহে।

"আমি কায়স্থ সন্তান; হিন্দু বলিয়া যে খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিতে হয়, তাহা কোনও দিন করি নাই। বিজাতীয় খাদ্য রাক্ষসের মত চিরদিনই ভক্ষণ করিয়া আসিয়াছি।

"আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এম, এ, বি, এল, পরে এটর্ণি হইয়াছি। এই বিদ্যাই আমাকে অবিদ্যারূপে গ্রাস করিয়াছে। এখন বুঝিতেছি, আমি যদি হিন্দু-শাস্ত্র আলোচনা করিয়া হিন্দুর মত থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে এত অধর্ম্মা-

চরণের প্রবৃত্তি হইত না। অভাব-রাক্ষসীর ভয়ে "হয় কে নয়" "নয় কে হয়" করিয়া অর্থের জন্য ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিতে হইত না। অর্থের জন্য নরঘাতক দস্যুতে যাহা করিতে ইতস্ততঃ করে, আমি তাহা অম্লানবদনে করিয়াছি। আইনের কূটতর্কে রামের ধন শ্যামকে, শ্যামের ধন রামকে দিয়াছি। টাকার জন্য গরিবের যাহা ন্যায্য প্রাপ্য, তাহা ধনীর অট্টালিকায় তুলিয়া দিয়াছি। কত দীনের অশ্রুধারা একত্র করিয়া অট্টালিকা, উদ্যান, গাড়ি জুড়ি, মণিমুক্তা, জহরতের অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিয়াছি। দস্যুরা জোর করিয়া লুণ্ঠন করে, আমি আইনের দোহাই দিয়া পরস্ব অপহরণ করিয়াছি। তাহারা বুঝিতে পারে না যে, আমার ন্যায্য সম্পত্তি কেন উড়িয়া গেল। দস্যুরা আমা অপেক্ষা অল্প অপরাধী। তাহারা প্রকাশ্যভাবে ধনরত্ন লুণ্ঠন করে, আর আমি সুশিক্ষিত দস্যু—লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়াছি।

"আমি হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের এটর্ণি ছিলাম। হরপ্রসাদ আমাকে যত বিশ্বাস করিতেন, বোধ হয় তিনি নিজেকে অতটা বিশ্বাস করিতেন না। বৈষয়িক সকল কার্য্যেই তিনি আমার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। আমি যাহা করিতাম, হরপ্রসাদ তাহার উপর আর কোন কথা কহিতেন না। প্রভূত অর্থ হাতে পাইয়া হরপ্রসাদ কুসঙ্গে মজিয়া কিছুদিন চরিত্রহীন হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার ন্যায় সরল উদার প্রকৃতির লোক আমি অল্পই

দেখিয়াছি। কপটতার ছায়ামাত্রও তাঁহার হৃদয় কখন স্পর্শ করে নাই।

"অসৎ সঙ্গীদের সহিত মিশিয়া—অত্যাচারে অনিয়মে অকালে হরপ্রসাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। কনিষ্ঠ রামপ্রসাদ তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন। সামান্য কারণে রামপ্রসাদ গৃহত্যাগ করিয়া যাওয়ায় স্বাস্থ্যভঙ্গের উপর তাঁহার হৃদয় একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। ভ্রাতৃহীন হইয়া তিনি পৃথিবী শূন্য দেখিতে লাগিলেন। আমার গলদেশ বেষ্টন করিয়া রামপ্রসাদের জন্য তিনি কতদিবস রোদন করিয়াছেন। তাঁহার সেই করুণ রোদনের কথা মনে পড়িলে এখনও আমার ন্যায় নির্ম্মম নিষ্ঠুরের চক্ষু দিয়াও জল পড়ে। ভ্রাতৃহারা হইয়া তিনি জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি ক্রন্দনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

"ভ্রাতৃশোকে তাঁহার পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চিকিৎসকের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। যাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়, স্থূলদর্শী চিকিৎসকে তাহার কি করিবে? হরপ্রসাদের সাধ্বী স্ত্রী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া স্বামীর শিয়রে বসিয়া অহোরাত্র সেবা করিত, আর দেবরের জন্য রোদন করিত। ক্রমশঃ হরপ্রসাদের শেষ দিন সমাগত হইয়া আসিল। একদিন তিনি আমার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমি চলিলাম; কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি একটি উইল করিয়া যাইতে চাই। আমি

জীবিতাবস্থায় আপনি উহা রেজেষ্টারি করিয়া দিন্। এই সেই উইল।” এই বলিয়া ভদ্রলোকটী উইলখানি বাহির করিয়া ভবরাম ও করুণাময়ের নিকট পাঠ করিতে লাগিলেন। আমরা উইলের আবশ্যক কথাগুলি পাঠকগণকে শুনাইতেছি।

(হরপ্রসাদের উইলের মর্ম্ম)।

“আমার নাম শ্রীহরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। পিতা ৺জনার্দ্দন চট্টোপাধ্যায়। আমার পিতা তাঁহার শ্বশুর ৺ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায়ের উইলের সর্ত্তানুসারে তাঁহার ত্যজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ’ন। চৌরঙ্গীর দুইখানি ত্রিতল অট্টালিকার মূল্য অন্যূন একলক্ষ টাকা, বিডন্ ষ্ট্রীটের তিনখানি বাড়ী, একলক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ, চিৎপুর রোডের বাসভবন এবং অলঙ্কার ও নগদ প্রায় দুইলক্ষ টাকা পিতৃদেব তাঁহার শ্বশুরের কৃত উইল অনুযায়ী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পিতৃদেব শ্বশুরের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে বাৎসরিক একলক্ষ টাকা আয়ের কতকগুলি জমিদারী নিলামে ক্রয় করেন। এই সমস্ত সম্পত্তির মালিক আমি শ্রীহরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

“আমার কনিষ্ঠ আমারই দোষে অভিমানে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে। ভ্রাতার সন্ধান পাইবার জন্য আমি চেষ্টার ক্রটী করি নাই। এমন স্থান নাই যেখানে রামপ্রসাদের সন্ধানের জন্য লোক

না পাঠাইয়াছি, সকল চেষ্টায় হতাশ হইয়া ভ্রাতৃশোকে আমি আজ মৃত্যু শয্যায় শায়িত।

"আমার সন্তানাদি নাই। আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী আমার স্ত্রী শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবী। রামপ্রসাদ অবিবাহিত। আমি এই চরমপত্রে বিষয়-সম্পত্তির যাহা বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেছি, তাহাই বাহাল থাকিবে। আমাদের আর কোন ওয়ারিষান নাই। আমরা দুই ভ্রাতাই আমাদের পিতার ত্যজ্য সম্পত্তির একমাত্র মালিক।

আমি স্ব-ইচ্ছায় উইল করিয়া যাইতেছি যে—

১। আমি কনিষ্ঠ রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে অর্দ্ধেক সম্পত্তি বাদে আমারও অর্দ্ধেক অংশ দান করিয়া যাইতেছি। রামপ্রসাদ পূর্ণ ষোল আনা সম্পত্তির মালিক হইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পারিবে।

২। আমার স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবী আমার মৃত্যুর পর চিরজীবন একখানি বাড়ী ব্যবহার করিতে পাইবেন। এই বাড়ীতে থাকিয়া তিনি বিধবার উপযুক্ত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিবেন। পূজা অর্চ্চনা করিবেন। তাঁহার দান ও ব্রতাদির জন্য যাহা প্রয়োজন হইবে, রামপ্রসাদ বিধবাকে প্রদান করিবেন।

৩। বিধবা হেমাঙ্গিনী দেবীকে আমার কনিষ্ঠ রামপ্রসাদ যে কোন একখানি বাড়ী ইচ্ছাপূর্ব্বক দিবেন, তাহাই তিনি জীবনকালে ব্যবহার করিবার জন্য গ্রহণ করিবেন।

৪। আমার স্ত্রী হেমাঙ্গিনীর পঞ্চাশ হাজার টাকার যে অলঙ্কার আছে, তাহা তাহার নিজের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। আমার স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবীর ব্রহ্মচর্য্যপালন, তীর্থ-ভ্রমণ ও দান-পুণ্যের জন্য যাহা ব্যয় হইবে, তাহা কনিষ্ঠ রামপ্রসাদ দেশ, কাল, পাত্র অনুসারে নিজের বিবেচনা মত প্রদান করিবেন। আমার স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবী স্বাধীনভাবে বা যদৃচ্ছা কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না।

৬। যদি আমার ভ্রাতা রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আর গৃহে প্রত্যাগমন না করেন, অথবা তাঁহার যদি মৃত্যু হইয়া থাকে বা সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া সন্ন্যাসের পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন, তবে রামপ্রসাদ সংসার বন্ধন ত্যাগকালে এই বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে যদি কোনরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়া থাকেন, অথবা তাহার কোন স্নেহের পাত্র বা পাত্রীকে বিষয়-সম্পত্তি দানের কোন লেখাপড়া বা বাচনিক কাহারও কাছে কিছু বলিয়া গিয়া থাকেন, তবে তাহার ইচ্ছা মত কার্য্য হইবে। অর্থাৎ এই সমস্ত সম্পত্তি রামপ্রসাদের শেষ ইচ্ছা অনুসারে তিনি বা তাঁহারা প্রাপ্ত হইবেন।

"ইহাই হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের উইলের মর্ম্ম। এই উইলখানি তিনি জীবিতকালেই রেজেষ্টারী করিয়া আমার হাতে দিয়া যান এবং তাঁহার মৃত্যুর পর আমাকেই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা

করিতে বলিয়া যান। স্বামী ও দেবরের শোকে হরপ্রসাদের স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর তিন মাস পরেই স্বর্গধামে চলিয়া যান। সেই সতীর পঞ্চাশ সহস্র টাকার জড়োয়া অলঙ্কারগুলি আমার নিকটেই আছে। কতবার তাহা আমি লৌহ-সিন্দুক হইতে বাহির করিতে গিয়াছি, কিন্তু স্পর্শ করিতে পারি নাই। স্পর্শ করিতে গেলেই দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠে! সতীর অন্তিমবাক্য মনে পড়ে। মৃত্যুকালে মা আমার হাতে ধরিয়া বলিয়াছিলেন—"বাবা! আমার স্বর্গগত স্বামী আপনাকে প্রাণের সহিত বিশ্বাস করিতেন। আমি তাঁহার কাছেই যাইতেছি। আমার অলঙ্কারগুলি দেবর রামপ্রসাদকে দিও। আমার অন্তিম অনুরোধ, দেবর যেন এই অলঙ্কারগুলি দ্বারা স্বামী-পুত্রহীন আমার মত নিরাশ্রয়া বিধবাদের অন্নের সংস্থান করিয়া দেন।" আজ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। চাবি লইয়া অলঙ্কারগুলি বাহির করিতে যাইবার সময় কে যেন আমাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—"পাষণ্ড! সমস্ত গ্রাস করিয়াছ, এখনও তোমার ক্ষুধা মিটে নাই? সাবধান! সতীর অলঙ্কারে হস্তার্পণ করিও না। তোমার সর্ব্বনাশ হইবে। তাঁহার অন্তিমবাক্য স্মরণ কর।

"আমি বসিয়া পড়িলাম। অলঙ্কারগুলি বাহির করিবার জন্য আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। আমি নাস্তিক, অধার্ম্মিক,

মনে করিলাম, এটা আমার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা! অদ্য স্থগিত রহিল, অন্য একদিন যাইয়া বিক্রয় করিয়া আসিব।

"আমার একজন সহপাঠী বন্ধু আছেন। তিনিও একজন প্রসিদ্ধ এটর্ণি। আমি তাঁহার নাম মুখে আনিতে পারিব না। তাঁহার কথা উত্থাপন করিতে হইতেছে, এইজন্য ক্রোধে ও ঘৃণায় আমার হৃদয় অস্থির হইতেছে।

"এই বন্ধুটি হরপ্রসাদের আত্মীয়। দূর-সম্পর্কে ভগ্নীপতি হইতেন। হরপ্রসাদ ভগ্নীপতির আচরণে তাঁহাকে চিরদিনই ঘৃণা করিতেন। সাক্ষাৎ হইলেও কথা কহিতেন না। ইঁহার এক সন্তান আছে, নাম কৃষ্ণকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

"আমার এই বন্ধু হরপ্রসাদের মৃত্যুর পরেই আমাকে নানা-রূপে প্রলুব্ধ করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম তাঁহার প্রস্তাবে আমার ঘৃণা হইয়াছিল; কারণ তখনও আমার বিবেক একেবারে আমায় পরিত্যাগ করে নাই। এক লক্ষ, দেড় লক্ষ, দুই লক্ষ ক্রমশঃ তিন লক্ষ টাকায় উঠিয়া সে আমাকে অহোরাত্র প্রলোভিত করিতে লাগিল। অর্থের মোহিনী শক্তিতে আমি সব ভুলিলাম। একদিন বন্ধু বলিলেন, "হরপ্রসাদের এখন ত আর কেহ ওয়া-রিশান্ নাই। রামপ্রসাদ বহুদিন হইল অরণ্যে ব্যাঘ্রের কবলে পতিত হইয়াছে। হেমাঙ্গিনীও হরপ্রসাদের সঙ্গিনী হইয়াছে। আমার পুত্র কৃষ্ণকান্ত একটু দূর-সম্পর্কীয় হইলেও—হরপ্রসাদের

ভাগিনেয়। লোকতঃ—ধর্ম্মতঃ—মাতুলের বিষয় ভাগিনেরই প্রাপ্য। আইনেও কোন গোল বাধিবে না। তুমি সম্মত হইলেই সব গোল মিটিয়া যায়।”

“বন্ধু দুই তিনখানি জাল দলিলও প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন অর্থলোভে আমি ন্যায়, ধর্ম্ম পদদলিত করিলাম। আমার শিক্ষা, দীক্ষা, প্রতিষ্ঠা, সংযম সবই যেন স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল। হায়! অর্থ—তোমার শক্তি কি ভীষণ! অর্থলোভে—দস্যু —নিরীহ, নিরপরাধ অবলা ও শিশু হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় না— পুত্র পিতার বিরুদ্ধাচারণ করিতে লজ্জাবোধ করে না—ভ্রাতা, ভ্রাতার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থাপিত করিতে কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হয় না— বন্ধু বন্ধুর প্রতি গুপ্ত মিছরির ছুরি প্রয়োগ করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতে কাতর হয় না। হায়! অর্থ, তোমার কুহকে যে পড়িয়াছে —সে নিস্তার পাইয়াছে কি? কত শত সহস্র গৃহ এই অর্থের জন্য যে আজকাল উৎসন্নের পথে যাইতে বসিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি ত কোন্ ছার! অর্থলোভে আমি মজিলাম। শয়তান আমায় প্রলোভিত করিল। মানুষ যখন শয়তানের করায়ত্ব হয়, তখন তাহার হিতাহিত বুদ্ধি থাকে না—অকৃত্রিম মিত্রও তখন শত্রুতে পরিণত হয় এবং সেই পাপরূপ পিশাচই তখন তাহার একমাত্র উপদেষ্টা হইয়া থাকে। যে হরপ্রসাদ আমাকে নিজের মত বিশ্বাস করিয়া বিষয়াদির ভার দিয়া গিয়াছিলেন, আমি বিশ্বাস-

ঘাতকতা করিয়া শয়তানের পরামর্শে তাঁহার সেই অন্তিম বাক্যকেও অবহেলা করিলাম। অর্থের লোভে নিজে উদ্যোগী হইয়া রামের ধন শ্যামকে দিলাম। ভাগিনেয় কৃষ্ণকান্ত বন্দোপাধ্যায়কেই হরপ্রসাদের ত্যজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলিয়া আদালতে প্রমাণ করিলাম। হরপ্রসাদের উইল লইয়া কেহই প্রতিবাদ করিতে দণ্ডায়মান হইল না।

"আজ আফিস হইতে দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে ফিরিয়া আসিলাম। আমার মন যেন ক্ষিপ্তবৎ হইয়া উঠিল। নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ করিয়া শয্যাপরি শয়ন করিলাম। ভূত ভবিষ্যতের চিন্তা একত্রে অগ্নি গোলকের মত সজোরে আসিয়া বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে লাগিল। উঃ! সে কি প্রাণঘাতী যাতনা! এমন সময় সেই নির্জ্জন দ্বার-রুদ্ধ গৃহে কোথা হইতে এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইল! তাহার চক্ষু দুটি অগ্নির মত জ্বলিতেছে, জটারাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত! উঃ! কি ভীষণ মূর্ত্তি! আমি তাহা দেখিয়াই মনে করিলাম যেন মহাদেব রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে কৃত অপরাধের জন্য বিনাশ করিতে আসিয়াছেন। সন্ন্যাসীর দিকে আমি বেশীক্ষণ চাহিতে পারিলাম না! ক্রমে আমি যেন জ্ঞানশূন্য হইলাম। তন্দ্রাভিভূত স্বপ্নের ন্যায় তাঁহার বজ্রবাণী আমার শ্রবণের ভিতর দিয়া মরমে আঘাত করিতে লাগিল।

"আমি সংজ্ঞাশূন্য কি তন্দ্রাভিভূত কিছুই বুঝিতে পারিলাম

না। সন্ন্যাসী বজ্রগম্ভীরস্বরে যেন বলিতে লাগিলেন, "পাপিষ্ঠ! তোরই জন্য নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ অপমানিত! এতদ্ভিন্ন কত নির্দ্দোষীকে তুই পথে বসাইয়াছিস্, কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্, একবার স্মরণ করিয়া দেখ্।" বজ্রনিনাদে এই কথাগুলি বলিয়া পরে বলিলেন, "দেখ্ পাপিষ্ঠ তোর কৃতকর্ম্মের চিত্র দর্শন কর।" তারপর বায়স্কোপের ছবির মত একে একে অতি গোপনে অনুষ্ঠিত আমার পাপ কার্য্যগুলি—আমার চক্ষের উপর নৃত্য করিতে লাগিল। পাপের পরিণাম কি তাহাও দেখাইলেন। বেদবিধি মিথ্যা নহে—তাহারও চাক্ষুষ প্রমাণ আমার দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া গেল! ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ-পুণ্যের ছবি অতি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হইতে লাগিল। বিদেশী শিক্ষা-দীক্ষার পরিণামও তিনি দেখাইলেন। ওঃ! সে কি ভয়ঙ্কর! প্রাণ শিহরিয়া উঠিতেছে! স্বর্গপুরে হরপ্রসাদ ও হেমাঙ্গিনী বিচরণ করিতেছেন, তাহাও দেখিয়া নয়ন সার্থক করিলাম। পুণ্যাত্মা রামপ্রসাদের যোগ ও সাধনা, পুণ্য-মলয়ানিলের ন্যায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ হরপ্রসাদ ও পুণ্যময়ী হেমাঙ্গিনীর পূত অঙ্গে লাগিয়া তাঁহাদের পুণ্যপ্রভাকে আরও বর্দ্ধিত করিতেছে। যোগ-প্রভাবের এই আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। হিন্দুর ক্রিয়া-কলাপ, দান, ব্রত, প্রতিমা পূজা, রীতিনীতি যে পরকাল ও স্বর্গের সঙ্গে সমসূত্রে বাঁধা—তাহাও চাক্ষুষ দেখিলাম। আর দেখিলাম—ব্রহ্মতেজ! হিন্দু সতীর সতীত্বগরিমা!

"তারপর দুরাচার কৃষ্ণকান্তের দ্বারা আপনি যে প্রকারে অপমানিত হইয়াছেন—সেই চিত্র তিনি আমার নয়নসমক্ষে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ্ অবিশ্বাসী স্বধর্ম্মদ্বেষী হিন্দু! চাহিয়া দেখ! ব্রহ্মশক্তি, ব্রহ্মতেজ অপমানিত হইতেছে! ভবরাম সে তেজ সংবরণ করিয়া রহিয়াছেন। ভবরাম ব্রহ্মতেজ সংবরণ করিয়া না রাখিলে কৃষ্ণকান্তকে রক্ষা করিবার কাহারও সাধ্য ছিল না। দেখিলাম, আপনি চক্ষু মুদিয়া কৃষ্ণকান্তের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন।

"দেখিলাম সতীলক্ষ্মীর সতীত্ব গরিমা! যখন আপনি অপমানিত, সেই সময়ে আপনার সহধর্ম্মিণীর হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল! তিনি করযোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে বসিলেন। আর দেখিলাম, কনিষ্ঠের হৃদয়ের সহিত জ্যেষ্ঠের হৃদয়ের কি অপূর্ব্ব সৌসাদৃশ্য! আপনার অনুজ করুণাময় তখন কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত ছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তিনি বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিলেন। হৃদয়ের তার যেন কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু করুণাময় বুঝিতে পারিলেন না, কোথা হইতে কিরূপে হৃদয়ের তারে টান পড়িল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "দেখ্ পাষণ্ড এখনও বুঝিয়া দেখ্, হিন্দুর ক্রিয়া-কর্ম্ম, মন-প্রাণ, কেমন সমসূত্রে বাধা! উঃ! আরও কত দেখিলাম, আর বলিতে পারিতেছি না। মুহূর্ত্তের মধ্যে এই সমস্ত ঘটনা আমার চক্ষের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল।

আবার সেই সন্ন্যাসীর রুদ্রমূর্ত্তির কথা মনে পড়িতেছে। এখন বুঝিয়াছি, হরপ্রসাদ ও রামপ্রসাদের সমস্ত সম্পত্তিই মা ঝামেরিয়ার। আমিই প্রধান পাপী! আমি বিচারকের সম্মুখে বলিব, আমার চক্রান্তেই এই বিচার-বিভ্রাট ঘটিয়াছে! বিচারকের সম্মুখে সমস্ত সত্য বলিয়া, আমার পাপের কাহিনী বর্ণনা করিয়া, চিরজীবনের মত সশ্রম কারাবাস প্রার্থনা করিব। ইহাতে যদি পাপের একটুও প্রায়শ্চিত্ত হয়, তবে আমি সুখে মরিতে পারিব।

"উঃ আবার সেই ভীষণ মূর্ত্তি মনে হইতেছে! কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছে, আমায় একটু জল দাও।"

এই বলিয়া আবার ভদ্রলোকটি অচৈতন্যদেহে ভূমে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

ভবরাম ও করুণাময় এটর্ণি বাবুর মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিয়া নানা-প্রকার বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। ভদ্রলোকটি ব্যাকুল-চিত্তে বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল। উঃ অনুতাপযন্ত্রণা কি ভীষণ! তবুও মানব পাপ করিতে ক্ষান্ত হয় না!

ভবরাম বলিলেন—"আপনার পূর্ব্বজন্মের অনেক সুকৃতি সঞ্চিত ছিল। তাই নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের এই অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া-ছেন। বহু তপস্যা না করিলে মানব ঐশিক শক্তির অধিকারী হয় না এবং মানবের ইহা দৃষ্টিগোচর হয় না! আপনি পূর্ব্বজন্মে যোগরত মহাপুরুষ ছিলেন। কর্ম্মবিপাকে আপনাকে দিন কয়েক

বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছে। আপনার সুসময় আসিয়াছে, আর চিন্তা করিবেন না। এই কারণেই মহাপুরুষ আসিয়া আপনাকে দর্শন দিয়াছেন।

"আপনি নিজ মুখেই বলিয়াছেন যে, আপনি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান্ ছাত্র। বর্ত্তমান শিক্ষার শেষ পর্য্যন্ত আপনি কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এক্ষণে এই সন্ন্যাসীর হঠাৎ আগমন সম্বন্ধে কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন কি? কোন্ শক্তিবলে সন্ন্যাসী আমার নির্যাতন অবগত হইয়াছেন, তাহা বোধ হয় আপনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। আমি আপনাকে সহজ কথায় ইহা বুঝাইতেছি, শ্রবণ করুন্।"

ভদ্রলোকটী বলিলেন, "মানসিক শক্তিবলে মানব অনেক সংবাদ রাখিতে পারে। এ সম্বন্ধে আজকাল প্রতীচ্য জগতেও বহু আন্দোলন হইতেছে—ইহা আমি পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, কিন্তু বাস্তবিকই মানসিক শক্তিটা কি, তাহা বুঝিতে পারি নাই। আমাদের দেশে পুরাকালে মুনি-ঋষিগণ এই শক্তিবলে অনেক দুঃসাধ্য কার্য্য করিয়াছেন—এই প্রকার ঘটনা আমাদের বহু শাস্ত্র-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে; কিন্তু অবজ্ঞা করিয়া তাহা কখনও পাঠ করি নাই। হিন্দুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বরাবরই হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ আবর্জ্জনারাশি—এই প্রকার ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, তাহা উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি।

এক্ষণে আমায় দয়া করিয়া বলুন—কি শক্তিবলে সন্ন্যাসী এই সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়াছেন। প্রথমতঃ বুঝাইয়া দিন, সন্ন্যাসী কি করিয়া আমার রুদ্ধগৃহে প্রবেশ করিলেন।”

ভবরাম হাসিয়া বলিলেন, “যে ত্রিকালজ্ঞ সন্ন্যাসীদিগের নিকট ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কিছুই অবিদিত থাকে না, তাঁহারা বহু আরাধনায়—বহু সাধনায় এই শক্তি অর্জ্জন করিয়া থাকেন। মানসিক শক্তি কি, আমি তাহাই আপনাকে বলিতেছি—আর সন্ন্যাসী কি করিয়া আপনার সুরক্ষিত গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা কি বুঝিতে পারেন নাই? আমাদের এই শরীর জড়ের সমষ্টি; অস্থি, মেদ, মাংস ও রক্তে এই শরীর গঠিত হইয়াছে। আমরা এই জড়ের সেবাতেই ব্যস্ত থাকি; কিন্তু ইহার পরিণাম কি, তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখেন? ইহা হয় শ্মশানে ভস্মীভূত হইয়া, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমে মিশিবে—নতুবা সমাহিত হইয়া, মৃত্তিকাস্তূপে পরিণত হইবে। জড়ের শক্তি ও সীমা এই পর্য্যন্ত; কিন্তু প্রত্যেক মানবেরই একটী স্বতন্ত্র সূক্ষ্ম শরীর আছে; কিন্তু ব্যবহার হয় না বলিয়া ইহা অনুভূত হয় না। লৌহ ফেলিয়া রাখিলে যেমন ময়লা ধরিয়া উহা নষ্ট হয়—সেই প্রকার ইহা অব্যবহারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিয়া সিদ্ধ তাপসগণ যদৃচ্ছা গমন করিতে পারেন, কেহ তাঁহাদিগকে

বাধা দিতে পারে না। হিন্দুর এই অলৌকিক কার্য্য, প্রতীচ্য সমাজ বুঝিতে পারে না বলিয়াই তাহারা উপহাস ও বিদ্রূপের ছলে ইহার আলোচনা করিয়া থাকেন—আর আমরা তাহাই পাঠ করিয়া, স্বধর্ম্মে বীতরাগ হই এবং ক্রমে ক্রমে নাস্তিকতা আসিয়া আমাদের হৃদয় অধিকার করে। কিরূপে মানব এই ক্ষমতার অধিকারী হয়, তাহা বুঝান বড় শক্ত। যেমন তৈলঙ্গ স্বামী গঙ্গাগর্ভ হইতে দুইখানি একই প্রকার তরবারি উত্তোলন করিয়া ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডকে বিমোহিত করিয়াছিলেন এবং কিরূপে তিনি এই ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝান যেরূপ দুরূহ—এই সূক্ষ্ম শরীর তত্ত্ব আলোচনা করাও মানবের পক্ষে তদ্রূপ। যোগমার্গে বেশীদূর অগ্রসর না হইলে, ইহা বুঝিতে পারা যায় না। আজ আর আমি এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিব না। এক্ষণে গুরুদেব কি শক্তিবলে আপনার নিগূঢ় কাহিনী জানিতে পারিয়াছেন, তাহাই বলিব।”

ভদ্রলোকটী বলিলেন, “সূক্ষ্ম শরীর ধারণ সম্বন্ধে আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই আমি ইহা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি। যাঁহাকে আজ আমি দেখিয়াছি—তাঁহার পক্ষে এই প্রকার সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তিনি যে একজন অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন অলৌকিক পুরুষ, তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি।”

ভবরাম বলিলেন, "মানসিক শক্তি কি, তাহা আমাদের দেশে অনেকেই জানেন না অথবা জানিতে চেষ্টাও করেন না। আজকাল থিয়োজফীষ্ট সম্প্রদায় এই সম্বন্ধে আমেরিকায় সামান্য আলোচনা করিতেছেন এবং আমরা তাহাই পাঠ করিয়া প্রশংসা করিতেছি। নিজের জিনিসের অপরের মুখে ব্যাখ্যা শুনিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি। এই হিন্দু-শাস্ত্র, পূর্ব্বে মানসিক শক্তিসম্বন্ধে বিশদ্ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। চতুর্ব্বেদের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মানসিক শক্তিবলেই যে সনকাদি ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, একথা শুনিলে, আধুনিক লোকেরা হাস্য করিয়া থাকেন; কিন্তু যিনি এই বিশাল জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন—এই লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, জল, পাহাড়, মরুভূমি প্রভৃতি যাহার সৃষ্টি, তাঁহার মানসিক শক্তি সম্বন্ধে অন্য ধারণা করা সম্পূর্ণ অলীক। আমরা কিছুই জানি না—কিছু বুঝি না বলিয়া, এই ভ্রম-বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে।

"পৃথিবীতে এমন কোনও কার্য্য নাই, যাহা এই শক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত না হইতে পারে। মানব এই শক্তি পাইলে, সমস্ত জ্ঞান লাভ করিতে পারে। এই মানসিক শক্তি, ধরিতে গেলে সকল শক্তির মূলাধার। জাগতিক, শারীরিক, মানসিক, ভৌতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি যাবতীয় শক্তি ইহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।

হিন্দু-শাস্ত্র বলেন, যে, মানসিক শক্তি ঐশিক ক্ষমতার অংশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। যিনি যে পরিমাণে এই শক্তি সঞ্চয় করিতে পারেন, তিনি ঈশ্বরের নিকট ততই অগ্রসর হইতে পারেন। মানবজীবনে ঈশ্বরলাভ ভিন্ন আর কোনও উদ্দেশ্য নাই। যে দিক দিয়াই হউক না কেন—সকলেই এই একমাত্র উদ্দেশ্য লইয়া চলিয়াছে। হিন্দু নির্ব্বাণ চাহে না—মোক্ষ চাহে না—মুক্তি কামনা করে না—ঐশ্বর্য্যলাভের আকাঙ্ক্ষা করে না—তাহারা প্রার্থনা করে, যেন ভগবানের দর্শন লাভ তাহাদের অদৃষ্টে ঘটে। যাহারা ডাকিবার মত ডাকিতে পারে, তাহারা সাফল্য লাভ করে; আর যাহারা ডাকিতে চাহে না, কিংবা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তাহারা বাইবেল-বর্ণিত অভিশপ্ত য়িহুদীর ন্যায় চিরজীবন নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া বেড়ায়।

"যদি ঈশ্বরলাভই মানবের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে এই মহিয়সী শক্তির উৎকর্ষ সাধন করা কি কর্ত্তব্য নহে? এক্ষণে দেখা যাউক, কি করিয়া এই ক্ষমতার উপর আধিপত্য স্থাপন করা যাইতে পারে। জগতের প্রত্যেক পদার্থ বিশেষ সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করাই মানসিক উন্নতির ভিত্তি। শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে কি সম্বন্ধ আছে, তাহা অবগত হইলেই ইহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারা যায়। শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। মানসিক শক্তি প্রবল—শারীরিক শক্তি

দুর্ব্বল! মানসিক শক্তি ধরিতে গেলে পৃথিবীতে সৃজন, পালন ও লয় কার্য্য সম্পাদিত করিতেছে। যদি মনুষ্য চিকিৎসক সাজিয়া ঔষধ প্রয়োগে রোগের উপশম করিতে পারে, তবে কে বলিতে পারে যে, সেই মনুষ্য জাগতিক শক্তির উপর কর্তৃত্ব করিতে অসমর্থ! মানবের মানসিক উৎকর্ষতাসম্ভূত তিনটি শক্তিময় পদার্থের সমষ্টিতে, মানসিক শক্তি সংগঠিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে, প্রথম চিন্তাশক্তি—দ্বিতীয় একাগ্রতা—তৃতীয় মানসিক দৃঢ়তা। আমাদের শাস্ত্র বলেন যে, ঈশ্বরের তিনটি শক্তি প্রত্যেক জীবে সমভাবে বর্ত্তমান আছে। এই তিনটি শক্তি যথাক্রমে ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ শক্তি ইহাদের নামান্তর মাত্র। মানবের মন কখন স্থির থাকিতে পারে না। এই মনের প্রয়োজনের জন্য (অর্থাৎ যখন মন কোন চিন্তা না লইয়া থাকিতে পারে না) যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাকে চিন্তাশক্তি কহে। চিন্তাশক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া একাগ্রতার সৃষ্টি করে। এই একাগ্রতা হইতেই মনের দৃঢ়তা আসিয়া উপস্থিত হয়। মনে করুন, আপনার মনে কোন চিন্তার উদ্রেক হইল; কিন্তু তাহা তখনই বিলীন হইয়া গেল—এই চিন্তা কখনও কার্য্যকরী হইতে পারে না; কিন্তু এই চিন্তা যদি আবার মনে ক্রমাগত উদিত হইতে থাকে, তাহা হইলে একাগ্রতা জন্মিবে। এই দৃঢ় একাগ্রতা না হইলে মানসিক দৃঢ়তা আসিয়া উপস্থিত হয় না।"

ভদ্রলোকটী বলিলেন, "এই দৃঢ়তা লাভ করিতে হইলে কি বিশেষ সাধনা করিতে হয়? মনে করুন, আমি একটা জটিল মোকদ্দমার বিষয় চিন্তা করিতেছি এবং বেশ বুঝিতেছি, আইনের কূট তর্কে কিছুতেই ইহা ধর্ম্মাধিকরণে দাঁড়াইতে পারিবে না। এই সময় হঠাৎ একটা সূক্ষ্ম তথ্য আমার মস্তকে উদিত হইল। আমি কার্য্যক্ষেত্রে সেই সূক্ষ্ম তথ্যকে অবলম্বন করিলাম—আমার জয়লাভ হইল। এই চিন্তাশক্তি ধারণাশক্তি দৃঢ় হইলেই, কি মানসিক দৃঢ়তা আসিয়া উপস্থিত হয়?"

ভবরাম বলিলেন, "ঠিক তাহাই হয়। এই একত্র মিলিত ত্রিবিধ শক্তি এরূপভাবে পরস্পর সংশ্লিষ্ট যে, একটীর অবর্ত্তমানে অন্যের আবির্ভাব অসম্ভব। চিন্তা হইতে উৎসাহ আইসে—উৎসাহ হইতে বল আইসে এবং উভয়ের সমবায়ে গতি ও কার্য্য সম্পন্ন হয়। আপনি একটী কার্য্য করিতে করিতে চিন্তা করিতেছেন, এই চিন্তা দ্বারা আপনি উৎসাহ প্রাপ্ত হইবেন—তারপর বল পাইবেন। যদি আপনি সেই সময়ে শয়ন করিয়াও থাকেন, তাহা হইলে আপনার উঠিবার শক্তি আসিবে—এই শক্তি দ্বারাই গতি ও কার্য্য সম্পন্ন হয়। এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, চিন্তাশক্তি দ্বারা সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। এখন একাগ্রতার কি প্রয়োজন, তাহাই আলোচনা করা যাউক। কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই একাগ্রতার প্রয়োজন। একাগ্রতা না থাকিলে আপনি কোনও

কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন না। বৈষয়িক কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে, যখন একাগ্রতার প্রয়োজন, তখন ভগবানের দর্শন লাভ কিংবা মোক্ষলাভ করিতে হইলে, কি প্রকার একাগ্রতার আবশ্যক, তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। এই একাগ্রতা লাভ করিবার জন্য যোগি-ঋষিগণ কঠোর তপস্যা করিতেন। অর্জ্জুনের একাগ্রতা ছিল বলিয়াই তিনি ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্যের সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। লক্ষ্যভেদের কথা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, একাগ্রতা ছিল বলিয়াই অর্জ্জুন "নরনারায়ণ" রূপে পূজিত হইয়াছিলেন। একাগ্রতা কার্য্যসিদ্ধির একমাত্র সোপানস্বরূপ। চিন্তাশক্তিকে মানসিক দৃঢ়তার অধীনে রাখিতে পারিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে এবং মানসিক দৃঢ়তার দ্বারাই চিন্তাসকল নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রেরিত হয়—ইহাই মানসিক দৃঢ়তার কার্য্য। এইরূপে চিন্তাশক্তি, একাগ্রতার দ্বারা রক্ষিত ও বর্দ্ধিত মানসিক দৃঢ়তার দ্বারা চালিত হইয়া, এরূপ অপরিমিত দৃঢ়শক্তি সম্পন্ন হয় যে, তখন কোনও পার্থিব বস্তু বা দূরস্থান তাহার কার্য্যের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। একটা উদাহরণ বলিতেছি শ্রবণ করুন। একদিন আমি গৃহে বসিয়া মনে মনে মনে চিন্তা করিতেছি যে, "ব্রাহ্মণ-সভার" কোনও কার্য্যপদ পাইলে আমি কৃতার্থ হইব। এই চিন্তাটা কেন যে তখন হঠাৎ আমার মনোমধ্যে উদিত হইয়াছিল,

তাহা বলিতে পারি না। তারপর এক পত্র ঠিক সেই সময়ে ডাকযোগে আসিয়া উপস্থিত হইল। পত্রে লেখা ছিল আমি "ব্রাহ্মণ সভার" কোষাধ্যক্ষপদে মনোনীত হইয়াছি। আমি ভাবিতে লাগিলাম, মানসিক শক্তির ইহা একটী শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। মানসিক শক্তি সকলেরই আছে, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কোন কোন দিন হয় ত প্রাতে উঠিয়া চারিদিকে আনন্দের চিহ্ন দেখিয়াও মনে কেমন একটা আশঙ্কার উদয় হয়, ঠিক সেইদিনই কোথা হইতে এক অতর্কিত বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপ দুঃখের চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও হয় ত কোন কোন দিন সুখলাভ করিতে পারা যায়। মন পূর্ব্ব হইতেই সুখ ও দুঃখের কথা জানিতে পারে। মনের অগোচর কিছুই থাকে না। এই সুখ ও দুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতাকেই মানসিক শক্তি বলে। এই শক্তির দ্বারা আমরা পরের ও নিজের চিন্তাসকল বুঝিতে সমর্থ হই। যদি আমরা চিন্তাশক্তিকে আমাদের মানসিক দৃঢ়তার দ্বারা পরিচালিত না করি, তাহা হইলে মন হইতে উৎপন্ন সেই চিন্তা, যে কোন ব্যক্তির নিকট চলিয়া যায়, তাহাতে আমাদের ও অপর ব্যক্তির যে কত ক্ষতি হয়, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

"আপনি যাঁহাকে সন্ন্যাসিরূপে দেখিয়াছেন—আমার সেই গুরুদেব বহু তপস্যার ফলে এই শক্তি লাভ করিয়াছেন।

তপস্যার গতি অতি সূক্ষ্ম। কোনও বংশে একটী তপস্বী ব্রহ্মচারী জন্মগ্রহণ করিলে সেই বংশ পরম পবিত্র হয়। তপঃপ্রভাবে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিকাল তপস্বীদিগের নিকট অবিদিত থাকে না।

"গুরুদেব বলিয়াছেন যে, কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য-কর্ম্ম অগ্রে মনে দৃঢ় করিতে হইবে। অপরিমিত ধৈর্য্যের সহিত কার্য্য-সিদ্ধি লাভের চেষ্টা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কোনও কার্য্যে কখনও উৎসাহ-হীন হইতে নাই। কোনও কার্য্য কিংবা কার্য্যের স্থির সিদ্ধান্ত করিতে অপর কোন ব্যক্তিকে সাহায্যার্থ আহ্বান না করিয়া নিজের বিবেক ও ভগবৎদত্ত শক্তি দ্বারা সম্পাদন করাই যুক্তিযুক্ত এবং এই আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই মানসিক শক্তি লাভ হয়। তিনি বলিয়াছেন যে, কতকগুলি নিয়ম পালন না করিলে মানসিক দৃঢ়তা লাভ করা যায় না। প্রত্যহ এই নিয়মগুলি সর্ব্বতোভাবে পালন করা আবশ্যক। তিনি বলেন যে, (১) জীব মাত্রেই স্বীয় কার্য্যের কর্ত্তা—এই প্রকার চিন্তা করিবে। জীব কখনও কোন কার্য্যে নিরুৎসাহিত বা উত্তেজিত হইবে না। (২) জীব কখনই রিপুর বশীভূত হইবে না। (৩) জীব কখনও কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে মন্দভাব হৃদয়ে পোষণ করিবে না। (৪) কোনও কার্য্য ব্যস্তভাবে সম্পন্ন করিতে নাই। (৫) কোনও কার্য্য অনুষ্ঠিত

হইবার পূর্ব্বে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া পশ্চাৎ অনুতাপ করা উচিত নহে। (৭) কোনও কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিতে নাই। (৮) কখনও অপরের অপকারক কার্য্য করিতে নাই। (৯) কখনও কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিতে নাই।

"কথাগুলি খুব সহজ। মানুষ একেবারে উচ্চে উঠিতে পারে না। তাহা হইলে তাহার পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা। অনেকেই আপন ক্ষমতার অধিক কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া শেষে সিদ্ধি লাভে হতাশ হন, কিন্তু যদি তিনি প্রথমেই আপন প্রথম কর্ত্তব্য নিরূপিত করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় সকল কার্য্যই সমাধা হইত। প্রধানতঃ কর্ত্তব্যকর্ম্মের কোন স্থির সিদ্ধান্ত না থাকাতেই তাঁহাদের নৈরাশ হইতে হয়।

"বর্ত্তমানে এই শক্তির সাধনা করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। নরজগতে উন্নতির শীর্ষস্থান অধিকার করিতে মানসিক শক্তি ভিন্ন আর অন্য কোনও উপায় মানবের নাই। প্রত্যেক নরনারী এই মানসিক শক্তি অধিকার করিয়া যাহাতে স্বাধীন হইতেও মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে এবং মানসিক, নৈতিক, জাগতিক ও শারীরিক শক্তিতে গঠিত হইয়া পৃথিবীর মধ্যে মনুষ্যত্বের আদর্শ দেখাইতে পারে, তাহারই চেষ্টা করা উচিত। যদি কেহ এই পথে যাইতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উপরোক্ত নিয়মগুলি মানিয়া চলিলে অনেক সাহায্য পাইবেন।

"এখন প্রভাতের আর বিলম্ব নাই, আপনি গৃহে গমন করিয়া বিশ্রাম করুন। দারুণ উত্তেজনায় আপনার মস্তিষ্ক এক্ষণে বিকল হইয়াছে। আর কোনও কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমার কনিষ্ঠ আপনাকে বাটী পৌঁছাইয়া দিবে। কল্য দ্বিপ্রহরে যাহা হয় পুনরায় কথোপকথন হইবে।"

করুণাময় একখানি শকট লইয়া আসিলেন—ভদ্রলোকটী প্রথমে কিছুতেই গমন করিতে স্বীকৃত হইলেন না। পরে অনেক অনুনয়-বিনয়ে তিনি দুঃখিত-চিত্তে শকটারোহণে নিজ গৃহে গমন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"দাদা! আপনি আর চতুষ্পাঠীর জন্য এত পরিশ্রম করিবেন না। আজ কাল আপনি এই কার্য্যে এরূপ ব্যস্ত থাকেন, যে প্রায়ই আপনার ভাগ্যে আহার ঘটিয়া উঠে না। এ বয়সে এতটা পরিশ্রম আপনার দেহ সহ্য করিতে পারিবে কেন? অহোরাত্র চতুষ্পাঠীর জন্য চিন্তা ও পরিশ্রম করিতে করিতে আপনার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। আজ কাল শরীরের দিকে আপনার বিন্দুমাত্র লক্ষ্য নাই। ঝামেরিয়া ও বৌদিদি সর্ব্বক্ষণই আপনার জন্য চিন্তা করিতেছেন।"

"ভাই! আমরা কর্ম্ম করিতে সংসারে আসিয়াছি। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যেন কর্ম্ম করিয়াই দেহত্যাগ করিতে পারি। কর্ম্ম ভিন্ন মানবের মুক্তি নাই। আসক্তিবশে সংসার ত্যাগ করিয়া কোন উচ্চ কর্ম্মই করিতে পারিলাম না। সংসারে থাকিয়া মানুষের যে সব কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা সম্পন্ন করিতে পারিলেও মানুষের মুক্তি হয়; কিন্তু ভাগ্যদোষে অদৃষ্টে তাহাও বুঝি ঘটিল না। আমার জন্য তোমরা চিন্তা কর কেন ভাই? কালপূর্ণ হইলে, দেহ জীর্ণ হইলে, নববস্ত্র পরিধানের

ন্যায় আত্মা কর্ম্মফলানুসারে অন্য দেহ আশ্রয় করিবেই। তাহাতে আর শোক দুঃখ কি ভাই? এক সঙ্গে থাকিবার যতদিন নিয়তি আছে, ততদিন এক সঙ্গে থাকিব। সময় হইলেই চলিয়া যাইতে হইবে। আমার জন্য তোমরা চিন্তা করিও না। ভগবৎ ইচ্ছায় জগতে সকলই ঘটিতেছে। কাহার কিছু করিবার বা বাধা দিবার শক্তি নাই!”

পূর্ব্বপরিচ্ছেদ-বর্ণিত ঘটনার পর প্রায় তিন বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এক দিন অপরাহ্নে ভবরাম ও করুণাময় উভয়ে বসিয়া উপরোক্ত কথোপকথন করিতেছেন। তিন বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, সংক্ষেপে তাহা এই পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিতেছি।

ভবরাম প্রাচীন আদর্শে চতুষ্পাঠী স্থাপনের জন্য এই তিন বৎসর প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। দেশ বিদেশে ঘুরিয়াছেন। স্থানে স্থানে হিন্দু ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়া অতীত ও বর্ত্তমান ভারতের উন্নতি অবনতির আলোচনা করিয়া, চতুষ্পাঠী স্থাপনের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়াছেন। ভাবী বংশধরগণকে সনাতন হিন্দুর আদর্শে শিক্ষিত ও গঠিত করিতে পারিলে দেশের অভাব, দৈন্য, ব্যাধি, পীড়া কমিয়া যাইবে; আয়ু, মেধা, বল বৃদ্ধি হইবে— ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতি হইবে—অনাবশ্যক পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যয়বাহুল্যতা ঘটিবে না—ভিন্ন দেশের বিলাস-ব্যাধি

হিন্দুর পবিত্র দেশ হইতে দূরীভূত হইয়া যাইবে—এই সমস্ত বিষয়, যুক্তি ও অকাট্য প্রমাণবলে ভবরাম তাঁহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের জন্য কাশী, কাঞ্চি, দ্রাবিড় প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়াছেন। যতি, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মহাত্মাদের সহিত সাক্ষাতের জন্য দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। কিসে হিন্দুর মতি-গতি ফিরিবে, কি উপায়ে তাহাদের পিতৃ পিতামহের রীতি-নীতির প্রতি ভক্তি ফিরিয়া আসিবে, এই সমস্ত বিষয়ের চিন্তা লইয়া কত বিনিদ্র-রজনী অতিবাহিত করিয়াছেন। আমাদের দেশোৎপন্ন চন্দন ও পুষ্পের গন্ধে যে কমনীয়তা ও উপকারিতা আছে, শত সহস্র এসেন্সের শিশি তাহার তুলনায় যে কিছুই নহে, এই সমস্ত বিষয় বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবলে দ্বারে দ্বারে বুঝাইয়া বেড়াইয়াছেন। ব্রাহ্মণসন্তানগণকে দেবভাষা শিক্ষা দিয়া স্বধর্ম্ম-পরায়ণ করিবার জন্য তাহাদের পিতা ও অভিভাবক-গণকে কত প্রকারে বুঝাইয়াছেন।

ভবরাম তিন বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে স্থানে স্থানে দুই একটি আদর্শ চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু পূর্ণ-মনোরথ হইতে পারেন নাই। ছাত্র পাইলে উপযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ মিলে না। কোন কোন চতুষ্পাঠিতে উপযুক্ত পণ্ডিত পাইয়াছেন, কিন্তু সেখানে কেহই পুত্র-পৌত্রকে অধ্যয়ন করাইতে স্বীকৃত নহেন; কারণ বর্ত্তমান সময়ে যজন ও অধ্যাপনা দ্বারা বিশেষ

কিছু উপার্জ্জন হয় না। ভবরাম দেশের যে প্রাচীন উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিতে প্রয়াসী, বিদেশী চাকচিক্যের মোহ ত্যাগ করিয়া সে আদর্শ হৃদয়ে ধারণা করিতে অনেকেই সমর্থ হইতেছে না। ভবরামের চেষ্টার বিরাম নাই—অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য অগ্রসর হইতেছেন।

ছয়মাস কাল নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া ভবরাম গৃহে ফিরিয়াছেন। অত্যধিক পরিশ্রম, অনাহার, রাত্রি-জাগরণ, এবং দুশ্চিন্তায় তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। দেশের লোকের মতিগতি দেখিয়া, তিনি আরও হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি এখন সর্ব্বক্ষণই আকাশের দিকে চাহিয়া থাকেন। গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে বলেন—"গুরুদেব! আমার অদৃষ্টে বুঝি আর ব্রাহ্মণের উন্নতি—হিন্দুর সেই প্রাচীন ধর্ম্মভাব, —হিন্দুর সংসারে সেই প্রাচীন রীতি-নীতি দেখা ঘটিল না।"

কৃষ্ণকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তি লইয়া গোলযোগ, তিন বৎসরের মধ্যে আর একটি প্রধান ঘটনা। সেই এটর্ণি ভদ্রলোকটি ঝামেরিয়ার সম্পত্তি ঝামেরিয়াকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, ইহার একটা মীমাংসা হইলেই তিনি গৃহত্যাগ করিবেন; নচেৎ কঠোর রাজদণ্ড গ্রহণ করিবেন। ভদ্রলোকটি সেইদিনই করুণাময়ের সহিত পরামর্শ করিয়া, কৃষ্ণকান্তকে বিষয় হইতে বেদখল

করিবার জন্য সমস্ত আয়োজন করিয়া ফেলিলেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত সম্পত্তি বুঝাইয়া দিবার জন্য কৃষ্ণকান্তকে নোটিশ দেওয়া হইল। যাহা করিলে কৃষ্ণকান্ত সম্পত্তির আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন, সেই সমুদয় কারণ বিস্তারিতভাবে নোটিশে প্রকাশ করা হইল।

পাষণ্ড কৃষ্ণকান্ত কর্ত্তৃক জ্যেষ্ঠের অপমানের কথা করুণাময় মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তিনি কি করিয়া কৃষ্ণকান্ত ও তাহার ধর্ম্মজ্ঞানহীন পিতাকে পথের ভিখারী করিয়া, হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ করিবেন, তাহাই তাঁহার ধ্যান জ্ঞান হইয়া উঠিল। করুণাময় সেইদিনই পিতাপুত্রের সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন। বিষয় লাভের স্পৃহা করুণাময়ের মনে তিলার্দ্ধের জন্যও স্থান পাইল না।

করুণাময় যাহা যাহা করিয়াছেন, সমস্তই অগ্রজকে জানাইলেন। ভবরাম, করুণাময় ও ভদ্রলোকটিকে নিকটে বসাইয়া স্নেহভরে বলিলেন—"এরূপ উদ্যোগ-আয়োজনের কোনই আবশ্যক নাই। মা ঝামেরির অর্থেরও কোন প্রয়োজন নাই। মা আমার আবার অবনতির পথে ফিরিয়া আসিতেও ইচ্ছুক নহেন। আমি মাকে এই সম্পত্তির কথা বুঝাইয়া বলিলাম। তিনি রোদন করিতে করিতে বলিলেন—"বাবা! কেন আমাকে অর্থের স্তূপে পড়িয়া ময়লা মাটি মাখিতে বলিতেছেন?" আর

আমি মাকে জোর করিয়া কোন কথা বলিতে পারিলাম না, মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। মা আমার স্বর্গের পবিত্র পারিজাত পুষ্প—ভগবানের চরণে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন। পার্থিব ধন-সম্পত্তির মলিনতা স্পর্শ করিলে, ভগবানের চরণে তিনি স্থান পাইবেন না। এরূপ গর্হিত-কার্য্যে তোমরা হস্তক্ষেপ করিও না---অপরাধ হইবে।

"যাহা ভগবৎলীলায় ঘটে ঘটুক। সংসারে ত্যাগেই পুণ্য' —গ্রহণে পুণ্য নাই। উহাদের নিকট গ্রহণ করিলে লাভ নাই, বরং ক্ষতি আছে; কিন্তু উহাদিগকে ত্যাগ করিলে ক্ষতি নাই—লাভ আছে। গ্রহণের জন্য পুরুষকার প্রয়োগের প্রয়োজন নাই। যদি অর্থ-সম্পত্তি ঝামেরিয়া-মায়ের আবশ্যক হইত, চেষ্টা করিলে দোষ ছিল না। বিনা কারণে, বিনা প্রয়োজনে কৃষ্ণ-কান্তকে পথের ভিখারী করিবার প্রয়োজন কি? কাল পূর্ণ হইলে সকলেই নিজ নিজ গর্হিতকার্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবে। প্রায়শ্চিত্ত আপনা হইতেই হইবে।"

কথা শুনিয়া ভদ্রলোকটি ভবরামের পা দুইখানির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। বোধ হয় মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইনি মানুষ—না দেবতা? করুণাময় আর কোন কথা কহিল না।

ভদ্রলোকটি সেইদিনই আফিসের কাগজপত্র দেখিয়া যাহা

অন্যায় ও অধর্ম্মপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন, নিজ সম্পত্তি হইতে তাহাদিগকে তাহা প্রত্যর্পণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। স্ত্রী-পুত্রের জন্য যৎকিঞ্চিৎ রাখিয়া সমস্ত সম্পত্তি পর সেবায় অর্পিত করিলেন। সতী হেমাঙ্গিনীর পঞ্চাশ সহস্র টাকা মূল্যের অলঙ্কার-গুলি করুণাময়ের হস্তে দিয়া হেমাঙ্গিনীর অন্তিম বাক্যানুযায়ী স্বামী-পুত্রহীন নিরাশ্রয়াদের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

ভদ্রলোকটী তিন দিনের মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া ভবরামের চরণে আসিয়া প্রণাম করিলেন। প্রণামান্তে অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করুন, যেন কৃতকর্ম্মের মহাপাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারি।"

ভবরাম তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া বলিলেন—"সত্যই কি তুমি সংসার ত্যাগ করিবে ?"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আমার পক্ষে সংসার এখন বিষের আগার! বিষের জ্বালায় আমি দিবারাত্র ছট্‌ফট্ করিতেছি; মানুষের মুখ আমি আর দেখিব না, কিংবা আমার এই পাপমূর্ত্তি আর কাহাকেও দেখাইব না। ত্যাগ সেইদিনই করিয়াছি। তিনটা দিন কেবল নরক-যাতনা ভোগ করিতেছিলাম। আমি অবশিষ্ট জীবন ভগবৎ আরাধনা করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। তাহাও না পারি, অরণ্যে অরণ্যে ঘুরিব—দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিব।

অধর্ম্মার্জ্জিত অর্থে পুষ্ট দেহ হয় শুষ্ক হইয়া যাক, না হয় ইহা ভক্ষণ করিয়া ব্যাঘ্র, ভল্লুক, শৃগাল, কুক্কুর ক্ষুন্নিবৃত্তি করুক। যে পাপ অর্জ্জন করিয়াছি, তাহার ভোগ কত জন্ম ভুগিতে হইবে জানি না। আর আমাকে পাপের বোঝা ভারী করিতে আদেশ করিবেন না।"

ভবরাম সমস্ত কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "ভগবান্ তোমায় শান্তি দান করুন।"

ভদ্রলোকটী চলিয়া গেলেন। ভবরাম এখন আর কারবারাদি কিছুই দেখেন না। সংসারে থাকিয়া উদাসীনের ন্যায় দিন যাপন করিতেছেন। সাংসারিক বা কারবারাদির কোন কথা করুণাময় জ্যেষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলে ভবরাম বলেন—

"ভাই! আমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না। উপরের দিকে চাহিয়া যাহা কর্ত্তব্য, সম্পন্ন করিয়া যাও—ধর্ম্মের প্রতিকূলতাচরণ কখন করিও না। আমার যে কয়টা গণা দিন ছিল, তাহা শেষ হইয়া আসিয়াছে। মায়ার শৃঙ্খল পরিয়া যাইতেছি, আবার শৃঙ্খল পরিয়াই আসিতে হইবে। জানি না কতদিনে শৃঙ্খলমুক্ত হইতে পারিব।"

করুণাময় সেইদিন হইতে ভবরামকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিত না। কেবল সশঙ্কিতচিত্তে দাদার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। অদূরে গাঢ় অন্ধকার দেখিয়া

করুণাময় প্রতি মুহূর্ত্তে শিহরিয়া উঠিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিত। দাদা ভিন্ন করুণাময় এ জগতে আর কাহাকেও জানিত না।

নবম পরিচ্ছেদ।

আরও এক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। ভবরামের সে তেজ, সে শক্তি, সেই উৎসাহ, চক্ষের সে উজ্জ্বল দীপ্তি আর নাই। দেহ জীর্ণ, শীর্ণ, স্থবিরের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। এ অবস্থাতেও কিন্তু তাঁহার চতুষ্পাঠির জন্য চিন্তা ও পরিশ্রমের বিরাম নাই।

প্রথম জীবনে ভবরাম একজন পাকা সংসারী ছিলেন। বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে বিলাসব্যাধির আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। তখন হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটিয়াছিল। চল্লিশ বৎসর বয়সের পর তিনি গুরুদেবের দর্শন পান। বাল্যকাল হইতে তাঁহার ব্যাকুলতা ছিল বলিয়াই হিন্দুধর্ম্মের জ্যোতিঃ মধ্যজীবনে দেখিতে পাইয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের স্নিগ্ধ দীপালোক পাঠ্যাবস্থায় বালকদের নয়ন-সমক্ষে না ধরিলে,—হিন্দুধর্ম্মের প্রাচীন রীতি-নীতি দ্বারা বালকগণের অস্থি মজ্জা গঠিত করিতে না পারিলে,—হিন্দু-শাস্ত্রগ্রন্থের সাত্ত্বিক জ্ঞান হইতে বালকগণকে বঞ্চিত রাখিলে--ভগবৎভক্তির বীজ সুকুমার বাল্যহৃদয়ে অঙ্কুরিত

না করিলে,—হিন্দুর সংযম সাধনায় বালকগণকে অভ্যস্ত না করাইলে,—বিলাস-ব্যাধির অপকারিতা বাল্যকাল হইতে বালকগণকে বুঝাইয়া না দিলে,—ব্রাহ্মণ সন্তানগণকে বাল্যকাল হইতে প্রাণায়াম ও যোগের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে না দিলে,—ভাবী-জীবনে অভাব-রাক্ষসীর গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য, পোষাক-পরিচ্ছদের বাহুল্যতার অপকারিতা বাল্যকাল হইতে বালকগণকে বুঝিবার অবসর না দিলে অথবা আদর্শ চতুষ্পাঠিতে সেইরূপ শিক্ষিত না করিলে,—হিন্দুর পরিণাম যে কি ভয়ঙ্কর হয়, তাহা ভবরাম নিজ জীবনে বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি ভগ্নদেহ, ভগ্ন-স্বাস্থ্য ও ভগ্ন-মন লইয়া এই শেষ জীবনেও দেশে দেশে আদর্শ হিন্দু চতুষ্পাঠী স্থাপিত করিতে ও তাহার উপকারিতা দেশবাসীকে বুঝাইতে প্রাণঘাতী পরিশ্রম করিতেছেন। ভবরাম যদি প্রাণায়ামে অভ্যস্ত না হইতেন, যোগ ধর্ম্ম যদি তাঁহার সাথী না হইত, তাহা হইলে বহু বৎসর পূর্ব্বেই তিনি সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতেন। দেহের শক্তি যে কিছুই নহে, মনের বলই যে একমাত্র শক্তি—এখনও ভবরাম তাহা সংসারকে দেখাইতেছেন। তিনি এখন যোগ সাধনার পর মধ্যরাত্রে কেবলমাত্র কয়েক বিন্দু জাহ্নবীর পূত-সলিল পান করিয়া থাকেন। তত্রাচ ভারতের পূর্ব্ব আদর্শ স্থাপনের জন্য এখনও ভবরামের পরিশ্রমের বিরাম নাই।

এইরূপ অবস্থায় দেখিতে দেখিতে আরও এক বৎসর অতীত হইয়া গেল। ভবরাম একবারে শক্তিহারা হইয়া পড়িলেন। করুণাময়ের হৃদয়ে দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। করুণাময় ব্যাকুল হইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে দাদাকে উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ভবরাম হাসিয়া বলিলেন, "ভাই! শেষাবস্থায় আমাকে আর কেন মানুষের হাতে তুলিয়া দিতেছ? জীবনীশক্তি ফিরাইবার কি মানুষের শক্তি আছে? আমার সময় হইয়াছে। সময় হইলে কি মানুষ কাহাকেও ধরিয়া রাখিতে পারে? অপরে এ কথা বলিতে পারে, হিন্দুর এমন কথা বলিতে নাই। ভাই! ঐশিক-শক্তিতে সকল অবস্থায় বিশ্বাস রাখিও।

"ভাই করুণাময়! আমার শেষ সময় হইয়া আসিয়াছে, তোমাকে দুই একটি কথা বলিবার আছে। তোমার শিশু ভ্রাতুষ্পুত্র দুইটির আমি কোনদিন আশা রাখি নাই। উহারা যে জীবিত থাকিয়া কোনদিন জগতের উপকারে আসিবে, সে ভরসা অল্প। ভগবানের তাহা অভিপ্রেত হইলে, প্রথম ভ্রাতুষ্পুত্র-টিকে তোমার হৃদয়ে শেল দিয়া অকালে গ্রহণ করিতেন না। মঙ্গলময় তিনি, যাহাতে জীবের মঙ্গল নিহিত থাকে, তাঁহার ইচ্ছা-বশে তাহাই জগতে সংঘটিত হয়। তবে যদি আমাদের পুণ্যাত্মা পূর্ব্বপুরুষগণের আশীর্ব্বাদ ও ভগবানের ইচ্ছায় উহারা জীবিত

থাকিয়া, পূর্ব্বপুরুষগণের নাম, কীর্ত্তি ও সম্মান বজায় রাখিতে পারে, তবে তাহা দেবতার আশীর্ব্বাদ জানিও। আমার অবর্ত্তমানে উহাদের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া কখনও বিলাসিতার ছায়া স্পর্শ করিতে দিও না। আমার জীবনের যাহা সঙ্কল্প ছিল, তাহা তুমি কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিও। প্রাচীন হিন্দু রীতি-নীতি অনুসারে উহাদের অস্থি মজ্জা গঠিত করিতে চেষ্টা করিও। আমাদের বংশে কেহ যেন কখনও সনাতন প্রথার পরিবর্ত্তন না করে। তাহা হইলে বংশের পতন অবশ্যম্ভাবী।

"সাগরবালা তোমার পূজনীয়া মাতৃ-স্বরূপিনী হইলেও অজ্ঞানা স্ত্রীলোক বলিয়াই চিরদিন মনে করিবে। তাহার পিতৃমাতৃকুলে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা উন্নত প্রকৃতির নহেন। তাঁহারা সকলেই সঙ্কীর্ণমনা। সাগরবালার মন উন্নত হইয়া ঈশ্বরাভিমুখীন হইয়াছে, ইহা আমার জীবনব্যাপী চেষ্টার ফল। উহাদের বংশের কেহই হিন্দুভাবাপন্ন নহেন এবং হিন্দুর প্রাচীন রীতি-নীতি বজায় রাখিতেও তাঁহারা কখন সচেষ্ট নহেন। তাঁহাদের সহিত সাগরবালার মেশামিশি যতই অল্প হইবে, ততই সাগরবালা উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। আমার অবর্ত্তমানে এই কথাটি চিরদিন মনে রাখিতে চেষ্টা করিবে।

আর ঝামেরিয়া—মা ঝামেরিয়া আমাদের গৃহের লক্ষ্মী স্বরূপিনী। তিনি নিজের উন্নতির পথ নিজেই দেখিয়া লইয়াছেন।

তাঁহার সহিত পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজ কখন করিও না। মা ঝামেরিয়া আমার যে কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক হইবেন, প্রাণান্তেও সে কার্য্য করাইতে কখন তাঁহাকে বাধ্য করিও না। আমার মৃত্যুর পর মা ঝামেরিয়া যেরূপ অবস্থায় যেখানে থাকিলে সুখী হন, তদবস্থাতেই তাঁহার থাকিবার সুবিধা করিয়া দিবে। স্মরণ রাখিবে, তাঁহার মতের বিরুদ্ধাচরণ করা তোমার অগ্রজের নিষেধ রহিল।

"ভাই করুণাময়! আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়দের কে কিরূপ প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে, তাহা জগদম্বাই জানেন। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত থাকে, তাহা মানব-বুদ্ধির অগম্য। কেহ হয় ত সংসর্গ-দোষে প্রাচীন হিন্দু রীতি-নীতির অবমাননা করিবে,—কেহ হয় ত দেব-দ্বিজে ভক্তি রাখিবে না—কেহ হয় ত হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থের মর্য্যাদা পালন করিবে না,—কেহ বা ভ্রাতৃপ্রেম হইতে বঞ্চিত থাকিবে, স্ত্রীলোকেরা হয় ত স্ত্রী-স্বভাব বশতঃ পরস্পর হিংসা করিবে, কেহ বা গুরুজনের অবাধ্য হইবে, আবার কেহ হয় ত হিন্দুর একান্নবর্ত্তী-প্রথার প্রতি ঘৃণা করিবে। ভাই করুণাময়! স্ত্রীস্বভাবকে আমি অত্যন্ত আশঙ্কা করি—স্বভাবতঃই উহারা সঙ্কীর্ণমনা। অনেক সময় উহাদের প্ররোচনাতেই হিন্দুর শান্তিপূর্ণ সংসারে অশান্তির উদ্ভব হয়—হিন্দুর সোণার সংসার ছারখার হইয়া যায়। উহারা ভিন্ন বংশের,

ভিন্ন গোত্রের, নিজ নিজ পিতামাতার প্রকৃতি লইয়া আমাদের বংশে আসিতেছে ও আসিবে। আমরা পিতা মাতা হইতে যে শিক্ষা, দীক্ষা, মন ও অন্তঃকরণ পাইয়াছি, উহাদের সহিত সেগুলির পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। আমরা আমাদের বংশের সকলকে যেরূপ জন্মবধি "আপনার" বলিয়া জানি বা অস্থিমজ্জা ও মনের সহিত জড়িত করিয়া ফেলিয়াছি, উহারা পরের ঘরে আসিয়া প্রথমে তদ্রূপ পারে না—আবার কেহ কেহ চিরজীবনেও পারে না। অনেক স্ত্রীলোকই স্বামী ও পুত্রকন্যাকে, বড় জোর তাহার দেবর ভাসুরকে আপনার বলিয়া মনে করে; কিন্তু দেবর বা ভাসুরের স্ত্রীকে তাহারা "আপনার" করিতে পারে না। এই জন্যই হিন্দুর সংসারে অশান্তির আবির্ভাব হয়। এরূপস্থলে স্ত্রী-লোকের সহিত স্ত্রীলোকেই দ্বেষ, হিংসা ও কলহ করে। স্ত্রী-লোককে দেবর ভাসুরের উপর হিংসা করিতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং তাহারা তাহাদিগকে স্নেহ করে, ভালবাসে ও হৃদয়ের সহিত সম্মান করে। কেবল তাহাদের সহধর্ম্মিণীদের সহিতই দ্বেষাদ্বেষী ও কলহ হইয়া থাকে। সং-শিক্ষার অভাব ও মনের সঙ্কীর্ণতাই ইহার প্রধান কারণ। ইহার জন্য স্ত্রীলোকের পিতা মাতারাই অধিকতর দায়ী। হিন্দুর একান্ন-বর্ত্তী সংসার যে স্বর্গের ন্যায় সুখশান্তিপূর্ণ, জগজ্জননী লক্ষ্মী যেখানে সুখে বাস করেন,—ভগবানের আশীর্ব্বাদ একান্নবর্ত্তী সংসারে

সে অহরহঃ বর্ষিত হয়, একথা এখনকার বিদেশীভাবাপন্ন, উন্নত, শিক্ষিত হিন্দু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। একজনের রোগ-শয্যাপার্শ্বে পঞ্চাশ জন আসিয়া কাতর নয়নে মুখের দিকে চাহিবে, ইহা সুখের,—না পীড়ার সময় একমাত্র তাহার সহধর্ম্মিণী নিরাশ্রয় হইবার আশঙ্কায় রোদন করিবে, ইহা সুখের? কোন্‌টি সুখের একবার চিন্তা করিয়া দেখ দেখি! একা চিরজীবন অর্থো-পার্জ্জন করিয়া সংসার প্রতিপালন করিয়াছে, কিন্তু বার্দ্ধক্যে তাহার উপার্জ্জন-শক্তি রহিল না! সংসার-সাগরে কূল-কিনারা দেখিতে না পাইয়া হতাশ অন্তরে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। বার্দ্ধক্যে সাহায্য পাইবার মত কাহাকেও দেখিতে পাইল না, ইহা ভাল, না চিরজীবন পাঁচজনকে প্রতিপালন করিয়াছে, যথা-সাধ্য একান্নবর্ত্তী-সংসারে সাহায্য করিয়া আসিয়াছে, বার্দ্ধক্যে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া পরিশ্রম হইতে অবসর গ্রহণ করিল, ইহা ভাল? যে দিক্‌ দিয়াই চিন্তা কর, একান্নবর্ত্তী-প্রথার মত হিন্দুর সুন্দর প্রথা আর কিছু নাই! ইহা যোগি-ঋষিগণের মস্তিষ্কপ্রসূত।

"ভাই! করুণাময় এই সমস্ত বিষয় ও আরও নানারূপ চিন্তা করিয়া আমি একখানি উইল প্রস্তুত করিয়াছি। এই উইলের বলে আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা কেহ কখন বিপথগামী হইতে পারিবে না এবং আমাদের বংশে কেহ কখন একান্নবর্ত্তী-প্রথা

নষ্ট করিতে পারিবে না। হিন্দুর এমন দিন আসিবে, যখন প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্বামী আমার এই উইলের অনুকরণে বংশের শান্তি, হিন্দুয়ানী ও সংসারে একান্নবর্ত্তী-প্রথা রক্ষার জন্য চরমপত্র প্রস্তুত করিয়া যাইবেন। ভাই! উইলখানি লেখা আমার শেষ হইয়া গিয়াছে। তোমাকে শুনাইবার জন্য কাছে রাখিয়াছি।”

ভবরাম উইলখানি পড়িতে লাগিলেন। করুণাময়ের চক্ষু দিয়া জলধারা গড়াইতে লাগিল।

(উইলের মর্ম্ম)

১। আমার স্থাবর অস্থাবর যাহা কিছু সম্পত্তি সমস্তই আমার মৃত্যুর পর দেবতার সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে। কেহ কখন দান, বিক্রয় বা বন্ধক দিয়া টাকা কর্জ্জ করিতে পারিবে না। আমার সম্পত্তিগুলির বর্ত্তমান আয় যাহা আছে, পরে যাহা বৃদ্ধি হইবে, খরচ বাদে সেই আয় দেবতার নামে গচ্ছিত থাকিবে।

২। কারবারাদির আয় হইতে হিন্দুর প্রাচীন রীতি-নীতি অনুসারে সকলের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হইবে। যিনি বা যাঁহারা একান্নবর্ত্তী-সংসারে থাকিতে অনিচ্ছুক হইবেন, তিনি বা তাঁহারা সংসার হইতে কোনরূপ সাহায্য পাইবেন না। গৃহকর্ত্তা তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবেন। হিন্দুভাবাপন্ন

হইয়া প্রাচীন রীতি-নীতি না মানিলেও গৃহস্বামী তাঁহাদিগকে গৃহে স্থান দিবেন না।

৩। আমার বংশের কেহ কখন কাহারও নিকট চাকরী গ্রহণ করিতে পারিবেন না, যিনি করিবেন সংসারে তাঁহার স্থান হইবে না। তিনি আমার বংশের সকলের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন। কেহ তাঁহার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিতে পারিবেন না।

৪। সকলকেই গৃহস্বামীর আদেশ অনুসারে চলিতে হইবে। সংসারের স্ত্রী, পুরুষ, বালক, গৃহস্বামীর বিনা অনুমতিতে স্বাধীনভাবে কেহ কখন কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না। যিনি করিবেন, তাঁহাকে গৃহস্বামী পাত্রানুসারে ও অপরাধের তারতম্যানুসারে এক দিন, দুই দিন বা তিন দিন পর্য্যন্ত অনশনে থাকিয়া আমার দেবগৃহে ভগবৎ আরাধনায় রত রাখিবেন। অথবা বিবেচনা করিলে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করাইতে পারিবেন।

৫। আমার বংশে কেহ কখন চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করিতে পারিবে না। অথবা স্ত্রীপুরুষ কেহ কখন বহুমূল্য অনাবশ্যক পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে পারিবে না। মৎস্য, মাংস এবং হিন্দুর অখাদ্য ও অস্পৃশ্য কোন জিনিষ ব্যবহার বা স্পর্শ করিতে পারিবে না, যিনি করিবেন তিনি বংশ হইতে ত্যজ্যরূপে পরিগণিত

হইবেন। সকলকেই সাত্ত্বিক আহার ও গৈরিক বসন পরিধান করিতে হইবে। প্রাতঃসন্ধ্যা, দেবকার্য্য ও দীন দুঃখীর সেবায় সকলকেই সাধ্যমত রত থাকিতে হইবে।

৬। নারিকেল ডাঙ্গার এই ত্রিতল বাসভবন "রামময় আশ্রম" নামে স্বর্গীয় পিতৃদেবের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। ইহা অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় কেহ কখন দান বিক্রয় বা ব্যক্তিবিশেষে বিভাগ করিতে পারিবেন না। এই আশ্রমে পূজা, অর্চ্চনা, অতিথি সেবা ও হিন্দুর নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য সম্পন্ন হইবে। আমার বংশের সকলেই এখানে বাস করিয়া ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন, কিন্তু কেহ কখন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি বলিয়া দাবী করিতে পারিবেন না। এই অট্টালিকা-সংলগ্ন গৃহে ও ভূমির যাহা আয় হইবে, তাহা এই "আশ্রম তহবিলে" জমা হইবে। ভবিষ্যতে এই আয় হইতেই "রামময় আশ্রমের" ভগ্ন অংশ নির্ম্মাণ, আবশ্যকমত নূতন গৃহাদি নির্ম্মিত, এই আশ্রম-সংলগ্ন ভূমি ক্রয় করিয়া ইহার বিস্তৃতি-বৃদ্ধি, আবশ্যক হইলে অতিথি-শালা, পূজাগৃহ, আতুর-আশ্রম, চতুষ্পাঠী ও ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের বিস্তৃতি ইত্যাদি কার্য্য সম্পন্ন হইবে। "রামময় আশ্রমের" আয় গৃহস্বামী কখন সংসারে ব্যয় করিবেন না।

৭। আমার মৃত্যুর পর আমার প্রাণস্বরূপ অনুজ করুণা-ময় এই উইলের উপদেশানুসারে গৃহাশ্রম ও কারবারাদির

বন্দোবস্ত করিবেন। তাহার উপর কাহারও কর্ত্তৃত্ব চলিবে না।

৮। গৃহস্থাশ্রমের যিনি জ্যেষ্ঠ, ভবিষ্যতে তিনিই গৃহস্বামী হইবেন এবং যিনি জ্যেষ্ঠা থাকিবেন তিনিই গৃহকর্ত্রী হইবেন। গৃহকর্ত্রী গৃহস্বামীর আদেশ অনুসারে চলিবেন।

৯। বংশের ভাবী বংশধরগণকে আমার স্থাপিত "আদর্শ চতুষ্পাঠীর" নিয়মানুসারে থাকিয়া ষষ্ঠ বিংশতি বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইবে। তাঁহারা গুরু সমীপে বাস করিবেন, গৃহে বাস করিতে পারিবেন না। ষষ্ঠবিংশতি বর্ষের পর সংসার আশ্রমে আসিবেন। ইহার পর গৃহস্বামী কর্ত্তব্য মনে করিলে, তাহাদের পরিণয়াদি কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

১০। ভাবী বংশধরগণ সকলেই প্রাণায়াম ও যোগসাধনে অভ্যস্ত হইবেন—নচেৎ সংসার আশ্রমে গৃহস্বামী স্থান দিবেন না।

১১। ভাবী বংশধরগণকে গৃহস্বামী উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া কাহাকেও চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকের পদে, কাহাকেও অতিথি-সৎকার ব্রতে, কাহাকেও আতুর-আশ্রমে, কাহাকেও দীন-দুঃখীর সেবায়, কাহাকেও বিষয় ও কারবারাদি সংরক্ষণে নিয়োজিত করিবেন।

১২। আমার জন্মভূমির যে স্থলে জনক-জননীর পবিত্র স্মৃতি-রক্ষার্থ মর্ম্মর প্রস্তর প্রোথিত করা হইয়াছে, সেই স্থলে কারবারাদির আয় হইতে একটি আশ্রম ও চতুষ্পাঠী নির্ম্মিত হইবে। তথায়

যেরূপ কাঙ্গালী ভোজন, দীন-দুঃখীর সেবা কার্য্য আরব্ধ করা হইয়াছে, তাহা কখন বন্ধ হইবে না। প্রতি বৎসর আমার বংশের সকলে গিয়া আমাদের পুণ্যাত্মা জনক জননীকে হৃদয়ের সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করিবেন। তখন “রামময় আশ্রমে” আমার বংশের কেহই থাকিতে পাইবে না। এই সম্মান-প্রদর্শন আমার বংশের আবালবৃদ্ধবনিতা পুণ্য ও পবিত্র কার্য্য বলিয়া মনে করিবে।

১৩। সাগরবালা সন্তান-জননী ও আমার সহধর্ম্মিণী। ইঁহার প্রতি সম্মানার্থ দেবর করুণাময় তীর্থ-দর্শন, বিধবার ব্রত ও ব্রহ্মচর্য্য পালন, আতুর দীন-দুঃখীর সেবা, দুর্গোৎসব, জগদ্ধাত্রী পূজা, রাস, কাঙ্গালী ভোজন, বৃক্ষ, জলাশয়, শিব-মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যাহা করিবার ইচ্ছা হইবে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

১৪। আমার সম্পত্তি ও কারবারাদির আয় হইতে এই উইলের লিখিত ও সংসার আশ্রমের অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা হইতে দেব-সেবা বা দীন-সেবার জন্য অন্য বিষয়-সম্পত্তি বা ধর্ম্মানুমোদিত নূতন ব্যবসার সৃষ্টি হইবে।

ভবরাম আর পাঠ করিতে পারিলেন না। তাঁহার ক্ষীণ দেহ বায়ুহিল্লোলে কদলীপত্রের মত কম্পিত হইতে লাগিল। মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু সেই ম্লান মুখের উপর কি যেন এ

দিব্য জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। এমনটি করুণাময় আর কোন দিন দেখেন নাই। ভবরামের চক্ষের পলক পড়িতেছে না। ভক্তিপূরিত অনিমেষনয়নে ভবরাম যেন কাহার পানে চাহিয়া আছে। দেখিতে দেখিতে ভবরাম করযোড়ে কাহার স্তব করিতে লাগিলেন। দাদার ভাবান্তর ও মুখের দেবভাব দেখিয়া করুণাময় ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিলেন। কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ভবরাম ভূমে মস্তক নত করিয়া বার বার কাহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা গড়াইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মুখের জ্যোতিঃ আরও ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এখনও ভবরামের চক্ষের পলক পড়িল না। দৃষ্টি একদিকে নিবদ্ধ! জলধারার বিরাম নাই। বহুক্ষণ পরে চক্ষের পলক পড়িল, ভবরাম করুণাময়কে ইঙ্গিতে জানাইলেন, "আমাকে দেবগৃহে লইয়া চল।" কিয়ৎক্ষণ পরেই সেইস্থানে ঝামেরিয়া ও সাগরবালা ছুটিয়া আসিল। সকলেরই মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। কাহারও মুখে বাক্য নিঃসৃত হইল না। মর্ম্ম যাতনা সকলেরই বাক্যের অতীত হইয়া উঠিল। কনিষ্ঠের স্কন্ধে ভর দিয়া ভবরাম দেবগৃহে উপস্থিত হইলেন। ভবরাম উইলখানি পাঠ করিতে করিতে ক্রাইষ্টের দিব্য কান্তি নয়ন সমক্ষে দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি যেন ভবরামকে জানাইলেন, "যোগযুক্ত হও, ভগবানে

আত্মসমর্পণ কর। তোমার সুসময় উপস্থিত। সে সুসময় সমাগত হইবারও আর অধিক বিলম্ব নাই। ঐ দেখ একে একে তোমার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইতেছে! অজ্ঞাত শক্তি তোমার কর্ম্মসূত্রগুলি একত্র করিয়া তোমার নব দেহ নির্ম্মাণ করিতেছেন। ধ্যানে নিমগ্ন হও। তোমাকে সাবধান করিবার জন্য পর্ব্বত গুহা হইতে ছুটিয়া আসিতেছি। তোমার মহান্ কর্ম্মফল সমষ্টিতে যে দেহ নির্ম্মিত হইতেছে, যাহাতে তুমি প্রবেশ করিবে, তাহাকে আর কাহারও সাবধান করিবার প্রয়োজন হইবে না। সেই সর্ব্বনিয়ন্তার চিন্তা ব্যতীত এখন আর কোন চিন্তা মনে স্থান দিও না। যোগে বসিয়া, হৃদয়-চাঞ্চল্য দূর করিয়া, অকম্পিত দীপশিখার ন্যায় মনকে ব্রহ্মের চরণে নিবদ্ধ কর।"

ভবরামের মুখ দিয়া আর বাক্য নিঃসৃত হইল না। তাঁহার সে দৃষ্টিও আর নাই। ভবরাম যোগাসনে উপবেশন করিলেন। মুখ গম্ভীর, দেহ নিশ্চল, দিব্য জ্যোতিতে মুখখানি উদ্ভাসিত। ওষ্ঠদ্বয় এক একবার মৃদু হাস্যে কম্পিত হইতেছে।

ঝামেরিয়ার চক্ষু দিয়া অজস্র জলধারা গড়াইতে লাগিল, সে ভাবিতে লাগিল, এরূপ সময়ে এমন ভাবে, বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়া বাবা ত কখন যোগাসনে উপবেশন করেন নাই! বাবার আজ মুখমণ্ডলে এরূপ পবিত্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইল কেন? সতী সাগরবালা কিছু বুঝিতে না পারিয়াও ব্যাকুল হইয়া

উঠিলেন। ঝামেরিয়ার চক্ষে জলধারা দেখিয়া তাঁহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। চক্ষে অঞ্চল দিয়া সাগরবালা রোদন করিতে লাগিলেন।

করুণাময়ের হৃদয়ের ভাব লেখনীমুখে বাহির হইবার নয়। কেহ যদি ভ্রাতৃভক্ত পাঠক থাক, কল্পনা-তুলিকায় করুণাময়ের হৃদয়ের ভাব অঙ্কিত করিয়া দেখ। করুণাময়ের হৃদয়ের কোমল অংশটুকু কে যেন ছিন্ন করিয়া লইতেছে; যন্ত্রণায় করুণাময়ের ভ্রাতৃভক্ত প্রাণ শতধা বিদীর্ণ হইতেছে। করুণাময় ভাবিতে লাগিল, "দাদার এরূপ গম্ভীর মূর্ত্তি, নিশ্চল অঙ্গ, মুখের দিব্য জ্যোতিঃ কোনদিন ত দেখি নাই। আজ দাদার এরূপ দেবোপম মূর্ত্তি দেখিতেছি কেন? আমাদের প্রতি দাদার সেই অগাধ, অপরিমেয় স্নেহ-মমতার চিহ্ন মাত্র মুখখানিতে নাই। ভগবান! একি করিলেন!! আমি যে সংসারে এতদিন কেবল দাদার স্নেহ ভালবাসারূপ সংসার-সমুদ্রে মনের আনন্দে সন্তরণ করিতেছিলাম। যে দিকে ইচ্ছা অবহেলে ভাসিয়া যাইতাম—ভুত ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতাম না; কেবল দাদার আদেশই আমার একমাত্র অবলম্বন ছিল! সে আদেশ ন্যায় কি অন্যায় কোনদিন তাহার বিচার করি নাই! দাদার আদেশ দেববাক্য বোধে শিরোধার্য্য করিয়া পালন করিতাম মাত্র! ভাবিতাম, দাদার আদেশ ভৃত্যবৎ পালন করিবার জন্যই সংসারে আসিয়াছি, ভাল মন্দ বিচার করিবার জন্য আসি

নাই। এখন কাহার আদেশের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিব? সংসারে স্বাধীনভাবে এ পর্য্যন্ত কোন কার্য্যই করি নাই! কি করিয়া ভয়সঙ্কুল সংসার-সাগরে পার হইব!

চিন্তার পর চিন্তা,—কত চিন্তা আসিয়া করুণাময়ের হৃদয় উদ্বেলিত করিতে লাগিল। করুণাময়ের চক্ষু পলকহীন, সেই পলকহীন চক্ষে অবিরাম অশ্রুধারা গড়াইয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেছে! করুণাময়ের মনে হইল, একবার দাদাকে প্রাণের যাতনা জানাই! "দাদা" "দাদা" বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে গেল, কিন্তু করুণাময়ের কণ্ঠ কে যেন রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, করুণাময় ডাকিতে পারিল না। করুণাময় ভবরামের পা দুখানি বক্ষে ধারণ করিবার জন্য অগ্রসর হইল, তাহাও পারিল না! ভবরামের কার্য্যে ব্যাঘাত হইবে ভাবিয়া করুণাময়ের বুঝি সাহস হইল না! করুণাময় জ্ঞানশূন্য হইয়া ভবরামের চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। অন্য সময় হইলে ভবরাম কনিষ্ঠের অবস্থা দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতেন, করুণাময়কে বক্ষে তুলিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিতেন; কিন্তু আজ ভবরাম যে গৃহে অতিথিরূপে এত দিন বাস করিতেছিলেন, সে গৃহ ত্যাগ করিবেন, তাই মহাযাত্রার আয়োজনে তিনি মহাব্যস্ত। অপরদিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য করিবার সময়ও তাঁহার নাই।

দশম পরিচ্ছেদ।

সব ফুরাইয়া গেল! ভবরামের আশা, উৎসাহ, শক্তি সবই অনন্তে লীন হইয়া গেল। রহিল কেবল তাঁহার স্মৃতি! ভবরাম দেশের জন্য বিপুল পরিশ্রম করিয়া অসময়ে নিজেকে মৃত্যুর স্রোতে ভাসাইয়া দিলেন। তবু হতভাগ্য দেশবাসীর মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল না!

ভবরাম সেই যে গুরুদেবের ইঙ্গিতে যোগে বসিলেন, সে যোগ আর ভঙ্গ হইল না! প্রহরের পর প্রহর অতীত হইতে লাগিল, করুণাময় দাদার মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্ষণে ক্ষণে ভাবিতে লাগিলেন, "এখনই বুঝি দাদা করুণাময় বলিয়া ডাকিবেন।" কিন্তু করুণাময় দাদার সে স্নেহজড়িত স্বর আর শুনিতে পাইলেন না। করুণাময় আজ যথার্থই পিতৃহীন হইল। আর করুণাময়কে তেমন করিয়া স্নেহস্বরে "করুণাময়" বলিয়া কেহ ডাকিবে না! তেমন করিয়া সশঙ্কিত হৃদয়ে মঙ্গলামঙ্গল ভাবিয়া করুণাময়ের মুখের দিকে আর কেহ চাহিবে না! করুণাময়ের অমঙ্গলের আশঙ্কায় তেমন করিয়া আর কেহ ভাবিবে না। করুণাময়ের দুঃখ ও কষ্টের অস্ফুট ধ্বনি

অগ্নি-গোলকের মত তেমন করিয়া আর কাহারও প্রাণে বাজিবে না। করুণাময়ের সুখ-দুঃখের সাথী, আশা ও আনন্দের সঙ্গী, পথ-প্রদর্শক, সংসারের অগ্রগামী সহচর চিরতরে চলিয়া গিয়াছে! আছে কেবল শক্তিহীন, স্নেহহীন, মমতাশূন্য জড় দেহখানি! করুণাময় যখন সংজ্ঞাহীন দেহে ধূল্যবলুণ্ঠিত, তখন স্বপ্নে দেখিলেন, যেন অগ্রজ তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া স্নেহভরে অঙ্গের ধূলাগুলি মুছিয়া দিলেন। পরে মস্তকে মঙ্গল কর স্পর্শ করিয়া বলিলেন—"উঠ ভাই করুণাময়! একবার শেষ দেখা তোমায় দেখিয়া যাই! তোমাকে শিশুকাল হইতে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছি। সংসারে তুমিই আমার একমাত্র অবলম্বন ছিলে! তোমার মমতাতেই আমি সংসার ত্যাগ করিতে পারি নাই। আজ বিধাতার আদেশে চিরতরে তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছি। সংসারের উত্তাল-তরঙ্গে তোমায় ছাড়িয়া যাইতেছি। এখন ভগবান্ ভিন্ন কেহ আর তোমার সহায় নাই! তিনিই তোমায় রক্ষা করিবেন। যদি সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তোমাকে যেন সঙ্গীরূপে আবার পাই! নচেৎ সংসার ও জীবন মরুভূমিবৎ প্রতীয়মান হইবে। শোকে অভিভূত হইও না! আমার অপরিমেয় স্নেহ ও ভালবাসার ঋণ হইতে আংশিকভাবে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা কর। আমার পরিত্যক্ত দেহ ভূমিশয্যায় পড়িয়া আছে—ইহা চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া দাও। বক্ষঃস্থলে

হরিনাম লিখিয়া দিয়া দেহখানি পবিত্র কর। সুবাসিত সুগন্ধি কুসুমরাশিতে দেহখানি আবৃত কর। মনোহর কুসুমের মালা গাঁথিয়া কণ্ঠে পরাইয়া দাও। শবাধারোপরি কুসুম-শয্যা প্রস্তুত কর। স্তবকে স্তবকে সুগন্ধি কুসুমে দেহ ঢাকিয়া, শবোপরি কুসুমমালায় আচ্ছাদিত করিয়া সাজাইয়া দাও। গঙ্গাতীরে চন্দন কাষ্ঠের চিতা সজ্জিত করিয়া তোমার জ্যেষ্ঠের পরিত্যক্ত দেহ চিতোপরি স্থাপিত কর। পবিত্র শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা ও মদীয় গ্রন্থরাজি তদুপরি রাখিয়া দাও। ঘৃত ও চন্দন কাষ্ঠের পবিত্র অগ্নিশিখা আকাশ মার্গে হু হু করিয়া উত্থিত হউক তোমার জ্যেষ্ঠের দেহ সেই অনলে ভস্মীভূত হইয়া পুণ্যতোয়া জাহ্নবী সলিলে ভাসিয়া যাক্! তোমার হস্ত পবিত্র ও ধন্য হউক! মুহুর্মুহু হরিগুণ গানে শ্মশানভূমি প্রতিধ্বনিত হউক! উঠ ভাই করুণাময়! মমতায় আর তোমার জ্যেষ্ঠের পরিত্যক্ত দেহ ফেলিয়া রাখিও না। সংসারের কর্ত্তব্য কর্ম্ম চিরদিন তোমাকে সম্পন্ন করিতে হইবে। শোকে মুহ্যমান হইলে চলিবে না। সংসারে কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য শোক, দুঃখ, ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, মান, অভিমান, লোকনিন্দা সকলই ত্যাগ করিতে হয়। এখন তোমার শোক-দুঃখ ত্যাগ করিবার সময় আসিয়াছে। আমি চিরজীবন তোমাকে যে সব শিক্ষা দিয়া আসিয়াছি, তাহা কি বিস্মৃত হইলে? উঠ ভাই করুণাময়! সংসারের কর্ত্তব্য ও হিন্দুর পারলৌকিক কার্য্যসাধন কর।"

অচেতন দেহ সংসারাভিজ্ঞ বালক এই প্রকার হঠাৎ স্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। জ্যেষ্ঠের অমৃতসিক্ত স্নেহপূর্ণ, অথচ হৃদয়-বিদারক কথাগুলি অচৈতন্যাবস্থায় শুনিয়া ক্ষিপ্ত-প্রায় উঠিয়া বসিল। তাহার কর্ণে বার বার সেই কথাগুলি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। করুণাময় চাহিয়া দেখিল, সন্মুখে দাদা ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। অঙ্গস্পর্শে দেখিলেন, তাঁহার জড়দেহ তুষার শীতল হইয়াছে। উহা রক্তহীন স্পন্দনহীন ও নিশ্চল! প্রথমতঃ করুণাময় নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। শেষে দেখিল সত্যই দাদার প্রাণহীন দেহ ভূমে লুণ্ঠিত হইতেছে। ভবরাম যোগাসনে বসিয়াছিলেন—ইহা দেখিয়াই করুণাময় জ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়াছিল। দেহত্যাগ কালে ভবরাম করুণাময়কে একবার শেষ দেখা দেখিয়া লইলেন! ভবরাম বজ্রনির্ঘোষ স্বরে করুণাময়ের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া বুঝি শেষ স্নেহরজ্জু ছিন্ন করিলেন।

প্রাণহীন দেহ দেখিয়া করুণাময় চীৎকার করিয়া রোদন করিতে করিতে ভবরামের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল। পরক্ষণেই ভবরামের পা দুখানি বক্ষে তুলিয়া লইয়া গগনভেদী স্বরে চীৎকার আরম্ভ করিলেন। করুণাময়ের সেই হৃদয়বিদারক চীৎকারে বৃক্ষের পত্র পর্যান্ত কম্পিত হইতে লাগিল! পশুপক্ষীও বুঝি রোদন সংবরণ করিতে পারিল না।

বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় ও প্রতিবাসিগণ হরিনাম সংকীর্ত্তন

করিতে করিতে ভবরামের প্রাণহীন দেহ পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তীরে যখন লইয়া যাইতেছেন, তখন এলায়িত-কুন্তলা, সাগরবালা পাগলিনীর ন্যায় স্বামীর শব দেহের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতে লাগিলেন! সে দৃশ্য কি ভীষণ! এই শোকাবহ দৃশ্যে সকলেরই বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। ঝামেরিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে বক্ষে জড়াইয়া বলিলেন, "মা! কিছু দিন অপেক্ষা কর; আমরাও যাইয়া বাবার সঙ্গে অনন্তকালের নিমিত্ত মিলিত হইব। বাবাকে বহুদূরে যাইতে হইবে! একা ব্যতীত সে পথে যাইবার উপায় নাই! যদি উপায় থাকিত, তবে বাবাকে কখনই একা ছাড়িতাম না। বাবা যাহাতে নিরাপদে গন্তব্যস্থানে উপনীত হইতে পারেন, তাহার উপায় করিতে হইবে। চল মা! বাবার আত্মা যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে দেবলোকে পঁহুছিতে পারে, যোগাসনে বসিয়া ভগবানের চরণে তাহার জন্য প্রার্থনা করিগে।" ঝামেরিয়া সাগরবালাকে বক্ষে জড়াইয়া গৃহে লইয়া আসিল।

চন্দন কাষ্ঠ ও পবিত্র গব্যঘৃত সংযোগে ভবরামের পবিত্র দেহ কয়েক দণ্ডের মধ্যেই ভস্মীভূত হইল। সকলই শেষ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ইহ-জীবনের মত ভবরামের সংসারলীলাও শেষ হইল। কর্ম্মবীর চলিয়া গেলেন—পশ্চাতে অনেক অসম্পূর্ণ মহৎ কার্য্য রাখিয়া গেলেন।

শ্মশানাগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে সকলেই

জাহ্নবী সলিলে অবগাহনের জন্য জলে অবতরণ করিলেন। কেবল করুণাময় জাহ্নবীতীরে উন্মনা হইয়া বসিয়া আছেন। বক্ষ-পঞ্জর ভেদ করিয়া “হরিধ্বনি” যেন করুণাময়ের হৃদয়ে আসিয়া আঘাত করিতেছে। আঁখিযুগলে দর বিগলিত ধারায় শোকাশ্রু নির্গত হইতেছে।

সহসা অদূরে কে একজন গায়িল :—

“আগে অহং তত্ত্ব দূর কর মন, সংসার বাসনা সনে।
তবে সংসারেতে সুখ পাবি তুই ছোঁবেনা রে শমনে॥”

রজনী প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। নিমতলার শ্মশান ঘাট নিস্তব্ধ! কুলুকুলুনাদিনী জাহ্নবী তট নিস্তব্ধ! বিরাট ব্যোম নিস্তব্ধ! জল ও স্থল সকলই নিস্তব্ধ!

করুণাময় চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে একজন সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান। অন্ধকারে করুণাময় তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার মন তখন অগ্রজের দেবোপম মূর্ত্তির ধ্যানে রত। সন্ন্যাসী করুণাময়কে তাঁহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

করুণাময় সন্ন্যাসীর সঙ্গে জাহ্নবীতটে একটি নির্জ্জন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, “করুণাময়! তুমি এখন সংসারে একাকী। ভবরাম দেহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে যোগাসনে বসিয়া তোমার জন্য অনেক চিন্তা করিয়া গিয়াছেন। সেই

চিন্তা কর্ম্মসূত্র হইয়া আজ আমাকে এই স্থানে এই সময়ে টানিয়া আনিয়াছে। একা তোমাকে সংসারের পিচ্ছিল পথে চলিতে হইবে। পাছে তোমার পদস্খলন হয়, এইজন্য তোমাকে কিছু উপদেশ দিয়া যাইব। এতদিন জ্যেষ্ঠের আদেশ, ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া যেরূপে পালন করিয়া আসিয়াছ, চিরদিনই তদ্রূপ করিবে। সংসারের কার্য্য সবই করিবে, কিন্তু কার্য্য করিবার সময় নিজেকে প্রশ্ন করিবে, "ভগবান কেন আমাকে সৃজন করিয়াছেন?" এই "কেন"র যদি মীমাংসা করিতে পার, তাহা হইলেই তুমি প্রকৃত সংসারী হইবে।

"তুমি যে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, নিশ্চয়ই ইহার ভিতর একটা কারণ বা উদ্দেশ্য আছে। বিনা কারণে, বিনা উদ্দেশ্যে একটি কীট পতঙ্গও ভগবান জগতে প্রেরণ করেন নাই।

"তোমার মন প্রশ্ন করিতেছে, এই কারণ বা উদ্দেশ্য কি? আচ্ছা! শুন করুণাময়! তুমি কেবল এইটি বুঝিয়া সংসারের কার্য্য করিও যে, "মানুষ নিজের জন্য বা নিজ কার্য্য সাধনের জন্য কখন জন্মগ্রহণ করে না। ভগবানের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ইহা অনেক দূরের কথা। যখন সংসার ধর্ম্ম সম্পন্ন করিতে করিতে ততদূরে আসিতে পারিবে, তখন ইহা তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে।

"তুমি যদি ভগবানের প্রয়োজন সাধনের জন্যই সংসারে আসিয়া

থাক, তবে সংসারে যাহা কিছু করিতেছ ভগবানের প্রীত্যর্থে করিতেছ, ইহা তোমাকে মনে করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। যাহা পাপ, তাহা কখনই ভগবানের প্রিয় কার্য্য হইতে পারে না। অতএব তোমাকে সংসার ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। সংসারে ভগবানের কার্য্য করা ব্যতীত আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য নাই। নিজের বলিতে আমাদের কিছু নাই এবং থাকিতেও পারে না। চ্যূত বৃক্ষটি ফলভরে নত হইয়া পড়িয়াছে, ইহাতে বৃক্ষের কোন সুখ বা লাভ নাই। ভগবানেরই উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে বুঝিতে হইবে। নদী অবিরাম কল কল শব্দে বহিয়া যাইতেছে, ইহাতে নদীর কি কোন সুখ বা লাভ হইতেছে! ভগবানের উদ্দেশ্য সাধন বা তাঁহারই কার্য্য করিয়া যাইতেছে বুঝিতে হইবে। এইরূপ পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা, যাহা কিছু সকলই ভগবানের উদ্দেশ্য সাধন করিয়া চলিয়া যাইতেছে। পশু লাঙ্গল টানিয়া বা গাভী মানুষকে দুগ্ধ দান করিয়া তাহাদের কি ফললাভ হইতেছে? ভগবানের উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে বুঝিতে হইবে। তুমি ব্যবসা করিবে, বাণিজ্য করিবে, সংসার ও আত্মীয়-পরিজনকে প্রতিপালন করিবে, স্ত্রী-পুত্র, ভ্রাতৃজায়া, ভ্রাতষ্পুত্র ইত্যাদিকে ভরণ-পোষণ করিবে, সমস্তই ভগবানের প্রীত্যর্থে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন করিতেছ, ইহা ভাবিয়াই করিবে। সেইরূপ যাহা অশাস্ত্রীয়, যাহা হিন্দু

রীতি-নীতির বিরোধী, তদ্রূপ কার্য্য বা অহংজ্ঞানে অথবা স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া কোনদিন কোন কার্য্য করিবে না। সংসারে যাঁহার উদ্দেশ্য সাধন বা যাঁহার প্রীত্যর্থে কার্য্য করিবে, তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিবে। তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন হইবে। তাঁহার সত্ত্বা সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে অনুভব করিবার চেষ্টা করিবে। যাও করুণাময়! পবিত্র দেহ,—পবিত্র হৃদয় মন লইয়া সংসার-ধর্ম্ম পালন কর।"

এই অমৃতময় উপদেশগুলি প্রদান করিয়া জাহ্নবীতটে অন্ধকার-রাশির মধ্যে আবার হঠাৎ সন্ন্যাসী অদৃশ্য হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কে ঐ পাগলিনী? গ্রামে, নগরে, পর্ব্বতে, কান্তারে, ধনীর প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায়, দরিদ্রের পর্ণকুটীরে ঘুরিয়া বেড়ায়—এ পাগলিনী কে? পাগলিনীর কখন ধূলিধূসরিত অঙ্গ, কখন ছাই-ভস্ম মাখা কষিত-কাঞ্চনের ন্যায় শরীর, কখন পরিধানে বৃক্ষের বল্কল। পাগলিনী কখন শ্মশানে শবদাহ দেখিয়া হো হো করিয়া হাসে, কখন আপনার মনে নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদে। আতুর, দীন যখন রোগজীর্ণ দেহে পর্ণকুটীরে ছিন্ন কন্থায় শয়ন করিয়া পাগলিনীর জন্য কাঁদে, পাগলিনী তখন দূর দূরান্তর হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া সান্ত্বনা প্রদান করে। ধনীর অট্টালিকায়—পুত্র-শোকাতুরা জননী যখন পুত্রের জন্য বক্ষে করাঘাত করিয়া মর্ম্মভেদী চীৎকার করে—তখন কোথা হইতে পাগলিনী ছুটিয়া আসিয়া শোকাতুরার নয়নাশ্রু মুছাইয়া দেয়। পুত্রকন্যাহীন নিরাশ্রয়া অশীতিপর বৃদ্ধা অন্নাভাবে ক্ষুধার যন্ত্রণায় যখন ছট্‌ফট্ করে, পাগলিনী কোথা হইতে উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী আনিয়া তাহার কাছে বসিয়া তাহাকে যত্নপূর্ব্বক ভোজন করায়।

দস্যুতস্কর যখন অন্ধকার রজনীতে পরস্ব অপহরণের জন্য

নির্জ্জন অরণ্যে বসিয়া পরামর্শ করে—পাগলিনী তখন ছুটিয়া গিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মের ভয় দেখায়। চীৎকার করিয়া তাহাদের দুরভিসন্ধি পাঁচজনের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়—দস্যুরা বিফল-মনোরথ হইয়া ছুটিয়া পলায়। দীর্ঘ শিখাযুক্ত ভণ্ড ব্রাহ্মণপণ্ডিত-গণ অপরকে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়া যখন স্বগৃহে গোপনে সেই পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, পাগলিনী কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া হো হো করিয়া হাসিতে থাকে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তখন লজ্জায় অধোবদন হয়। হিন্দু ও ব্রাহ্মণকে অনাচার করিতে দেখিলে, পাগলিনী রোষকষায়িত লোচনে তাহাদের পানে চাহিয়া থাকে। পাগলিনীকে দেখিলে তাহাদের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে। দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, শ্যামাপূজা প্রভৃতিতে গুরু বা পুরোহিত চণ্ডীপাঠ করিতেছেন, পাগলিনী তথায় যাইয়া উপস্থিত। তখন গুরু বা পুরোহিত মহাশয়কে ভয়ে ভয়ে চণ্ডীপাঠ করিতে হয়, পাছে অশুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া ফেলেন। নিঃস্ব পিতা বয়স্থা কন্যা লইয়া বিব্রত। অর্থাভাবে বিবাহ দিতে না পারায় দিন দিন বক্ষের রক্ত শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, পাগলিনী যাইয়া আশ্বাসবাণী শুনাইল। তারপর কোথা হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিল। প্রবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতেছে, পাগলিনী যাইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া দাঁড়াইল। গর্ভিণী প্রসব-বেদনায় তিন দিন তিন রাত্রি চীৎকার করিতেছে, প্রসব হইতে

পারিতেছে না। পাগলিনী ছুটিয়া গিয়া সূতিকা গৃহে প্রবেশ করিল। পরক্ষণে জননীর ক্রোড়ে সন্তানকে শয়ন করাইয়া পাগলিনী অদৃশ্য হইল। পুত্রের কঠিন পীড়া, চিকিৎসকের অভাব নাই, সকলেই হতাশ হইয়া চলিয়া আসিয়াছে, পুত্রের জনক জননী পুত্রের জন্য হৃদয়ভেদীরবে চীৎকার করিতেছে, পাগলিনী এমন সময় ছুটিয়া গিয়া মৃত্যুশয্যাশায়ী পুত্রের মস্তক ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া বসিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই পুত্রকে উঠাইয়া বসাইয়া পাগলিনী ছুটিয়া পলাইয়া গেল। শোকের পরিবর্ত্তে গৃহে আনন্দরোল উঠিল।

অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে গৃহস্থের ধন লুণ্ঠনের জন্য দস্যুগণ তরণী বাহিয়া চলিয়াছে, পাগলিনী কোথা হইতে ছুটিয়া গিয়া প্রবলস্রোতে নৌকা ডুবাইয়া দিয়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। দস্যুগণ প্রাণের দায়ে সাঁতার দিয়া কে কোন্ দিকে ভাসিয়া গেল। যাহারা প্রবলস্রোতে তীরে উঠিতে পারিল না, পাগলিনী আবার তাহাদিগের হাত ধরিয়া তীরে ছুঁড়িয়া দিতে লাগিল। কোথাও সতীর অবমাননা হইতেছে, পাগলিনী ছুটিয়া গিয়া, সতীকে পশ্চাতে রাখিয়া নিজে সম্মুখে দাঁড়াইল। পশুটা প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলাইয় গেল।

পাগলিনী কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন আকাশের দিকে অনিমেষনয়নে চাহিয়া থাকে; কিন্তু শ্মশানে পাগলিনীর বড়ই

আনন্দ! পাগলিনী শ্মশানে গেলেই হো হো করিয়া হাসিতে থাকে। দেশে, বিদেশে, সহরে, ক্ষুদ্র পল্লীতে পাগলিনীকে সকলেই জানে বটে; কিন্তু তাহার প্রকৃত পরিচয় কেহই অবগত নহে। পাগলিনী কোথায় থাকে, তাহাও কেহ জানে না।

যাহারা আতুর, দীন, রোগজীর্ণ, কঙ্কালসার, তাহারা পাগলিনীকে ভক্তি করে; কিন্তু হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা কি করিয়া জানাইবে, তাহা যেমন তাহারা বুঝিতে পারে না, তেমনই পাগলিনী কে তাহাও তাহারা জানে না। ধনীর অট্টালিকায় পাগলিনীকে সকলেই চিনে, কিন্তু পাগলিনী কে, ইহা তাহারা জানে না। পুত্রকন্যাহীন, অন্নাভাবগ্রস্তা, নিরাশ্রয়া অশীতিপর বৃদ্ধা, পাগলিনীকে দেবী বলিয়া মান্য করে; কিন্তু সত্যই পাগলিনী কে তাহা কেহ জানে না। দস্যু-তস্করেরা পাগলিনীকে ভয় করে, দেখিলে ত্রাসে পলাইয়া যায়; কিন্তু পাগলিনী যে ডাকিনী কি যোগিনী, তাহা তাহারা জানে না। কপটাচারী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ পাগলিনীকে দেখিলে ভয়ে কম্পিত হইতে থাকে; কিন্তু পাগলিনী যে কে, তাহা জানে না। অনাচারী হিন্দুগণ পাগলিনীকে দেখিলে শিহরিয়া উঠে, অনুতপ্ত-হৃদয়ে অশ্রুবর্ষণ করে; কিন্তু পাগলিনীকে দেখিলে কেন এমন হয়, তাহা তাহারা জানে না। পূজাবাড়ীতে চণ্ডী অধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণগণ পাগলিনীকে দেখিলে আশঙ্কায় দিশাহারা

হইয়া পড়েন; কিন্তু কেন এমন হয়, তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। পাগলিনীকে সকলেই এক একবার ছায়ার মত দেখেন; কিন্তু পাগলিনী দেবী, মানবী—কি পিশাচী, তাহা তাঁহারা জানেন না। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতা পাগলিনীকে চিনে, কিন্তু কোথা হইতে আসিয়া কেন পাগলিনী তাহাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া গেল, তাহা বুঝিতে পারিল না। পাগলিনীকে সকলেই চিনে—জানে; কিন্তু সত্যই পাগলিনী কে, তাহা কেহ জানে না। পাগলিনীকে কেহ বলে, "পাগলিনী"—কেহ বলে, "সন্ন্যাসিনী"—কেহ বলে, "ডাকিনী"—কেহ বলে "প্রেতসিদ্ধা"—কেহ বলে, কামাখ্যা পাহাড় হইতে ডাকিনী মন্ত্র শিখিয়া আসিয়াছে। ইংরাজীনবিশ সুশিক্ষিতগণ বলেন, "বেটী ডাকাতদের গুপ্তচর হে"; আবার কেহ বলেন, "না হে! বেটী অন্য কোন কুমৎলবে বেড়ায়।"—এইরূপ যাহার যেমন শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনা—যাহার যেমন প্রকৃতি, সে কল্পনাবলে পাগলিনীর সেইরূপই মূর্ত্তি গঠিত করিয়া লয়। দস্যু ও তস্করেরা মনে করে, "পাগলিনী সরকারের গুপ্তচর। বেটি এ দেশের মানুষ নয়, অন্য কোন দেশ হইতে সরকার বাহাদুর আমদানী করিয়াছে।"

পাগলিনী এই সব কাজ করিয়া বেড়ায়, পাগলিনীর অগোচর স্থান কোথাও নাই; কিন্তু সকল সময় সকলে পাগলিনীকে দেখিতে পায় না। কোথা হইতে কি হইল, অনেক সময়েই

মানুষ বুঝিতে পারে না। কাহারও বৃদ্ধ পিতা পীড়িত, পুত্র দূরদেশে। একমাত্র পুত্রকে দর্শন করিবার জন্য পিতা ছট্‌ফট্‌ করিতেছে—কে আসিয়া স্বপ্নঘোরে পুত্রকে সত্বর গৃহে ফিরিতে বলিয়া গেল। পুত্র আর মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির থাকিতে পারিল না। সহস্র কার্য্য ত্যাগ করিয়া পিতাকে দেখিবার জন্য ছুটিল। কেহ কোথাও যাইবার জন্য শুভযাত্রা করিয়া বাহির হইতেছে। বিপদ ঘটিবে বলিয়া কে যেন কাণে কাণে বাধা দিয়া গেল। তাহার আর যাত্রা করিবার সাহস হইল না। পরক্ষণে শুনিল, যে নৌকায় যাইবার কথা ছিল, তাহা জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। কেহ কোন গুরুতর বিষয়ের চিন্তা লইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে—তাহার শয্যাকণ্টক উপস্থিত—সমস্ত রজনী নিদ্রা নাই—চিন্তারও বিরাম নাই—রজনী প্রভাত হইলেই তাহাকে হয় ত পথের ভিখারী হইতে হইবে; চিন্তার মীমাংসা কিছু হইল না। কে আসিয়া কাণে কাণে তাহার চিন্তার মীমাংসা করিয়া দিয়া গেল। দৈবপ্রাপ্ত স্বপ্নের ফল ভাবিয়া তাহার চিন্তা-ক্লিষ্ট হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল। কাহাকেও প্রবলের চক্রান্তে রাত্রি প্রভাত হইলেই কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। সে নির্দ্দোষী হইলেও তাহার এরূপ শক্তি নাই যে, নিজের পক্ষ সমর্থন করিয়া নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করে। তাহার সহায় সম্বল নাই—অর্থবলও নাই। কারাদণ্ড নিশ্চয় জানিয়া বিচারকের

আদেশের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিয়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছে এমন সময় একজন সর্ব্বপ্রধান আইনজ্ঞ হঠাৎ আসিয়া তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে দাঁড়াইল। তাহার নির্দ্দোষিতা বিচারককে বুঝাইয়া দিল। ফলে চক্রান্তকারীরা গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হইল কোথা হইতে কি হইল বেচারী বুঝিতে পারিল না। এত গুপ্ত বিষয় তাহার পক্ষ সমর্থনকারী কি করিয়া জানিল, বুঝিতে না পারিয়া সে আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত হইল। দেবতাবোধে পক্ষ সমর্থন কারীর মুখের দিকে সে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। লোকচক্ষুর অন্তরালে এইরূপ কত ব্যাপার পাগলিনীর দ্বারা সংঘটিত হয়, অথচ পাগলিনীকে কেহ দেখিতে পায় না। যাহারা দেখিতে পায়, তাহারা চিনিতে পারে না। আবার যাহারা চিনিতে পারে, তাহারা পাগলিনী কে জানিতে পারে না। কত লোক কত চেষ্টা—কত অনুসন্ধান করিয়াছে; কিন্তু পাগলিনীকে কেহ জানিতে বা বুঝিতে পারিল না।

পাগলিনী কোথাও মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। সে এই মাত্র কালীঘাটে কালী-মন্দিরের মধ্যে ছিল. আবার একটু পরেই তারকেশ্বরের মন্দিরে গিয়া দেখ, তারকনাথের মস্তকে অঞ্জলি ভরিয়া বিল্বপত্র প্রদান করিতেছে। পাগলিনী এইমাত্র গঙ্গার উপর একখানি নৌকার ছাদে বসিয়াছিল, ক্ষণকাল পরেই তাহাকে বাঁশবেড়ের একটি হিন্দু-গৃহস্থের রোগ-শয্যাপার্শ্বে

বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাইবে। পাগলিনী এই মাত্র কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে স্থির হইয়া অচঞ্চল-দৃষ্টিতে কি দেখিতেছিল, একটু পরেই দেখিবে, কলিকাতার রাজপথে একটী বিদেশী পরিচ্ছদধারী ম্লেচ্ছ-হিন্দুকে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কি বলিতেছে। পাগলিনী এইমাত্র আরামবাগের আদর্শ হিন্দু-চতুষ্পাঠির অধ্যাপককে বিনম্রবচনে কি বলিতেছিল, একটু পরেই দেখিবে গয়ায় গিয়া একজন পাণ্ডাকে তীব্র তিরস্কার করিতেছে। ক্রোড়পতি পাণ্ডা কৃতাঞ্জলিপুটে অধোবদনে পাগলিনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে; পাগলিনী কে, তাহা সে জানিতে পারিল না।

কেহ বলে পাগলিনী বাতাসের সঙ্গে উড়িতে পারে—কেহ বলে রাত্রে পাগলিনীর ডানা বাহির হয়। কেহ বলে পাগলিনী জলে ডুবিয়া তিন দিন তিন রাত্রি থাকিতে পারে। কেহ বলে পাগলিনী বাতাস খাইয়া থাকে—কেহ বলে পাগলিনী গাছ চালাইতে জানে—পাগলিনী গাছের উপর বসিয়া ঝড়ের মত উড়িয়া যায়। কেহ বলে পাগলিনী একা নয়, উহার আরও সঙ্গী আছে।

আজ প্রবলপ্রতাপ জমীদার কৃষ্ণকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপঘাতে মৃত্যু হইবে। জমিদারবাবু অনাচারী পশুপ্রকৃতি বন্ধুগণকে সঙ্গে লইয়া ময়মনসিং জেলায় জমীদারী পরিদর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। জমীদারবাবুর আচরণে প্রজাবর্গ তাঁহার উপর কেহই

সন্তুষ্ট নহে। কয়েক দিবসের জন্য এখানে আসিয়া কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। যে সমস্ত দীন প্রজার গৃহে যুবতী ভার্য্যা বা কন্যা আছে, তাহারা সশঙ্কিত অবস্থায় দিনপাত করিতেছে।

রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। কয়েকজন বলবান্ প্রজা নিঃশব্দে কাছারীতে প্রবেশ করিয়া জমিদারকে একটি নদীর ধারে ধরিয়া আনিয়াছে। জমিদারের মুখ এরূপভাবে বস্ত্রাবৃত করিয়াছে যে, সহস্র চেষ্টাতেও কৃষ্ণকান্ত চীৎকার করিতে পারিতেছে না। বিজাতীয় ক্রোধে সকলেরই চক্ষু রক্তবর্ণ। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া কেহ বলিতেছে, "বেটার গলাটায় আমাকে আগে চোপ বসাতে হবে।" এই বলিয়া ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া সজোরে তীক্ষ্ণধার দা উত্তোলন করিল। কেহ বলিল, "জীবন্ত অবস্থায় আগে বেটার নাড়ি ভুঁড়িগুলা বাহির করিয়া ফেলি।" কেহ বলিল, "যে চক্ষে বেটা আমার মেয়েটার প্রতি চাহিয়াছিল, সেই চক্ষু দুটা আগে তুলিয়া ফেলি।" অবশেষে সকলে এক মত হইয়া স্থির করিল, অগ্রে হাত দুইটা কাটিয়া নদীর স্রোতে ভাসাইয়া দেওয়া হউক্। তারপর পা দুখানা কাটিয়া নদীতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। তারপর নাড়িভুঁড়িগুলা ভাসাইয়া দিয়া সর্ব্বশেষে মুণ্ডুটা কাটিয়া নদীর মাঝখানে ফেলিয়া দিব। এইরূপে একে একে ভাসাইয়া দিলে পাপিষ্ঠের কোন সন্ধানই কেহ পাইবে না। কৃষ্ণকান্ত

সকলই শুনিতেছে, কথা কহিবার শক্তি নাই। জীবিত অবস্থাতেই তাহার দেহের শোণিত হিম হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণকান্ত জীবিত কি মৃত, তাহা সে নিজেই অনুভব করিতে পারিতেছে না। দিবালোকে যদি কেহ দেখিত, তাহা হইলে তাহার শরীরে জীবনের চিহ্নমাত্রও কেহ দেখিতে পাইত না। সে মনে করিতেছে, আমার হস্তপদ কর্ত্তন করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এইবার শিরচ্ছেদন করিবে। কৃষ্ণকান্ত জীবিতকালে কখন ভগবানকে ডাকে নাই। বাল্যকাল হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে বিলাস-স্রোতে গা ভাসাইয়াছে। যৌবনে ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়া পশুভাবে জীবনযাপন করিয়া আসিয়াছে। ভগবানকে কখন স্মরণ করিবার অবসর বা সময় ঘটে নাই। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু সময় উপস্থিত। এরূপ ভীষণ মৃত্যু দুর্ভাগা-মানবের জন্যই অপেক্ষা করে। ভগবান সকলের দেহেই ভক্তি বিশ্বাস প্রদান করিয়াছেন। সুসময় না আসিলে কাহারও হৃদয়ে সে সমস্তের বিকাশ হয় না। কৃষ্ণকান্তের হৃদয়ের চিররুদ্ধ ভক্তি-বিশ্বাস আজ সময় পাইয়া উন্মেষিত হইল। সে কাতরে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল, "প্রভু! তুমি আমার শোচনীয় মৃত্যু অবলোকন করিয়া আমার কৃতপাপ ক্ষমা কর। আমার পাপের সংখ্যা নাই! মৃত্যু-সময়ে প্রমাণ পাইলাম ধর্ম্ম, অধর্ম্ম জগতে বিরাজমান! প্রভু! তোমার করুণা ভিন্ন আমার আর গতি নাই। এতদিন ধন-

সম্পদে মত্ত থাকিয়া তোমাকে মনে করি নাই। দয়াময়! বাল্যকাল হইতে সে শিক্ষাও পাই নাই। যে সময়ে আপনাকে আমার মনে পড়িল, তাহা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ! আর কখন আপনাকে ডাকিব প্রভো!"

কৃষ্ণকান্তের আর ডাকিবার সময় রহিল না। একজন কৃষ্ণকান্তকে লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণধার দা উঠাইল। চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে দা আসিয়া কৃষ্ণকান্তের হস্তের উপর পড়িল। হঠাৎ সকলে স্তম্ভিত, ভীত, ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তীক্ষ্ণধার দা কৃষ্ণকান্তের হস্তস্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই, কে একজন আসিয়া তাহা কাড়িয়া লইয়া নদীতে ফেলিয়া দিল।

নদীতীরে, সেই নিস্তব্ধ অন্ধকারে, কে একজন খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসির কি তীব্র শক্তি! বৃক্ষ, লতা, পাতা কাঁপিয়া উঠিল। স্রোতস্বিনীর কল কল শব্দ বুঝি থামিয়া গেল! যে যেখানে ছিল, স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাহারও ধমনীতে আর যেন রক্ত চলাচল হইতেছে না। সকলেই বাক্‌শক্তিরহিত। পলাইবার ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু চরণ শক্তিহীন। পা উঠিতেছে না।

"সাবধান! এমন কাজ আর কখন করিস না। ব্রহ্মহত্যা! উঃ, ভয়ঙ্কর—মহাপাতক!! যা! চলিয়া যা!"

মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহাদের শক্তি ফিরিয়া আসিল। অভয়বাণী পাইয়া, যে যেদিকে পারিল, প্রাণ লইয়া ছুটিয়া পলাইল।

কৃষ্ণকান্তের মুখের বসন ও হস্তপদের বন্ধন খুলিয়া দেওয়া হইল। বস্ত্র উন্মোচিত হইলে মুখ-গহ্বর হইতে রক্তধারা বহিতে লাগিল, কিন্তু যেন মন্ত্রবলে তখনই তাহা নিবারিত হইল। কৃষ্ণকান্ত সকলই দেখিতেছে, কিন্তু কথা কহিবার সাহস হইতেছে না। সেই গভীর অন্ধকারের মধ্য হইতে জলদগম্ভীরস্বরে কে বলিতে লাগিল—"সাবধান! বিপথগামীর প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে হয়, তাহা ত চাক্ষুস দেখিলে! ইহা ইহজীবনের কয়েক মুহূর্ত্তের দণ্ড। জন্ম-জন্মান্তরে, শত শত বর্ষ ধরিয়া, ইহাপেক্ষা শতগুণ ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। যাক্, আর বোঝা ভারি করিও না! যাহাকে ডাকিতেছিলে, যিনি তোমাকে পাপী বলিয়া ঘৃণা না করিয়া সযত্নে রক্ষা করিলেন, তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ কর। যে নাম স্মরণ করিতেছিলে, সেই নামাগ্নিতে তোমার পাপরাশি দগ্ধ হইয়া যাইবে।"

কি বজ্র-গম্ভীর স্বর! প্রতি শব্দটী কৃষ্ণকান্তের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া যেন হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে বিদ্ধ হইয়া রহিল। কৃষ্ণকান্ত স্বপ্নরাজ্যে ডুবিয়া, জ্ঞানহীন—মৃতের ন্যায় সেই নদীতীরে পড়িয়া রহিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

"মা! সমস্ত দিন তোকে দেখিতে পাই না! এমন করিয়া দূরে দূরে বেড়াইলে আমরা কি করিয়া থাকিব মা? যেখানে যাস্, আমাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাস্ না কেন মা? তুই এক দণ্ড না থাকিলে, আমাদের ঘর যে অন্ধকার হইয়া যায়! আমার আর সংসারে থাকিতে ইচ্ছা হয় না। চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হয়।"

বক্তা সত্য সত্যই কাঁদিতে লাগিল।

"কেন কাকা, তুমি আমার উপর রাগ কর! আমি কি তোমাদিগকে না দেখিলে সুস্থির থাকি! তাহা যদি থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাকে আর এতদিন দেখিতে পাইতে না। কত দূর-দূরান্তরে যাই, আবার তোমাদের জন্যই ত ছুটিয়া আসি কাকা!"

"তোর জন্য আমার বড়ই ভয় হয় মা! পাছে আর তোকে দেখিতে না পাই! এমন করিয়া আর দিন রাত্রি দেশ-বিদেশে বেড়াস্ না মা।"

"কাকা! এই কথাটি আমাকে বলিও না! কেবল এই

জন্যই আমি সংসারে পড়িয়া আছি। আমি দিনরাত্রি যদি দেশ-বিদেশে না বেড়াই, তাহা হইলে মহাপুরুষদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তাঁহাদের আদেশেই আমি সংসারে আবদ্ধ আছি। তাঁহাদের আদেশ পালন না করিলে, আমার জীবন যে বৃথা হইবে কাকা! আমার কি শক্তি আছে কাকা? তাঁহাদের করুণাদত্ত কণামাত্র শক্তি লাভ করিয়া, তাঁহাদেরই কার্য্য করিতেছি! এই নশ্বর দেহে যদি জগতের কণামাত্র উপকার করিতে পারি, তাহা হইলেই নারী-জন্ম সার্থক হইবে। বাবা আমার, দেশের জন্য—হিন্দুধর্ম্মের জন্য, অকালে জীবলীলা শেষ করিয়াছেন। তাঁহার আরব্ধ কার্য্য একটুও অগ্রসর করিতে পারিলে, ধন্য হইব। বুদ্ধির জড়তাবশে হিন্দুর মন এখন অবিশ্বাসে পূর্ণ. যোগবলে যে শত যোজনের ঘটনা চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়, শত যোজনের পথ চক্ষের নিমিষে যাওয়া যায়, হিন্দু এখন ইহা বিশ্বাস করিতে চাহে না। হিন্দুর যে ভারতে জন্ম, হিন্দুর শক্তি যে বিভিন্ন. হিন্দুর জন্মভূমির মত যোগভূমি যে ব্রহ্মাণ্ডে আর কোথাও নাই, হিন্দুর আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি যে মানুষকে দেবতার সমকক্ষ করে, এ সমস্ত কথা হিন্দু এখন বিস্মৃত হইয়াছে! দৈব-প্রভাবে রামচন্দ্র যেরূপ নিজের শক্তি নিজে উপলব্ধি করিতে পারিতেন না, পদে পদে আত্মবিস্মৃত হইতেন, হিন্দুও তেমনই বুদ্ধির জড়তাবশে, যাহা কিছু নিজের, সে সমস্তই ত্যাগ করিয়াছে।

"আমার বাবা মহাত্মা ভবরাম, যে বীজ কন্যার হৃদয়ে বপন করিয়া গিয়াছেন, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—শরীর পতন করিয়াও সেই বীজ ভারতভূমিতে ছড়াইয়া যাইব। যদি পর্ব্বতগুহাবাসীদের আশীর্ব্বাদ থাকে, আর বাবার চরণে যদি আমার যথার্থ ভক্তি থাকে, তাহা হইলে দেখিবেন, এক দিন না একদিন বাবার ইচ্ছা-শক্তি নব-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগতে কার্য্য করিবে। হিন্দু আবার হিন্দু হইবে। যতদিন আমার দেহের শেষ শক্তিবিন্দুর ক্ষয় না হইবে, ততদিন আমার এ চেষ্টার বিরাম হইবে না।"

ভবরামের মৃত্যুর দশ বৎসর পরে, ঝামেরিয়ার সঙ্গে করুণাময়ের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল। ঝামেরিয়ার শক্তির পরিচয় পাঠক পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভবরাম যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, ঝামেরিয়া পাগলিনীপ্রায় হইয়া, তাহাকে বিশাল বনস্পতিতে পরিণত করিবার জন্য সমস্ত শক্তি সামর্থ্য ও যোগবল নিয়োজিত করিয়াছে। ঝামেরিয়া জগতের হিতের জন্য যোগবলে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাই করুণাময় অভিমান-ভরে ঝামেরিয়াকে কতই অনুযোগ করিলেন। ভবরাম যে আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিতে না পারিয়া, দেহপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহা ঝামেরিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারে নাই। তাই ঝামেরিয়া পাগলিনী।

করুণাময় হতাশ-অন্তরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—

"মা ঝামেরি! পাগলী আমার! তোর এই অক্লান্ত চেষ্টা কি সফল হইবে না! দাদার ইচ্ছা কি পূর্ণ হইতে দেখিতে পাইব না মা? হিন্দু কতদিনে আবার সেই পূর্ব্বের গৌরবময় হিন্দু হইবে না? ব্রাহ্মণ-বালকগণ কবে আবার অর্থকরী বিদ্যার্জ্জনচেষ্টার পরিবর্ত্তে প্রভাত সন্ধ্যায় বেদ পাঠ করিবে মা? হিন্দু কবে আবার ভারতের প্রাচীন রীতি-নীতির আদর করিতে শিখিবে মা? সে দিনের কি এখনও অনেক বিলম্ব আছে?"

"কি করিয়া জানিব কাকা! ভগবান ভিন্ন এ কথার উত্তর দিবার শক্তি আর কাহারও নাই। তবে যতদূর দৃষ্টি যায়, তাহাতে মনে হয়, হিন্দু নিশ্চয়ই একদিন নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিবে।"

ঝামেরিয়া একদৃষ্টে আকাশের দিকে চাহিয়া, করুণাময়ের মুখের উপর চঞ্চল দৃষ্টি স্থাপিত করিল। করুণাময় বুঝিলেন, পাগলী বেটীর কোথায় আবার ডাক পড়িয়াছে, এখনই ছুটিবে।

করুণাময় স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"পাগলী মা আমার! যা' মা, কোথায় কে তোকে ডাকিতেছে! কার বুঝি সময় হইয়াছে। মায়ার শৃঙ্খলে বাঁধিয়া তোর কর্ত্তব্যে আর বাধা দিব না।" করুণাময়ের চক্ষে পলক পড়িতে না পড়িতে, পাগলিনী বায়ুর সঙ্গে কোথায় মিলাইয়া গেল।

* * * * *

সেতুবন্ধ রামেশ্বরের পথে তিনটি সন্ন্যাসী বিপন্ন হইয়া,

ভগবানকে ডাকিতেছেন। ইতঃপূর্ব্বে একদল দস্যু, সন্ন্যাসীর বেশে তীর্থযাত্রীদের সঙ্গ লইয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছিল। সেইজন্য পুলিশের লোক এখন সন্ন্যাসী দেখিলেই, নানাবিধ যন্ত্রণা দিয়া দস্যু কি সাধু তাহার পরীক্ষা করিতেছেন। কয়েকজন শান্তিরক্ষক সন্ন্যাসীত্রয়কে নানাপ্রকার যন্ত্রণা দিয়া বলিল, "এখনও বল, চোরাই মাল তোরা কোথায় কাহার কাছে রাখিয়াছিস্?"

তাঁহারা হাসিয়া বলিলেন—"সত্যই বাবা, আমরা চোর নহি—সন্ন্যাসী।"

বিলম্বিত শ্মশ্রুগুম্ফ হৃষ্টপুষ্ট-দেহ একজন পুলিশ কর্ম্মচারী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, "চোর শালা—শালা লোককো, এক একশ জুতি লাগাও!"

বোধ হয় ইনি দারোগা বা পুলিশের ইনস্পেক্টর হইবেন।

একজন ভোজপুরী সজোরে একটি সন্ন্যাসীকে নাগরা জুতা সমেত পদাঘাত করিল। লোকটা বোধ হয় পুলিশের কনেষ্টবল বা নিম্নতন কোন কর্ম্মচারী হইবে। নাগরা জুতার তলদেশ লৌহ-মণ্ডিত! আঘাতে সন্ন্যাসীর গা কাটিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। সন্ন্যাসী লোকটার মুখের দিকে কেবল চাহিয়া রহিলেন, একটি কথাও বলিলেন না। ক্রোধ বা যন্ত্রণার চিহ্ন সে চাহনিতে নাই, সে দৃষ্টি স্নিগ্ধ—সম্পূর্ণ বিরক্তিশূন্য!

ঠিক সেই সময়ে, জেলার প্রধান শান্তিরক্ষক—একজন

সাহেব, অন্ধকূপ-সদৃশ সেই ক্ষুদ্র গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সাহেবকে দেখিয়া সকলেই হতভম্ব হইয়া পড়িল। এরূপ অসময়ে, বিনা সংবাদে, ছদ্মবেশে, প্রধান কর্ম্মচারী আসিলেন! সাহেব যে নিম্নতন কর্ম্মচারীদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা! পুলিসকর্ম্মচারী-দের হৃদয় দুর দুর করিয়া কম্পিত হইতে লাগিল। সাহেব ক্রোধ-কম্পিত স্বরে, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোদের মত নৃশংস কাণ্ডজ্ঞানহীন কর্ম্মচারীর দোষেই, নিষ্পাপ সাধুব্যক্তি নির্যাতিত হয়। চোর ধরিয়া দিলে, গুম্ফ পাকাইতে পাকাইতে বাহাদুরী দেখাইবার সীমা থাকে না। চোর ধরিবারও তোদের যেরূপ শক্তি নাই, সেইরূপ কে চোর—কে সাধু, তাহা বুঝিবারও তোদের কোন সামর্থ্য নাই। ঘুষের লোভে, বিনা অপরাধে নির্দ্দোষীকে নির্যাতিত করিতে তোরা যেরূপ দক্ষ, প্রকৃত অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করিতেও তোরা সেইরূপ অভ্যস্ত! তোদের মত অর্থলোভী, নৃশংস, কর্ম্মচারীর দোষেই শাসন-বিভাগের লোককে সাধারণের চক্ষে হেয় হইতে হইয়াছে। যাহারা নির্লোভ, ধর্ম্মভীরু, তাহাদিগকে তোদের মত লোকের সংসর্গে পড়িয়া নিন্দনীয় হইতে হয়। কত দেশে কত নিরপরাধ ভদ্র ও সাধুব্যক্তি তোদের মত পশুপ্রকৃতি লোকের দ্বারা এইরূপে লাঞ্ছিত হইতেছে, কে তাহাদের সংবাদ রাখে? আমি তোদের কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত করিব। এখনই সরকারী নিদর্শন পরিত্যাগ কর্। এই মুহূর্ত্তেই আমি তোদের

পদচ্যুত করিলাম। বিচারকের সম্মুখে কঠোর দণ্ডের জন্য অপেক্ষা কর্।”

সাহেব, সন্ন্যাসিগণকে সসম্মানে মুক্তি প্রদান করিয়া চলিয়া গেলেন। কোথা হইতে কি ব্যাপার সংঘটিত হইল, কেহ কিছুই বুঝিতে পারিল না। পাঠক! তুমি হয় ত বুঝিয়াছ, ইহা সেই পাগলিনীর খেলা!

উপসংহার।

হরিদ্বারের বিজন অরণ্যে পর্ণকুটীর বাঁধিয়া, ঐ যে একটি সাধু ভগবচ্চরণে মনকে নিয়োজিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন, পাঠক! উঁহাকে কি চিনিতে পার? সাধুর সংসার আসক্তি, ভোগ সুখস্পৃহা কিছু মাত্র নাই। নদীর জল পান ও বৃক্ষপত্র ভক্ষণ করিয়া, সাধু জীবনধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সাধু পরকালের চিন্তায় কাতর হইয়া, ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। পাগলী মা এক একবার আসিয়া সাধুকে দর্শন দিয়া যান। শীত, তাপ, বর্ষা সাধুর মস্তকের উপর দিয়া যাইতেছে। সাধুর ব্রত অতি কঠোর। পাঠক! ইনিই আমাদের সেই প্রবল প্রতাপশালী জমিদার—কৃষ্ণকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। পাগলী মায়ের কথাতেই, কৃষ্ণকান্তের হৃদয়ে ভগবদ্‌ভক্তির উদয় হয়। বিষয়-সম্পত্তি সাধু-সেবায় অর্পণ করিয়া, কৃষ্ণকান্ত সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। কঠোর সাধনায় কৃষ্ণকান্তের পাপরাশি ধৌত হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণকান্তের হৃদয়ে এখন বিমল জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত।

পাগলী মা এখন জগতের হিতের জন্য, হিন্দুকে প্রকৃত হিন্দু

করিবার জন্য, লোক-লোচনের অন্তরালে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছেন। পাগলী মায়ের তিলার্দ্ধ বিশ্রাম নাই। কেবল দিনান্তে একবার করিয়া সাগরবালা ও করুণাময়কে দেখিয়া যান্। ভবরামের সন্তান দুইটি পাগলী মায়ের বড়ই প্রিয়। তাহাদিগকে একবার করিয়া না দেখিলে, পাগলী মা কোথাও স্থির হইয়া থাকিতে পারেন না। ভবরামের আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য, মা প্রাণপণ করিতেছেন। সংসারে প্রতিনিয়ত যে সব ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, সংসারী মানব চর্ম্মচক্ষে সে সকলের মঙ্গলামঙ্গল উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। সুতরাং পাগলী মাকে তাহারা কি করিয়া চিনিবে? মোহান্ধ মানবকে সত্য বস্তু চিনাইবার জন্য, পাগলী মায়ের চেষ্টার বিরাম নাই।

করুণাময়, জ্যেষ্ঠের সঙ্কল্পিত অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। করুণাময় এখন "আদর্শ গৃহী।" তাঁহার সংসার এখন "হিন্দুর আদর্শ সংসার।" ভ্রাতুষ্পুত্র দুই-টিকে জ্ঞানী, ধার্ম্মিক ও হিন্দু সংসারের গৃহস্বামীর উপযুক্ত করিয়া গঠিত করিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ফকু যাহাতে গৃহস্বামীর উপযুক্ত হয়, তজ্জন্য করুণাময় অহরহঃ ধ্যানে বসিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন। ফকু এখন হইতে, খুল্লতাতের আদেশের প্রতীক্ষা করিয়া, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। জ্যেষ্ঠ ভবরাম, কনিষ্ঠ করুণাময়ের